প্রকাশক
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

মুদ্রক
শ্রীপিয়ারীমোহন সাহু
দেশবাণী মুদ্রণিকা প্রাইভেট লিঃ
: সি, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদ
শ্রীনীতিশ মুখোপাধ্যায়

মূল্য : দশ টাকা

উৎসর্গ

।। বাবা-র স্মরণে, মা-র শ্রীচরণে ।।

# নিবেদন

আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও গ্রন্থরচনাকালে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রের মাধ্যমে ও সাক্ষাতে আলোচনা করেছেন। বস্তুত একদিন তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে। এই উপলক্ষে তাঁকে প্রণাম জানাই। শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন অন্য উদ্দেশে আমাকে দিয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাট্যে ঐক্য' লিখিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত সেন অনুগ্রহ করে তথ্যাদি বিষয়ে আমার নানা জিজ্ঞাসার মীমাংসাও করে দিয়েছেন। বন্ধু শঙ্খ ঘোষ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে রচনা বিষয়ে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তথ্যগত ভ্রমের প্রতি যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তেমনি তথ্য সংগ্রহ করেও দিয়েছেন। গত পনেরো বছর ধরে চিঠিপত্রে এবং মুখোমুখি আমরা যে সাহিত্যচর্চা করে চলেছি এই গ্রন্থ কিছু পরিমাণে তার স্মারক হয়ে থাকল। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রুফ্ দেখার মতো বিরক্তিকর কাজের দায়িত্বও তিনি সানন্দে তুলে নিয়ে এই অনভিজ্ঞ বন্ধুকে উদ্ধার করেছেন। অবশ্য তাঁর এবং প্রকাশকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যথারীতি কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েই গেল (যেমন ১১ পৃষ্ঠার ১০ লাইনে 'প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত' হয়েছে 'প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত' এবং ৪৭ পৃষ্ঠায় সাত অংশের শিরোনাম হবে 'গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক', হয়েছে 'গদ্যনাটক থেকে পদ্যনাটক')।

নিতান্ত ছাত্রপাঠ্য নয় এমন প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশের গুরুতর ঝুঁকি নিয়ে শ্রীযুক্ত চিন্ময় মজুমদার আমার মনে সপ্রশংস বিস্ময় জাগিয়েছেন। প্রকাশনা ব্যাপারে সহকর্মী বন্ধু শ্রীহরেন ঘোষের মূল্যবান আনুকূল্যের কথাও স্মরণ করি। কোন কাজে দীর্ঘকাল সময় ও মনোনিবেশ করতে পারা আমার স্বভাব নয়; সেই স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ যে এইবার সম্ভব হলো তার জন্য যিনি দায়ী তাঁর নাম, তাঁর নির্দেশে, উল্লেখ করা গেল না।

এই সব প্রণম্যজন ও প্রিয়জনের নাম আমার এই সামান্য চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে আমি ধন্য বোধ করছি।

বিনীত

শিলিগুড়ি কলেজ } অশ্রুকুমার সিকদার

# সূচীপত্র

# রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর

## এক

## রূপান্তরের বিচিত্র উদাহরণ

নাটকের ঘটনাবস্তু সম্বন্ধে শেকসপীয়রের কুশীলকবৃত্তি এতই সর্বজনবিদিত যে তা নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই নাট্যকারশ্রেষ্ঠ নাটকের ঘটনাবস্তু স্বীয় কল্পনাদ্বারা সৃষ্টি করার শ্রম প্রায় কোন সময়ে স্বীকার করেন নি। ঘটনাকঙ্কাল অন্য নাটক বা উপাখ্যান বা ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে তাকে নাট্যরূপান্তরের দ্বারা শেকসপীয়র জীবন্ত ও নবীভূত করে তুলেছেন। উক্ত কাহিনী-কঙ্কালগুলির মধ্যে শেকসপীয়র যে অভ্রান্তভাবে নাটকীয় কেন্দ্রটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তাতেই তাঁর নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের আদি প্রমাণ। এ কথা সাহিত্যপাঠকমাত্রেই জানেন যে শেকসপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি ও 'ম্যাকবেথ' হলিনশেডের রাজমালা অবলম্বনে রচিত। 'কিং লিয়ার' নাটকের ভিত্তি হলিনশেডের রাজমালার অনুরূপ নামধারী রাজার কাহিনী। রোমক নাটকগুলি তিনি লিখেছিলেন প্রধানত প্লুটার্ক-রচিত চরিতাবলী অবলম্বনে। 'রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র ভিত্তি এক শতাব্দী পূর্ব থেকে প্রচলিত এক জনপ্রিয় ইতালীদেশীয় কাহিনী। 'হ্যামলেটে'র পিছনেও পূর্বপ্রয়াসের ইতিহাস ছিল। নরথ্রপ ফ্রাই যাকে জে. এম. রবার্টসনের 'disintegrating fantasies' বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'Hamlet is a stratification, that it represents the efforts of a series of men, each making what he could out of the work of his predecessors. The Hamlet of Shakespeare will appear to us very differently if, instead of treating the whole action of the play as due to Shakespeare's design, we perceive his Hamlet to be superposed upon much cruder material which persists even in the final form.' যে পূর্ব উপকরণের ভিত্তিতে 'হ্যামলেট' রচিত পরিণত রূপেও সেই স্থূল উপকরণের প্রভাব রয়ে গেছে, এই মতের উপরে এলিয়টের Sacred Wood-এর Hamlet and his Problems প্রবন্ধ লিখিত।

অন্য কাহিনীর বা পুরাণের বা ইতিহাসের এই জাতীয় নাট্যরূপান্তর শেকসপীয়রই করেন নি। পৃথিবীর নাটকের ইতিহাসে এই ঘটনা ক্রমাগত ঘটেছে, শেকসপীয়রের পূর্বে, সমকালে এবং পরেও। গ্রীক ট্র্যাজেডীর নাট্যকারগণ গ্রীক মহাকাব্যপুরাণের কাহিনীসমূহ অবলম্বন করে তাঁদের অমর নাটকাবলী লিখেছিলেন। শেকসপীয়রের সমকালীন নাট্যকার মারলো প্রচলিত ফাউস্ট উপাখ্যান অবলম্বনে নাটক লিখেছিলেন, যেমন পরবর্তীকালে লিখেছিলেন গ্যেটে। এই কাহিনীর একই কেন্দ্রগত সত্যকে আবার উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীতে টমাস মান, যেমন গ্রীক মহাকাব্যের ভ্রাম্যমাণ নায়কের কাহিনীকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করে নবীভূত করেছেন জয়স। ড্রাইডেন শেকসপীয়রের কয়েকটি নাটককে নিজের নাট্যাদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করেছিলেন। শেকসপীয়র-প্রমুখ এলিজাবেথীয়-গণের আত্মসাৎ-প্রবণতা এবং ড্রাইডেনের রূপান্তর-প্রয়াসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে যেয়ে The Death of Tragedy গ্রন্থে জর্জ স্টিনার মন্তব্য করেছেন—'The Elizabethans, in particular, had plundered freely wherever their eyes roamed. But what they took, they took as conquerors, not as borrowers. They mastered and transformed it to their own measure with the proud intent of surpassing what had gone before. In Dryden, this is no longer the case. when he 'adapts' Anthon and Cleopatra, Troilus and Cressida and The Tempest, he does so in complete awareness of the original. He is assuming that the earlier work lives in the remembrance of his public. His own version acts as a critique or variation on a given theme.' শেকসপীয়রের সামান্য কিছু পরবর্তী-কালের বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার রাসিন গ্রীক পুরাণ ও নাট্যের চরিত্র ইফিগেনিয়াকে অবলম্বন করে একটি বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। ইউরিপিদেসের ইফিগেনিয়া থেকে রাসিনের ইফিগেনী নাটকের পার্থক্যের কারণ নাট্যকার নিজেই নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে 'I have diverged somewhat from the general scheme and the plot of Euripides.' কারণ, 'How could I possibly have sullied the stage with the

horrible murder of so virtuous and lovable a person as Iphigenia had necessarily to be in this play? And again, how could I possibly have succeeded in bringing my tragedy to an end with the help of a goddess and stage machinery, and by a metamorphosis which might have found some credence in Euripides' days but which would be too absurd and too incredible in ours?' (পেঙ্গুইন সংস্করণ) রাসিনের 'ফেদ্রে'-র কাহিনীও ইউরিপিদেস থেকে নেওয়া, যেমন সমসাময়িক কর্নেই-এর 'ঈদিপ্' নাটকের কাহিনী নেওয়া সোফোক্লেস থেকে। অন্যের কাহিনী বা প্রাচীন পুরাণ অবলম্বন করে নাটক রচনায়, এমন কি অন্যের নাটকের নবরূপান্তর সাধনে এখনও পর্যন্ত নাট্যকারগণের উৎসাহের অবসান হয় নি। বিশেষত গ্রীক ট্র্যাজেডীর কাহিনী এবং গ্রীক মীথের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনের এমন নির্ভুল প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করেছিল যে, পরবর্তী নাট্যকারগণ আধুনিকতর জীবনসমস্যা রূপায়িত করতে যেয়ে বারবার সেই কাহিনীগুলির কাঠামো ব্যবহার করেছেন। ইউজিন ও'নীল ইলেকট্রার মীথকে ব্যবহার করেছেন নাটকে, হফ্‌মানস্টালের 'ইলেক্‌ট্রা' কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষ অনুবাদ, কিছু পরিমাণে নূতন সৃষ্টি। ককতো এবং সার্ত্রে আধুনিক জীবনের অস্তিত্বের সমস্যাসংকটকে গ্রীক পুরাণনাট্যের কাহিনীর ভিত্তিতে প্রকাশিত করেছেন। ককতোর 'দি ইনফারনাল মেশিন' ঈডিপাস কাহিনীরই এক নবরূপ। এলিয়টের 'ফ্যামিলি রিইউনিয়নে'র মত সার্ত্রের 'দি ফ্লাইজ' নাটকও 'ওরেস্টিয়া' নামক গ্রীক নাটকের ভিত্তিতে রচিত। আনুই রচিত 'আন্তিগোনে' এই জাতীয় রূপান্তরের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ। এলিয়টের কাব্যনাট্য 'দি ককটেল পার্টি' এবং 'দি এলডার স্টেটসম্যান' যথাক্রমে 'ওরেস্টিয়া' ও 'ঈডিপাস অ্যাট কলোনাসে'র আধুনিক যুগোপযোগী রূপান্তর। তাঁর অন্য নাটকগুলিতেও তিনি গ্রীক মীথ ব্যবহার করেছেন। ককতো একদিকে যেমন গ্রীক পুরাণ ও ট্র্যাজেডীর কাহিনীকে নবরূপ দিয়েছেন, তেমনি তিনি অন্যদিকে আবার শেকসপীয়রের 'রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েট'কে রূপান্তরিত করেছেন। একই প্রবণতা দেখতে পাই জনপ্রিয় নাট্যকার পিটার উসতিনভের মধ্যে—তিনি কাপুলেট ও মণ্টেগুর বিবাদ ও রোমিয়ো-জুলিয়েটের প্রেমের কাহিনীকে আধুনিক ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন ও সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের পুত্রকন্যার প্রণয়কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন তাঁর 'রোমানফ

অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে। কামু আরো নিকটবর্তী কালের লেখকের নিকট থেকে নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি—তিনি দস্তয়েফ্‌স্কির 'দি পজেস্‌ড্‌' উপন্যাস অবলম্বনে একটি নাটক রচনা করেছেন।

এই জাতীয় নাট্যরূপান্তর রবীন্দ্ররচনাবলীতেও আমরা পুনঃপুনঃ পাই। মুকুট নাটকের ভিত্তি যে মুকুট গল্প সেটি ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা বর্ণিত মহারাজ অমরমাণিক্যের একটি আখ্যানের ছায়াবলম্বনে রচিত হয়েছিল। বিসর্জন নাটকের ভিত্তি যে রাজর্ষি উপন্যাস সেই উপন্যাসও রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজমালা 'রাজরত্নাকরে' লিখিত গোবিন্দমাণিক্যের উপাখ্যানের ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন। উৎসকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন প্রথম সংস্করণ রাজর্ষির পরিশিষ্টাংশে মহারাজ বীরচন্দ্র প্রেরিত উপকরণ থেকে 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিত্রম্' শীর্ষক সংস্কৃত রাজমালায় বর্জিত অংশটি সন্নিবেশিত করে। মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী যে চিত্রাঙ্গদার এবং রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনী যে বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়ার মৌলিক ভিত্তি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধকাহিনীসমূহ থেকে তাঁর নাটকের কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহ করেছিলেন। 'মহাবস্তু-অবদান' থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন দুইটি নাটকের কাহিনী : মালিনী নাটকের কাহিনী এবং পরিশোধ গীতিনাট্য ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের ভিত্তি যে কথা ও কাহিনীর পরিশোধ কবিতা, তার কাহিনী। কুশজাতক থেকে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন রাজা এবং শাপমোচনের মৌলিক কাহিনীটি। চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্যের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল শার্দূলকর্ণাবদান থেকে।

এই সমস্ত প্রাচীন পুরাণ এবং উপাখ্যান বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ যদি কোন নাটকের কাহিনী রচনায় সমকালীন লেখকের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন তাহলে সে বাল্মীকিপ্রতিভার ঘটনাবস্তু পরিকল্পনায় ভোরের পাখী বিহারীলালের সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের দ্বারা। কাহিনীর মূল ভিত্তি

হানিল শবরে বাণ,<br>
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,<br>
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়—

এবং সেই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির শোক এবং শ্লোকোচ্চারণের কাহিনী রামায়ণেই আছে। কিন্তু বিহারীলাল সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গে শোকার্ত মুনিবর কর্তৃক

আদি শ্লোকোচ্চারণের কথা বলেন নি, তিনি নিজস্ব কল্পনায় বলেছেন স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাবের কথা—

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

এবং শোকার্ত মুনিকে একবার, শোকার্ত ক্রৌঞ্চীকে একবার দেখে, সরস্বতীর বীণা বিষাদিনী কাতর করুণাভরে সকরুণস্বরে বেজে উঠল। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বাল্মীকিপ্রতিভায় রামায়ণের মা নিষাদ ইত্যাদি শ্লোকোচ্চারণ কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন তেমনি বনে একাকিনী হারিয়ে-যাওয়া বালিকার ছদ্মবেশে স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাবের কথাও বলেছেন। রবীন্দ্র-রচনায় রামায়ণ ও বিহারীলালের কল্পনার সামঞ্জস্যবিধান হয়েছে। সারদামঙ্গলে শোকার্ত বাল্মীকির ললাটে 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' সরস্বতীর অলৌকিক আবির্ভাবের কথা আছে, আর বাল্মীকিপ্রতিভার পরিণামে সরস্বতী বলেছেন, 'দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে গলাতে পাষাণ তোর মন—।'

এই নবীন কল্পনার জন্য যে সত্যই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট ঋণী, এই সিদ্ধান্ত যে অনুমানাত্মক নয় তার স্বপক্ষে যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা চলে, তেমনি বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেওয়া যায়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।' সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গে বাল্মীকি 'এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার' বলে সরস্বতীকে আহ্বান করেছে এবং লক্ষ্মী বা কমলাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর!

গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম রূপে এবং বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ দুই ক্ষেত্রেই দেখি লক্ষ্মী যখন 'কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে' বলে বাল্মীকিকে প্রলোভন

দেখিয়েছে তখন বাণীসাধক বাল্মীকি সারদামঙ্গলের অনুরূপ ভাষায় লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করেছে—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না—
এসো না এ দীনজনকুটীরে।

সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গের তেত্রিশ সংখ্যক স্তবকে বাল্মীকি সরস্বতীকে বন্দনা করেছে এবং সরস্বতীর বর ব্যতীত তার কী অবস্থা হবে তা কল্পনা করেছে—

অদর্শন হলে তুমি
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বন-ফুল-বনে !
'হা দেবী, হা দেবী' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণবালা ভাসিবে নয়ন-জলে।

বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম রূপে সরস্বতীকে সম্বোধন করে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে বাল্মীকি এই কথাগুলি বলেছে। 'ত্যজি' হয়েছে বাল্মীকিপ্রতিভায় 'ত্যেজি', এই তুচ্ছ পরিবর্তন ছাড়া আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে বিহারীলালের স্তবকটির শেষাংশে।

'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার
হেরিব জগৎ শুধু আঁধার ! আঁধার !

বিহারীলাল থেকে প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত এই অংশটি অবশ্য বাল্মীকি-প্রতিভার পরবর্তী সংস্করণ থেকে বর্জিত হয়। কিন্তু এই সব প্রমাণের জোরে বলা যায় বিহারীলালের ইঙ্গিতকে ব্যবহার করে বাল্মীকির কবিত্বলাভের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ নবরূপ দান করেছেন। শোকার্ত বাল্মীকির সম্মুখে প্রথমে বালিকার ছদ্মবেশে, পরে স্বমূর্তিতে সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশেই বিহারীলালের পরিকল্পনার অনুগামী। সুতরাং বাল্মীকিপ্রতিভার ভিত্তিতে বলা যায় যে অন্যান্য নাট্যকারগণ যেমন অন্যের কাহিনী বা ঘটনাবস্তু অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন, তেমন রবীন্দ্রনাথও করেছেন অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে নাটকের কাহিনীর শাখাপ্রশাখার জন্যও যেমন কোন কোন নাট্যকার অন্যের কল্পিত ঘটনাবস্তুর উপর নির্ভরশীল, বিহারীলালের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ তেমন সর্ববিস্তারী নয়। তাছাড়া এই কাহিনী ভারতীয়মাত্রেরই সাধারণ উত্তরাধিকার ॥

## দুই

## রবীন্দ্রনাট্য : সংস্করণগত পরিবর্তনের পরিচয়

নানা সংস্করণে রবীন্দ্রনাট্যের যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে সেই ক্রমান্বয় পরিবর্তন-পর্যায় আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু নয়। আমাদের বর্তমান পৃথিবীর অন্তরালে যেমন বহু বিচিত্র অসংখ্য ভূস্তর বিদ্যমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের বর্তমান আকারের অন্তরালে রয়ে গেছে নানা সংস্কার-সংশোধনের ইতিহাস। এই ভূস্তরের প্রকৃতি-পরিচয় যেমন ভূতাত্ত্বিকের দীর্ঘকালীন সবিনয় গবেষণায় উদ্ধার করা সম্ভব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই সংস্করণে-সংস্করণে পরিবর্তন, এ বিষয়ে যাঁরা খবর রাখেন তাঁদের মতে, এক গবেষণাগোষ্ঠীর বিশ বৎসরব্যাপী চেষ্টায় ও শ্রমে সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব। এই সব পাঠভেদ শুধু মুদ্রিত সংস্করণসমূহে ছড়িয়ে নেই, তাহলে কাজ অত্যন্ত সহজ হতো। এই পরিবর্তন-ইতিহাস ছড়িয়ে আছে অভিনয়কালে ব্যবহৃত কপিতে কবিকর্তৃক সংশোধনে, কখনও পাণ্ডুলিপিতে। যদিও এই পরিবর্তন-পর্যায়, আমরা সীমাবদ্ধ অর্থে যে রূপান্তরের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি বস্তুত তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি ব্যাপক অর্থে এগুলিও রূপান্তর বলে এবং বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলে, এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই জাতীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। কয়েকটি নাটকের সংস্করণগত রূপান্তরের উদাহরণ দিলে এই প্রক্রিয়ার বিপুলতার পরিমাণ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হবে।

বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধের বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে ( ভাদ্র ১৩৩৫ ) প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ দৃশ্যটি নাই। ইহা ছাড়াও অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে।' বাল্মীকিপ্রতিভার শেষে যেখানে সরস্বতীর আশিস্-

বচন আছে তার পূর্বে ঐ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বাল্মীকির সরস্বতীবন্দনা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণ প্রস্তুতির সময় ঐ বন্দনাগান বর্জিত হয়। রাজা ও রানী নাটক শুধু যে পরবর্তীকালে তপতী নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল তাই নয়, রাজা ও রানী নাটকটিও নানা পরিবর্তন-পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংস্করণে পৌছিয়েছে। 'রাজা ও রানীর দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বিস্তর পরিবর্তন করেন, আয়তনে অধিক হয়; অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে বহু অবান্তর বিষয় ছিল, সেগুলি কাটিয়া-ছাঁটিয়া ছোট করেন; আমরা সেই পরিবর্তিত সংস্করণই গ্রন্থাবলীতে পাই' (রবীন্দ্রজীবনী, ১)। প্রথম সংস্করণের ১।৫ দৃশ্যের কিছু অংশ বর্তমান সংস্করণ থেকে বর্জিত হয়েছে। বর্তমানে যেখানে ২।৩ দৃশ্য আছে পূর্বে সেখানে অন্য দৃশ্য ছিল। প্রথম সংস্করণের ৪।২ দৃশ্যে জালন্ধরে বিক্রমের শিবিরদ্বারে সুমিত্রা-সেনাপতির সংলাপ এবং শিবির-প্রবেশার্থী সুমিত্রাকে সেনাপতি কর্তৃক বাধাদান ছিল, বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে ঐ দৃশ্য বর্জিত হয়েছে। আরো কয়েকটি দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়েছে। যেমন, প্রথম সংস্করণের ৫।৭ দৃশ্যে ছিল কুমারকে বন্দী করার জন্য রেবতী কর্তৃক যুধাজিৎ-কে উত্তেজনাদান, এবং ৫।১০ দৃশ্যে কুমার কর্তৃক কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন ও বিক্রম কর্তৃক তাকে রাজটীকা-দানে অভ্যর্থনার দৃশ্য দেখে প্রজাবৃন্দের আনন্দ। গ্রন্থপরিচয় থেকে আরো জানি, "তপতী রচনার কিছুদিন পূর্বে রাজা ও রানীর অভিনয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিবার কথা কবি যে উল্লেখ করিয়াছেন (তপতীর ভূমিকায়) সেই অভিনয়কালে (১৯২৯) সংস্করণের নাম ছিল ভৈরবের বলি। ভৈরবের বলির অভিনয়পত্রীতে উহাকে 'রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবিকৃত নূতন সংস্করণ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।" এই অভিনয়কালীন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। ভৈরবের বলির পাণ্ডুলিপির জোরে বলা যায় মুদ্রিত সংস্করণের পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাট্যের ইতিহাস একমাত্র পরিবর্তন নয়, এইরূপ পাণ্ডুলিপি আকারেও পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উপকরণ বিধৃত রয়েছে। রাজা ও রানী থেকে তপতীতে বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনাকালে শুধু রাজা ও রানীর সংস্করণগত পরিবর্তনকে হিসাবে নিলে চলে না, তার সঙ্গে ভৈরবের বলির পাণ্ডুলিপির আলোচনাও দরকার।

প্রথম সংস্করণে বিসর্জন যা ছিল ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে সংকলিত হওয়ার সময় তার বিশেষ পরিবর্তন করা হয়। রাজর্ষির উত্তরাধিকার-স্বরূপ প্রথম সংস্করণে যে হাসি এবং হাসির কাকা কেদারেশ্বর চরিত্র এসেছিল, এই

পরিবর্তনের ফলে শুধু সেই দুইটি চরিত্র নয়, অপর্ণার অন্ধপিতার চরিত্রও, নাট্যসংগতির প্রয়োজনে বর্জিত হয়। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে বিসর্জনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—"এই সংস্করণের প্রধান পরিবর্তন পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে 'পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ' ও তৎপরবর্তী অংশের যোজনা।" কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্যবিভাজনাগত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বিসর্জনের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ সম্বন্ধে গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে, "প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি পরিত্যক্ত অংশ পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে; এবং ১৩৩০ সালে লেখা সম্পূর্ণ নূতন একটি অংশও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য (এই) সংস্করণে কবি অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন। এই সংস্করণও পরে পরিত্যক্ত হয় এবং কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বনে একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। এই রূপই বর্তমানে প্রচলিত।"

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে কলকাতার শারদোৎসবের অভিনয়ের সময় এই নাটকের একটি নাট্যভূমিকা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। রাজা ও মন্ত্রীর সংলাপই এই ভূমিকা এবং এই সংলাপের বিষয় কবির নাটকের মর্মকথা। রচনাবলী সংস্করণে এই ভূমিকা বর্জিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে যখন এই ঋতুনাট্যের প্রথম অভিনয় হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তখন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের জন্য একটি নান্দী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই নান্দীও গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। বিসর্জন নাটকের সংস্করণগত পরিবর্তন বিবৃত করতে যেয়ে, নূতন সংস্করণ প্রস্তুতকালে সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে, মূল বা পূর্ববর্তী কোন সংস্করণকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। একই প্রবণতা লক্ষ্য করি রাজা নাটকের ক্ষেত্রে। রাজা নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদনে নাট্যকার জানিয়েছেন, 'এই রাজা নাটক প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।' এই সংস্করণই এখন প্রচলিত। পরবর্তী-কালে কবি রাজা নাটকটির পুনর্লিখনে পুনরায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই পুনর্লিখন সম্পূর্ণ হয় নি। এই পুনর্লিখনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত সুধীর-চন্দ্র করের কবিকথা গ্রন্থে—'কবি রাজা নাটক নূতন করে লিখতে শুরু

করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। খাতাটি থাকত কবির টেবিলেই। লেখা এগোত না, অনেক দিন এমনিতে পড়েই ছিল। রাজা নাটক অভিনয়ের সময় একদিন যখন খোঁজ পড়ল, দেখা গেল সেটির পাত্তা নেই কোথাও। কবির ক্রোধ ও মনস্তাপের সীমা রইল না।...একটি বড়ো সৃষ্টির সম্ভাবনা লোপের দুর্ভাগ্যে বহুদিন কবি ম্রিয়মাণ।...বছর খানেক বাদে...শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা শুনা গেল—কে বলে হারিয়েছে, সেটা যে রয়েছে সযত্নে তাঁর কাছেই। কবিই একদিন দান করেছেন সেটি নিজ কন্যা মীরা দেবীকে। সেখান থেকে স্নেহোপহারে জিনিসটি স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র।...তাঁর ( কবির ) বহুদিনের মনের ভার নেমে গেল। কিন্তু সে লেখা আর এগোল না।'

অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে নাটকের পরিবর্তন বা পরিমার্জনা করতেন এবং সেই পরিবর্তন-ইতিহাস কীভাবে নূতন সংস্করণে মুদ্রণ-চরিতার্থতা লাভ থেকে বঞ্চিত হতো এবং হয় পাণ্ডুলিপি-আকারে অথবা অভিনয়কালে ব্যবহৃত নাটকের কপিতে কবির হস্তাক্ষরে সেই ইতিহাস রক্ষিত হতো, তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পাই শেষের রাত্রি গল্পের নাট্যরূপান্তর গৃহপ্রবেশের ক্ষেত্রে। গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায়, "কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপলক্ষে ( ১৯২৫ ) এই নাটকে অনেক অংশ সংযোজন বর্জন ও 'টুকরি' ও 'বোষ্টমী' নামে নূতন দুইটি চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে কেবলমাত্র সেই সংযোজনগুলি" রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সম্পাদকমণ্ডলী মুদ্রিত করেছেন। এই অংশ থেকে পরিবর্তন-ইতিহাসের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'নাটকের মধ্যে প্রায়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন ( রবীন্দ্রনাথ ) করতেন। কখনো দেখি নি কোন নাটক আরম্ভে যেভাবে লিখেছিলেন অভিনয়ের দিন ঠিক সেই ভাবেই অভিনয় করিয়েছেন।...মনে সম্পূর্ণতার যে চিত্র একবার এঁকেছেন বাইরে তার সুষ্ঠ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন নি। কতবার দেখেছি যেদিন অভিনয়, সেদিন সকালে নাটকে একটি নূতন অংশ যোজনা করেছেন। অনেক সময় বেশ বড়ো অংশও জুড়েছেন।' অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে এই জাতীয় পরিবর্তন বা সংযোজনা করতেন। 'লখনৌতে ( শাপমোচন ) গীতাভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কবি কলিকাতায় উহার অভিনয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। কবি কলিকাতা হইতে বোধহয় ৭ মার্চ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ও

শাপমোচনকে নূতন করিয়া গীতেনৃত্যে ভরিয়া নূতন কলেবরদানে প্রবৃত্ত হইলেন' ( রবীন্দ্রজীবনী, ৩ )। বোম্বাই-এ তাসের দেশ অভিনয়কালে 'এই নাটকের মধ্যে কথোপকথন বেশী থাকায় কবি বুঝিলেন যে দর্শক-শ্রোতার পক্ষে তাহা তেমন বোধগম্য হয় নাই। সেজন্য পরদিন অনেক নূতন গান ও নৃত্য সংযোজন করিয়া অভিনয়কে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন' ( রবীন্দ্রজীবনী, ৩ )।

কী অবস্থার মধ্যে এবং কী ভাবে এই সংস্কার সংশোধন ও পরিবর্তন করা হতো সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরো দুইজন পার্শ্বচরের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যায়। অরূপরতন নাটক অভিনয়ের নিতান্ত পূর্বাহ্নে এই নাটকের কী দ্রুত এবং কী সামগ্রিক সংস্কারান্তর হয়েছিল তার বিবরণ এই দুজনের স্মৃতিকথা থেকে পাই। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রবিচ্ছবি গ্রন্থের অভিনয় উৎসব প্রবন্ধে লিখেছেন—'একই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অভিনয় করতে গেলে তার কিছু না কিছু পাঠান্তর ঘটবেই, এ ছিল প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। কোন পুরানো নাটকের অভিনয় করার উদ্যোগ হলেই সকলে থাকত সন্ত্রস্ত। মহড়ার সময় থেকেই শুরু হতো কাটছাঁট, অদলবদল। কখনো কখনো একরাত্রি অভিনয়ের পর, দ্বিতীয় অভিনয়েও পরিবর্তন চলত। তখন অভিনেতা ও গানের দলকে পরিবর্তিত নাট্যাংশ ও নূতন গান অভ্যাস করে নিতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হতো।…'

একটি বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটক লিখলেন ১৩১৬ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে হলো তার যথারীতি পরিবর্তন। দশ বছর পরে ১৩২৬ সালে অরূপরতন রচিত হলো রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে। অরূপরতনের উল্লিখিত অভিনয়ের আগে ১৩৪২ সালে ( ১৯৩৫ ) নাটকের উপর আবার চলল কলম, অরূপরতন হলো পুনর্লিখিত এবং পুনর্মুদ্রিত। কিন্তু তারপরেও ঘটল আর এক কাণ্ড। রিহার্সাল্ চলেছে পুনর্লিখিত বই ধরে ধরে। কিন্তু এই পুনর্লিখনেও তৃপ্তি হলো না রবীন্দ্রনাথের। আবার চলল তাঁর কলম, অদলবদল হলো বিস্তর। অন্তঃপুরের দৃশ্য দিলেন বদলে একেবারে উঠিয়ে, শেষের দিকে যোগ করলেন রাজা নাটকের অন্ধকার ঘরের শেষ দৃশ্যটি, তাছাড়া গানের ওলটপালট, নাগরিকদলের কথাবার্তা ইত্যাদিতে ছোটখাট পরিবর্তন তো আছেই।'

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের মনিব রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি থেকেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 'মৃত্যুর কিছুদিন আগের কথা—

অরূপরতন অভিনয় হবে। গুরুদেব নেমেছেন অদৃশ্য রাজা ও ঠাকুরদার ভূমিকায়। কলকাতায়ও যাওয়া হবে। সোৎসাহে সব আয়োজন চলছে। কবি পুরানো এক কপি হাতে নিয়ে নূতন করে বইটি লিখতে শুরু করলেন। স্থলবিশেষে অনুচরের মন্তব্য শুনতে লাগলেন, কেটে-ছিঁড়ে তিনিও চললেন লিখে। এদিকে সময় হয়ে গেল অভিনয়ের। সে-খেয়াল হতেই গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নূতন লেখা অংশ এত যোগ হয়েছে যে, পুরানোটা আর মনে লাগছে না;—আদেশ হলো বইটাকে ২য় সংস্করণ করে ছাপাবার। গোটা বইয়ের প্রুফ্ আসছে আর গোটা বইটা ব্যাপীই চলছে পরিবর্তন। এরূপে ৬/৭ বার প্রুফ্ আসার পর তাড়া পড়ল,—একদিনের মধ্যেই চাই ছাপানো বই—গোটাটাই, অন্ততঃ আটদশ কপি।...সৌভাগ্যের কথা, শান্তিনিকেতন-প্রেস-কর্মীদের তৎপরতায় বই সেদিন ছাপা হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার আগেই।'

শান্তিদেব আরো দেখিয়েছেন, 'যাদের নিয়ে অভিনয় করাবেন তাদের কথাও রচনার সময় তাঁকে ভাবতে হয়েছে এবং সেই অনুসারে বহু সময়ে তাঁকে নাটকে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে।' শান্তিনিকেতন-পর্বের পূর্ব পর্যন্ত নাটকগুলি বাড়ির ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়বন্ধুদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল, সেই কারণে এই যুগের নাটকে স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র সমানভাবে স্থান পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে শারদোৎসব, মুকুট, অচলায়তন, ফাল্গুনী ও ডাকঘর। সব কয়টি নাটকই স্ত্রী-চরিত্র-বর্জিত, কেবল ডাকঘরে অল্পসময়ের জন্য ছোট একটি বালিকা আছে। এই ধরনের নারীচরিত্র-বর্জিত এতগুলি নাটক তাঁকে লিখতে হয়েছিল সে যুগের শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। তখন সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, এ ছাড়া সে সময়ে মেয়েরা প্রকাশ্যে ছেলেদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করবে, শান্তিনিকেতনের সমাজও তা মেনে নেয় নি। আবার শান্তিনিকেতনের শেষ পর্বে, যখন সেখানে নাচের চর্চা আরম্ভ হয়েছে, নৃত্যকুশল অভিনেতা-অভিনেত্রী পেয়েছেন, তখন তিনি নৃত্যনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুলভতা-দুর্লভতা বশতঃ শুধু যে নানা যুগের নাটক রচিত হয়েছে তাই নয়, একই কারণে বিভিন্ন সময়ে একই নাটকের অভিনয়কালে নানা সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়ে শান্তিদেবের প্রদত্ত সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। '১৩২৬ সালে রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটি হলো। তার

নামও পরিবর্তিত হয়ে হলো অরূপরতন। সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য সব নারীচরিত্র বাদ গেল। তখনও ছেলেমেয়েদের একত্র অভিনয়ে অনেকের আপত্তি ছিল। সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা বাদ গেলে নাটকের কিছুই থাকে না, তাই তাদের কোনো পরিবর্তন হয় নি। 'গানের দলের' গান হিসাবে চব্বিশটির বেশী গান এই ক্ষুদ্রনাটকে জোড়া হয়েছিল। সুরঙ্গমার গান কমে গিয়ে মাত্র একটিতে দাঁড়াল। নব সংযোজিত 'গানের দল' তার অনেক গান গ্রহণ করল। এছাড়া ঠাকুরদা, বাউল, বালকদের গান রয়েছে। শান্তিনিকেতনে তখনো অভিনয়ে, গানে ছেলেদের দলের প্রাধান্য বেশী। এর প্রভাব রয়েছে এই পরিবর্তনে।...১৩৪২ সালে কলকাতায় শেষবার গুরুদেব অরূপরতন অভিনয় করালেন।.. এবারে সুরঙ্গমার গান অনেক বাড়ল। কারণ নাচের যুগ এখন। গানের ভাব নৃত্যে প্রকাশ করা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে।...কিছু নারীচরিত্র আবার নতুন করে স্থান পেল। আগেকার 'গানের দল' আর রইল না। তার প্রয়োজন তখন ফুরিয়েছে।' এই প্রসঙ্গে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা উল্লেখ করা যায়। শান্তিনিকেতনে জীবনসায়াহ্নে একবার ডাকঘর অভিনয়ের সময়ে মাধবদত্তের ভূমিকায় উপযুক্ত অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছিলেন না। তখন কোন একজন মহিলার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা তাঁকে জানানো হয়। তার ফলে মাধবদত্তের সঙ্গে তার স্ত্রীচরিত্রকে নাটকে ঢোকালেন। মাধবদত্তের কথা প্রায় কিছুই রাখলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এইভাবে নাটকটির অভিনয় হয় নি।

এই জাতীয় সংস্কার-পরিমার্জনা-সংশোধনগত ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত সংস্করণগুলিকে একই নাটক বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু কোন কোন সময়ে এই পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ গুণগত পরিবর্তন বলে মনে করেছিলেন, শুধু সংস্কার বলে মনে করেন নি; ফলে সেই পরিবর্তিত রূপকে পূর্বরূপ থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য তিনি নাটকটিকে নূতন নামে চিহ্নিত করেছিলেন। একই নাটক যখন পরিবর্তিত হয়ে নূতন নামে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা পেয়েছে তখন সেই পরিবর্তনের প্রকৃতির মধ্যে আমরা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করি—কোন কোন অবস্থায় পূর্বরূপ আর পরিবর্তন না করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে একই বিষয় একই ঘটনাবলী অবলম্বনে নূতন করে নাটক লিখেছেন, আবার কোন সময়ে আংশিক সংস্কৃত রূপটিকেও

নূতন নামে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা যেমন আমাদের আলোচ্য, তেমনি নাটক যেখানে গুণগত পরিবর্তনে অন্য নাটকের মর্যাদা পেয়েছে, সেই রূপান্তরও আমাদের আলোচনার বিষয়।

## তিন

## রূপান্তর যেখানে নামান্তর

রবীন্দ্ররচনাবলীতে একশ্রেণীর নাট্যরূপান্তর দেখা যায় যেখানে পরিবর্তন নিতান্ত সামান্য—এতোই সামান্য যে তাকে নামান্তরমাত্র বলা চলে। এর প্রধান উদাহরণ গোড়ায় গলদ-এর ( ১৮৯২) ছত্রিশ বছর পরে শেষরক্ষায় (১৯২৮) রূপান্তর। এই নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি কাহিনী উল্লেখ্য। "শিশির-কুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় গলদ নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তার নূতন নামকরণও করেছিলেন, শেষরক্ষা। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে শিশিরকুমারকে ডেকে একদিন সেটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন কবি। নামটিও বদলে গেছে দেখে শিশিরকুমার মন্তব্য করেন, 'গুরুদেব, দর্শক আনার পক্ষে গোড়ায় গলদ নামটি কিন্তু বেশ ছিল।' কবির চোখের কোণে চকিতে একটি মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। পরক্ষণে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে হতাশার ভান করে কবি বললেন, গোড়ায় গলদ ছিল, কেটেকুটে শেষরক্ষা করলাম, তাও তোমার মন পেলাম না, শিশির" ( দেশ ৩২ বর্ষ ১৫ সংখ্যায় অমল মিত্রের প্রবন্ধ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার )।

দুই রূপের মধ্যে প্রহসনের রসে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, শুধু প্রথম রূপের কমেডিধর্ম দ্বিতীয় রূপে প্রবলতর হয়েছে। এই কমেডিধর্মকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বোধহয় রূপান্তরে বিনোদের বিবাহদৃশ্য না দেখিয়ে অন্তিমে গদাইয়ের বিবাহদৃশ্য দেখিয়ে মধুরে নাটকের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। পরিবর্তনের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য, নিমাইয়ের বদলে নায়কের গদাই হাস্যকরভাবে আপত্তিকর এই নামকরণ এবং মোজা ও ফুলুরির পরমকৌতুকপূর্ণ আশ্চর্য উপাখ্যানটির যোগ। অঙ্কদৃশ্য সংক্ষিপ্তি ও

সংহতির প্রয়োজনে স্থানান্তরিত বা একত্রিত হয়েছে কখনো কখনো—দীর্ঘ সংলাপ অনেক ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হারিয়েছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই রূপান্তর সাধিত হওয়ায় ভাষারীতির মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাষা পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

গোড়ায় গলদ

নিমাই॥ কী চমৎকার রূপ! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি। চোখে মুখে কেমন উজ্জ্বল জীবন্তভাব! বা, বা! আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! পুরুষের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ওইটুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর ওই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

শেষরক্ষা

গদাই॥ কী চমৎকার। আর কী উপস্থিত বুদ্ধি। বা, বা। আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে। নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

রূপান্তরে নাট্যকার বিস্ময়-উৎপাদনের দায়িত্ব 'বিস্ময়চিহ্নের উপরে না দিয়ে অভিনেতা ও পাঠকের উপর যে শুধু অর্পণ করেছেন তাই নয়, দ্বিতীয় রূপে ভাষা অনেক লঘু এবং ত্বরিতগতি—জটিল বাক্য পেয়েছে সরলতা। নায়িকাকে পুরুষের কাপড়ে কেমন চমৎকার মানিয়েছিল তা উপলব্ধি করার দায়িত্ব দর্শকের চোখের উপর এবং পাঠকের কল্পনার উপর এখন লেখক ছেড়ে দিয়েছেন। 'একদম' শব্দের যোগে গদাইয়ের বিস্ময়ের চূড়ান্ততা সঙ্গত প্রকাশ পেয়েছে।

আশ্রমের বিদ্যার্থী শিশুমনের বিকাশ এবং প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সেই শিশুমনের নিবিড় যোগসাধনে সাহায্য করার শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলি রচিত। এই জাতীয় প্রথম ঋতুনাট্য

শারদোৎসব। ১৯২১ সালে শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হয়ে নূতন ভূমিকা ও চরিত্র নিয়ে ঋণশোধ নাটকে রূপান্তরিত হয়। রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে জানানো হয়েছে 'ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখরচরিত্রের সন্নিবেশ।' ঋণশোধে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও শেখরের কথোপকথনের দ্বারা যে নাট্যভূমিকা রচনা করা হয়েছিল, পূর্বে উল্লেখ করেছি কলকাতায় অভিনয়কালে শারদোৎসবের জন্য অনুরূপ একটি নাট্যভূমিকা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানারূপে শোধ করিয়া দিতেছে। এই শোধ করাটাই প্রকাশ।' সন্ন্যাসী উপনন্দকে বলেছে, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছো আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ,' অর্থাৎ উপনন্দ দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই পাচ্ছে আত্মপ্রকাশের আনন্দ। সন্ন্যাসী ঠাকুরদাকে বলেছেন—'জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে।' এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের নাম ঋণশোধ করেছিলেন পরে এবং এই নামান্তর থেকে উপলব্ধি করা যায় রূপান্তরের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঋতুনাট্যে শরৎ-প্রকৃতির বন্দনার জায়গায় তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ববস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। ঋণশোধে সন্ন্যাসী উপনন্দকে বলেছে 'বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না', অর্থাৎ দায়িত্ব পালন, ঋণশোধের মধ্য দিয়েই মুক্তি—যেমন শরৎ-সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ধরণী ঋণশোধ করে চলেছে।

## চার

## ছোটগল্প থেকে নাটক

নিজের কয়েকটি ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাট্যরূপ দেন। শেষের রাত্রি গৃহপ্রবেশ নাটকে, কর্মফল গল্প শোধবোধ নাটকে, একটি আষাঢ়ে গল্প তাসের দেশ নাটকে, মুক্তির উপায় ও মুকুট গল্প মুক্তির উপায় ও মুকুট নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। ছোটগল্পের একাঙ্ক নাটকে রূপান্তর সহজ, কিন্তু তাকে পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন নাটক করতে গেলে অবশ্যই তাতে ঘটনা ও চরিত্রের

বহুলতা-সম্পাদন প্রয়োজন হয়। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পগুলিকে পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকে রূপান্তরিত করেছেন, আকারগত এই রূপান্তর এবং আঙ্গিকগত রূপান্তর গল্প থেকে নাটক বা নৃত্যগীতপূর্ণ নাটকে রূপান্তর—কীভাবে সম্ভব হয়েছে তা কৌতুহলপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

প্রথমে শেষের রাত্রি থেকে গৃহপ্রবেশে রূপান্তর আলোচনা করলে এই পরিবর্তনের স্বরূপ সুস্পষ্ট হবে। গল্পটি এমনই সংলাপপ্রধান ও বর্ণনাবর্জিত যে গল্পটিকে একটি নাটিকাই বলা চলে। তাই এই গল্পের নাট্যরূপান্তর এমন সহজ হয়েছে। গল্পের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিভাগগুলি আছে তাকে মাত্র ঘটনা-চরিত্র ও সংলাপের বহুলতার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ একএকটি নাটকীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শেষের রাত্রিতে বাউলের একটি গানের কথা যতীনের মনে পড়েছিল। গৃহপ্রবেশে হিমির মুখে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বসিয়েছেন। এই হিমি এবং অখিল সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র। সুতরাং হিমির প্রতি অখিলের আসক্তি, বাড়িবন্ধকের ব্যাপারে অখিলের চক্রান্ত সম্পূর্ণ নূতন উপাদান, যেগুলি গল্পে স্বভাবতই অনুপস্থিত ছিল। পাটের ব্যবসায় সংক্রান্ত কথাবার্তাও নূতন এসেছে—নাটকের পিছনে যে বাস্তবজীবনযাত্রা তারই দ্যোতনার উদ্দেশ্যে। ডাক্তারচরিত্র ও প্রতিবেশিনীরা প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক গড়ে তোলার প্রয়োজনে। এই চরিত্রগুলির উপস্থিতির সুযোগে রবীন্দ্রনাথ মণি ও মাসির সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা ও প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। গল্পে মণি ছিল শুধুই নিষ্ঠুর এবং সেই নিষ্ঠুরতা ছিল অনেক পরিমাণে অব্যাখ্যাত। কিন্তু নাটকে মণির আচরণ অনেক বেশি সংগত। এখন তাকে তত নিষ্ঠুর মনে হয় না, যত মনে হয় তার নারীত্ব অজাগ্রত এবং বেদনাবোধের অভাবে সে অপূর্ণ। নাটকে তাই মণির প্রতি অবিচার কম।

শেষের রাত্রির অনেক সংলাপ ভেঙে, বিস্তারিত করে, রূপান্তরিত করে নাটকে ব্যবহার করেছেন। যেমন, পিত্রালয়ে যাবার প্রস্তাব নিয়ে মণি ও মাসির সংলাপ, উইল সম্পর্কে মাসি ও যতীনের কথা, মাসি যেখানে মেয়ে হয়ে জন্মানো বিষয়ে উক্তি করেছে সেখানকার সংলাপ। অধিকাংশ সংলাপ স্বভাবতই সম্পূর্ণ নূতন রচনা কিন্তু যেখানে গল্পের সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখে নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে তার রূপান্তরের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

### শেষের রাত্রি

"বউ, তোমার বাপের বাড়ির থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।'

"হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি আমি যাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো?

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী করে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে—শুনেছি, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি বলে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

### গৃহপ্রবেশ

( প্রায় অবিকৃত প্রথম অংশের পরে )

মাসি॥ ও মা, সে কী কথা। যতীনকে একলা ফেলে যাবে?

মণি॥ ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি॥ খুব বেশি দেরি হবে কি না তা কে বলতে পারে, মা। সময় কি আমাদের হাতে। চোখের এক পলকে দেরি হয়ে যায়।

মণি ॥ তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি ॥ তোমার মায়ের ভাব, বাছা, বুঝতে পারি নে—কান্নার সাতসমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তবু তিনি মানুষের এত বড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলই তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান—

মণি ॥ দেখো মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কয়ো না বলছি। তবু যদি আপন শাশুড়ি হতে, তা হলেও না হয় সহ্য করতুম, কিন্তু—

মাসি ॥ আচ্ছা মণি, অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশুড়ি হয়ে তোমাকে কিছু বলছি না, আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষের মতোই মিনতি করছি—যতীনের এই সময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি ॥ তা জানি, তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি ॥ তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতে হয়, আমার মনে যা আছে খুলেই লিখব। ( ১ )

এই রূপান্তর পর্যালোচনা করলে দেখি, প্রথমত 'ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো?' এই জাতীয় একটি-দুটি বাক্য বর্জিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, নাটকের অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চারণসৌকর্যের জন্য 'তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—' সংলাপটিকে সুস্পষ্টভাবে দুইটি বাক্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং জড়তামুক্তির প্রয়োজনে একটি বাক্যাংশকে বর্জন করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রচলিত সহজ ভাষার মধ্যে এসেছে এক মুহূর্তে কবিত্বের স্পর্শ বেদনার গভীরতায়—'কান্নার সাতসমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ।' বহু ক্ষেত্রে মূল রচনার সংলাপ অংশকে বিস্তারিত করতে হয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকের প্রয়োজনে। সংলাপগত পরিবর্তনের ফলে চরিত্রগত পরিবর্তনের আভাসও লক্ষিত হয়। গল্পের মণির মত নাটকের মণি অত সংকোচদ্বিধাগ্রস্ত নয়, মণি নিজের অধিকার সম্বন্ধেও নাটকে বেশি সচেতন, মাসির প্রতি মণির বিরুদ্ধ মনোভাব নাটকে

যত নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনভাবে গল্পে প্রকাশ পায় নি। গল্পে মাসি নিষেধ করেছে, নাটকে মাসি মিনতি করেছে। সুতরাং বলা যায় সংলাপের পরিবর্তন চরিত্র-পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।

নাটকের কোন কোন জায়গায় সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গল্প থেকে গ্রহণ করায় কী জাতীয় অন্যমনস্কতার চিহ্ন রয়ে গেছে তার একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দিই। নাটকের প্রথম অঙ্কে, যেখানে ডাক্তারের সঙ্গে যতীনের কথোপকথন সম্পূর্ণ নূতন রচনা সেখানে যতীনের বাবার 'ক্লাসফ্রেণ্ড' ডাক্তার যতীনকে তুমি বলেছে এবং যতীন ডাক্তারকে আপনি বলেছে। কিন্তু নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে যেখানে মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ডাক্তারের সঙ্গে যতীনের কথোপকথন গল্প থেকে প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে—

শেষের রাত্রি

"দেখুন, আপনি ( মাসি ) ওঁর কাছে থাকলে উনি ( যতীন ) বড়ো বেশি কথা কন।"

গৃহপ্রবেশ

ডাক্তার॥ আপনি ( মাসি ) ওঁর ( যতীন ) কাছে থাকবেন না —আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—। (২)

কিংবা ঠিক তার পরেই—

শেষের রাত্রি

"তা হলে তোমরা ( ডাক্তার ইত্যাদি ) যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।"

গৃহপ্রবেশ

ডাক্তার॥ এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।

যতীন ॥ তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না। (২)

সেখানে রবীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হয়ে, আগেকার সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখেছেন বলে নাটকে-কৃত পূর্বের পরিবর্তন ভুলে, যতীনকে দিয়ে তুমি এবং ডাক্তারকে দিয়ে আপনি বলিয়েছেন।

গল্প ও নাটকের শেষে একইভাবে মণির প্রত্যাবর্তন। সংলাপ দুই ক্ষেত্রেই প্রায় এক। কিন্তু গল্পে ব্যাপারটি মাসির স্তোক বলে এবং যতীনের মৃত্যুমুখী আচ্ছন্নতা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ('কে এসেছে। স্বপ্ন?'), যদিও 'শ্বশুর এসেছেন' নাটকে মণির প্রত্যাবর্তন বাস্তব প্রত্যাবর্তন বলে ধরে নেওয়া

যেতে পারে। কিন্তু নাটকে 'মণির প্রবেশ' তিলেক সন্দেহও অবশিষ্ট রাখে না। অথচ মণির এই প্রবেশ তার পরিবর্তন স্বচনা করে কিনা, নারীত্বের জাগরণ স্বচনা করে কিনা, কোন ক্ষেত্রেই তা বোঝার উপায় নেই। পায়ের উপর পড়া প্রথার প্রতি আনুগত্য, না আন্তরিক পরিবর্তনের স্বচনা, আমরা জানি না। 'দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে', যতীনের এই উক্তির সঙ্গে শেষের রাত্রি নামকরণ সংগত ছিল না, গৃহপ্রবেশ নামকরণ অনেক বেশি সংগত হয়েছে। গৃহপ্রবেশ নামের সার্থকতার দরুন মণি এবং গৃহ দুই-ই সমান মর্যাদা পেয়েছে, গল্পে মণিই প্রধান এবং এই সার্থক নামকরণের ফলে মৃত্যু যে শেষের রাত্রি নয়, সে যে মহত্তর গৃহপ্রবেশের ভূমিকা তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কর্মফল গল্পটি নাটকাকারেই লেখা। বর্ণনা নেই, শুধু পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পের অগ্রগতি হয়েছে। নাটকেরই মতো গল্পটিতে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ-প্রস্থান নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাটকের ধরনের লেখা বলে গল্পে যে পরিচ্ছেদের বিভাগ করা হয়েছে সেগুলি বস্তুত দৃশ্যেরই বিভাগ। তাই কর্মফল গল্পটিকে শোধবোধে পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দিতে যেতে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ কোন বেগ পেতে হয় নি, বিশেষ কোন পরিবর্তন করতে হয় নি। নলিনীর বন্ধুরূপে নাটকে চারুবালা স্থান পেয়েছে, নন্দী কিঞ্চিৎ অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এবং নন্দী-চারুবালা-নলিনী ও নলিনীর পিতামাতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত সোসাইটির অন্তঃসারশূন্যতা গল্পের থেকে আরো বেশী প্রখরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ভাদুড়ি পরিবার নাটকে লাহিড়ি পরিবার হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নলিনীর জন্মদিনোৎসব-বিবরণ সম্পূর্ণ নূতন রচনা। সোনার গুড়গুড়ির ব্যাপার, নলিনী কর্তৃক স্পষ্টভাবে নন্দীকে প্রত্যাখ্যান, নন্দী-চারুবালার নূতন সম্পর্ক, নাটকের এই উপাখ্যানগুলির বীজ গল্পে ছিল না। এগুলি নূতন উপাদান। অন্য দৃশ্যগুলি, গল্পের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ যোগ করে সামান্য কিছু পরিবর্তন ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ সম্প্রসারণের দ্বারা রচিত। গল্পের কয়েকটি পরিচ্ছেদকে যুক্ত করে নাটকের একটি দৃশ্য রচনার প্রয়োজনে নাটকে আমরা এত বারবার পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান পাই। চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্য গল্পের একাদশ থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ আনুগত্যে রচিত। উল্লেখযোগ্য কোন যোগের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত দেখা যায় নি। নিজ সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি নলিনীর ঘৃণা

শোধবোধ নাটকে তীব্রভাবে প্রকট। কিন্তু কর্মফল গল্পেও সেই মনোভাব কম স্পষ্ট নয়।

'একটি আষাঢ়ে গল্পে' সেই তাসের রাজ্যের কথা পাই যেখানে 'চমৎকার শৃঙ্খলা'। কিন্তু 'বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত' এসে সব ওলটপালট করে দিল—হরতনের বিবি নারী হয়ে উঠল রাজপুত্রের প্রতি প্রেমে। হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় পরিণামে বিবাহসিদ্ধি পেল, তারা হলো তাসের দেশের রাজা ও রানী। 'ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।' এই গল্পের মূল ভিত্তি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যগীত সম্বলিত তাসের দেশ নাটক রচনা করেছিলেন। এখানে রূপান্তর শুধু নয়, যেন জন্মান্তর ঘটেছে। নবরূপে শুধু নির্জীবতা নিন্দিত এবং প্রাণ বন্দিত হয় নি, এখানে প্রাসঙ্গিক আরো নানা বিষয়ে ব্যঙ্গ-পরিহাস করা হয়েছে। হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় এবং পরিণয়ের মধ্য দিয়ে গল্পের যে সুন্দর সমাপ্তি ছিল, তাসের দেশে সেই মাধুর্য নেই। তাসরাজ্যের প্রজাসাধারণের দলবদ্ধ মুক্তির মধ্যে সেই মাধুর্য নেই, যে মাধুর্য ছিল একজনের হৃদয়ে প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রাণের আবির্ভাবে। ফলে, গল্পে যা অনুপস্থিত ছিল, সেই তীব্রধার ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারধর্মই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্তবিধি, সংস্কারনিয়ম, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি-বিবরণ, খবরের কাগুজে ভাষা, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। গল্পে যা ইশারায় ছিল, যেমন তাসিনীদের ঈর্ষা, নাটকেব বৃহত্তর পরিসরে তা বিস্তারিত। গল্পে স্বভাবতই গান যোগের কোন সুযোগ ছিল না—নাটকে গানগুলি নূতন যুক্ত হয়েছে। এই গানগুলির ভাষা-বৈচিত্র্য এবং ভাবের সঙ্গে ভাষা ও সুরের সহধর্মিতা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

এই বিদ্রূপাত্মক নৃত্যগীতময় নাট্যের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কোথায় পেয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর যাত্রী গ্রন্থের জাভাযাত্রীর পত্র পড়লে। একটি উদ্ধৃতি দিই—'কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাত্রে যে দুইজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ পরে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে ওর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হলো না।…নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল।'

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহার ( অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ) তাসের দেশ একান্তভাবে মুখোষনৃত্যের উপযোগী।' লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে শুধু মুখোষব্যবহারের সাহায্যে নাট্যরস পরিবেশন করেছেন তা নয়, জাভায় যেমন নৃত্যের শিল্পগুণ অক্ষুন্ন রেখে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-পরিহাসের রস পরিবেশনের দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন, এখানে তেমনি কথা-সুর-নৃত্যের সমবায়ে শিল্পের শোভনতা বজায় রেখে তিনি সেই বিদূষকতার রস তাসের দেশে প্রবাহিত করেছেন। আরো একটি উদ্ধৃতি দিলে তাসের দেশের প্রেরণা যে তিনি দ্বীপময় ভারতে অর্জন করেছিলেন সে কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোষ পরা নটেদের অভিনয়।...আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাবপ্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোষ তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ পরে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্য অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা।' তাই রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশের গানগুলিতে এমন সুরারোপ করেছেন যাতে তাসের মুখোষ পরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করা সম্ভব হয়। মুখোষের স্থির ভাবটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৃত্য ও অঙ্গচালনা করার জন্যই তাসের দেশের গানে ঐ জাতীয় সুরারোপ করা হয়েছে। সুরের বিশেষত্বের দ্বিতীয় কারণ, পরিহাসের পরিবেশন, শুধু কথার মাধ্যমে নয়, সুরেরও মাধ্যমে। এই তাসের দেশে রাজপুত্র এবং তার বন্ধুরাই একমাত্র ব্যক্তি, এই দেশের আদি বাসিন্দারা সবাই নিতান্ত শ্রেণীগত মানুষ—ছক্কাপাঞ্জার দল। তাই শ্রেণী বোঝানোর জন্য তাদেরই মুখে মুখোষ আঁটা। ভাববিকারহীন সেই মুখোষ পরে তারা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে। যে দেশের লোক মেপে অঙ্গচালনা করে, নিয়মে ওঠে নিয়মে বসে, তাদের মুখে মুখোষ এঁটে রবীন্দ্রনাথ জাভার মুখোষনাট্য দেখার অভিজ্ঞতাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। যারা নিতান্ত শ্রেণীগত মানুষ রাজপুত্রের প্রভাবে তারা হলো ব্যক্তিমানুষ—প্রকাশিত হলো তাদের

'ইচ্ছে'-শক্তি। মুখোষের বিকারহীনতা ঘুচে মুখে এখন ভাববিকারের ছায়া পড়ল।

শেষের রাত্রি এবং কর্মফল গল্প যেভাবে যথাক্রমে গৃহপ্রবেশ ও শোধবোধ নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে, মুক্তির উপায় ও মুকুট গল্পের নাটকে রূপান্তর সেই একই জাতীয়। শেষোক্ত গল্প দুইটিকে নাটকে রূপান্তরকালে তাদের নামান্তর করা হয় নি। মুকুট গল্পের নাট্যরূপান্তর সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, 'মুকুট গল্প ও নাটকের মধ্যে পটভূমিকা ও কাহিনীর বিন্যাসে কোনো পার্থক্য নাই, শুধু শেষ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু ছাড়া। গল্প যেখানে শুধুই ট্র্যাজেডি, নাটকটি সেখানে নাটকীয় কারণেই মিলনান্তক। এই পরিবর্তনে দুই কাহিনীর অন্যতম নায়ক রাজধরের চরিত্রও কিছুটা সংস্কার ও রূপান্তর আনিয়া দিয়াছে'। ( রবীন্দ্রজীবনী, ২ )

## পাঁচ

## উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর

এর পরে আমরা পাই কতকগুলি নাটক যেগুলি নিজের উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপান্তর ঘটিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নাট্যরূপান্তর-কালে সমগ্র উপন্যাসকেই ব্যবহার করেছেন—যেমন বউঠাকুরানীর হাট এবং প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কিন্তু কখনও এইরূপ রূপান্তরের সময় উপন্যাসের অংশবিশেষকে গ্রহণ করেছেন, যেমন রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

### (ক) বউঠাকুরানীর হাট ঃ প্রায়শ্চিত্ত।

বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসটির কাহিনী রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ-পরাজয় গ্রন্থ থেকে। এই উপন্যাসটির বিচিত্র নাট্যরূপান্তর-ইতিহাস আছে। উপন্যাস থেকে প্রায়শ্চিত্ত নাটক, তার থেকে এক জাতীয় নবরূপান্তর মুক্তধারা, স্বতন্ত্র জাতীয় রূপান্তর পরিত্রাণ। এছাড়া. জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট অবলম্বনে লিখিত কেদারনাথ চৌধুরীর রাজা

বসন্তরায় নাটক জনপ্রিয়তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সেই পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাসের আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে, রবীন্দ্রনাথ বউ-ঠাকুরানীর হাটের বিষয় ও ঘটনারম্ভ কীভাবে উপন্যাসের রূপ থেকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং সেই আঙ্গিকগত পরিবর্তন বিষয়গত কোন পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিনা, বর্তমানে সেই বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি। বউঠাকুরানীর হাটের প্রতাপাদিত্য স্বাদেশিকতা-প্রচারের বীর প্রতাপ নয়। জড়তা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার যে নিষ্ঠুরতা তারই প্রতীক এই প্রতাপ, সেই দিক থেকে এই প্রতাপ রবীন্দ্রনাথের রাজাধারণার বিরোধী। এই প্রতাপের পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে যে বউঠাকুরানীর উপন্যাস রচিত হয়েছিল, তার নাট্যীকৃত রূপ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'মূল উপন্যাস-খানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।' কিন্তু 'প্রায় নূতন গ্রন্থের মতো' হলেও অনেক ক্ষেত্রেই যে উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে নাটকের দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য, চতুর্থ পরিচ্ছেদ তৃতীয় দৃশ্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চতুর্থ দৃশ্য এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে ২/৩ দৃশ্যে, ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে ৩/৫ দৃশ্যে। এই জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুই বা ততোধিক পরিচ্ছেদকে কখনো কখনো শোধবোধ নাটকের অনুরূপ কৌশলে একটি দৃশ্যে পরিবর্তিত করা হয়েছে। যেমন, নবম ও দশম পরিচ্ছেদ একত্রিত করে ২।৫ দৃশ্য এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ একত্রিত করে রচিত হয়েছে ৩।৩ দৃশ্য। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে নাটকের প্রথম দৃশ্যে—যেটুকু পরিবর্তন এখানে করা হয়েছে, রুক্মিণী চরিত্র বর্জন তার জন্য দায়ী। পরি চ্ছদের প্রায় আনুগত্যে দৃশ্যসমূহ রচিত হওয়ার ফলে দৃশ্যগুলি বড়ো বেশি ক্ষুদ্রকায়।

লালসাময়ী যে রুক্মিণী চরিত্রকে উপন্যাসে আমরা পেয়েছিলাম সেই চরিত্র নাটকে বর্জিত হয়েছে। নাটকে নূতন চরিত্র এসেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। আমরা যখন প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরবর্তী নাট্যরূপান্তর ইতিহাস আলোচনা করব তখন দেখব এই নবাগত চরিত্র এই নাটকের বিবর্তন ইতিহাসের উপর কীরূপ সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তুলনাকালেও লক্ষ্য করি নাটকের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের উপস্থিতির ফলে উপন্যাসের ঘটনা পারিবারিক কেন্দ্রে যে

ঐক্য লাভ করেছিল, সেই ঐক্য এখানে ব্যাহত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রজাদের সঙ্গে উদয়াদিত্যের যে স্নেহসৌহার্দ্যের সম্পর্ক তাই শুধু নাটকে নবাগত উপাদান নয়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে নাটকে এসেছে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের সম্পূর্ণ নূতন উপকরণ। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই প্রজা-বিদ্রোহের নেতৃত্বদান করেছে। উপন্যাসের যে ঐক্য ছিল পারিবারিক কেন্দ্রে, সেই কেন্দ্র এখানে একদিকে পারিবারিক কাহিনী ও অন্যদিকে প্রজাবিদ্রোহের কাহিনীর মধ্যে ভাবসাম্য হারিয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আত্মভোলা পিতৃব্য বসন্ত রায় বউঠাকুরানীর হাটে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিল এবং উপন্যাসে তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর অনুপ্রবেশের ফলে এবং বৈরাগীর সঙ্গে চারিত্রিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য থাকার দরুন বসন্ত রায় চরিত্র প্রায়শ্চিত্তে রাহুগ্রস্ত। বসন্ত রায় নাটকে বহুলাংশে তার প্রয়োজন এবং তাৎপর্য হারিয়ে উপন্যাসের উত্তরাধিকার হিসাবে নাটকে বসবাস করছে।

উপন্যাসে উদয়াদিত্যের অঙ্গুরী নিয়ে জাল দরখাস্ত তৈরি করিয়ে সেই দরখাস্তের ব্যাপারে উদয়কে জড়ানো হয়েছিল। কিন্তু নাটকে প্রজাদ্রোহের নূতন উপকরণ আসায় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে উদয়ের প্রতি বিমুখ করার প্রয়োজনে সেই নূতন উপকরণকেই ব্যবহার করেছেন। প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখ প্রজারা এখানে উদয়াদিত্যকে রাজা করার জন্য দিল্লীতে দরখাস্ত প্রেরণ করেছে। সুতরাং জাল দরখাস্তের ষড়যন্ত্রের আর প্রয়োজন হয় নি। বিভা সম্বন্ধে রামমোহনের ভ্রান্তি উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছিল, নাটকে তার আভাস নেই, এবং উপন্যাসে বিভার যে ব্যর্থতা ও শূন্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সেই কালিমা নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সর্ব-ব্যাপী আনন্দবাদে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই অবলুপ্তির পিছনে কোন শিল্পগত হেতুবাদ পাওয়া যায় না। আর একটি পরিবর্তন ক্রিয়াপদগত। বউঠাকুরানীর হাটের শুধু বর্ণনাংশ নয়, সংলাপও সাধু ক্রিয়াপদে লিখিত হয়েছিল; কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সংলাপকে প্রায়শ্চিত্তে চলিত ক্রিয়ায় ঢেলে সাজিয়েছেন।

### (খ) রাজর্ষি ঃ বিসর্জন।

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশকে বিসর্জন নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের সুজা ইত্যাদির কাহিনী নাটকে অনুপস্থিত। নাটকে সেই বিল্বনও নেই, যে বিল্বন রবীন্দ্রসাহিত্যে জাতি-

ধর্মনির্বিশেষে ব্রাত্য সেবাব্রতীর পূর্বসূরী। একটিমাত্র কেন্দ্রগত বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় নাটকটি এমন এক ঘনীভূত ঐক্য ও সংহতি লাভ করেছে যে বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসে এই ঐক্য ও সংহতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাজর্ষির সূচনায় বলেছেন উপন্যাসের প্রেরণা-স্বরূপ স্বপ্নলব্ধ কাহিনীটির 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবী সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হলো।' মাসিক পত্রের প্রয়োজনে রাজর্ষিতে যে অবৈধভাবে গল্প আকারে বেড়েছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে সাহিত্যের বৈধ আকার দিয়েছেন। ফলে 'আসল গল্পটা' অবান্তর বিষয়ের আড়ালে ঢাকা না পড়ে স্বদীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং নাটকটি এমন মহৎ ঐক্যগুণ লাভ করেছে। এই ঐক্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মতো রঘুপতিকে দীর্ঘকালীন নির্বাসনে পাঠান নি। নির্বাসনদণ্ড পাওয়ার পর শ্রাবণের শেষ দুই দিন সময় চেয়ে নিয়েছে রঘুপতি এবং এই দুইদিনের সীমান্তের মধ্যে তীব্র গতিশীল ঘটনাবর্তকে রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন। শ্রাবণের শেষ রাত্রিতে জয়সিংহের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে চিরকালীন মুক্তিলাভ ও আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রঘুপতির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, যার জন্য জয়সিংহের আত্মবলি ছাড়াও দীর্ঘ সময় ও বিল্বনের প্রভাবের প্রয়োজন হয়েছিল রাজর্ষি উপন্যাসে। কিন্তু নাটকে শ্রাবণের শেষরাত্রির প্রচণ্ড আঘাতে সে পরিবর্তন নিমেষেই সমাধা হয়েছে। উপন্যাসে আষাঢ়ের কালরাত্রির পরেও রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু নাটকে শ্রাবণের শেষরাত্রির পরে বিরোধ আর বজায় থাকে নি। ধর্মের নামে ভ্রাতৃহত্যা, দেবতার নামে পশুবলিদানের নৃশংসতা জয়সিংহ স্বীকার করতে পারে নি—এই দ্বন্দ্বে তার 'আশৈশব বিশ্বাসের মূল' নড়ে উঠেছে। 'জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর' মতো দেবীকেও সে মা বলে জানত, আজ যখন রঘুপতি সেই দেবীকে 'হৃদয়হীন শক্তি' বলে ব্যাখ্যা করেছে তখন জয়সিংহ সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছে। মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে উপন্যাসের রঘুপতি ছোট হয়ে গিয়েছিল; বিসর্জন নাটকের রঘুপতি মিথ্যা ছলনা ও অভিনয়ের আশ্রয় নিয়ে হীন হয়েছে বটে, কিন্তু নাটকের অন্তিমে জয়সিংহের আত্মবলিদানের মর্মান্তিক বেদনায় পীড়িত হয়ে রঘুপতি তার অবলুপ্ত পূর্বমহিমা অনেক পরিমাণে ফিরে পেয়েছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশের সুজা প্রভৃতির কাহিনী যেমন নাটকে প্রশ্রয় পায় নি, তেমনি নাটকে হাসি নেই, কেদারেশ্বর নেই। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহ হয়েছে নাটকের নায়ক। বিসর্জনে নূতন চরিত্র চাঁদপাল, নয়ন রায় এবং এদের চেয়েও উল্লেখযোগ্য গুণবতী এবং অপর্ণা। গুণবতী ও অপর্ণা এই দুইটি নবাগত নারীচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দুটি নূতন নাটকীয় উপকরণ। রঘুপতি নিজের ব্রাহ্মণত্বের অহংকার ও পৌরোহিত্যের অধিকার বজায় রাখার জন্য পূর্বপ্রথা পশুবলিদান অব্যাহত রাখতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সে কাজে লাগিয়েছে নিঃসন্তানা গুণবতীর সন্তানকামনাকে—পশুবলিদানের পুণ্য অর্জন করলে গুণবতী সন্তানবতী হবে এই লোভে গুণবতীকে সে প্রলুব্ধ করেছে। নারীসুলভ সংস্কারের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে সুতীব্র সন্তানলাভের কামনা। রানী সন্তানলোভে পুণ্য অর্জনের জন্য পশুবলিদান প্রথাকে সমর্থন করায় রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে সংকল্প পালন করা আরো বেশী কঠিন হয়েছে। স্ত্রীর বিমুখতা সত্ত্বেও যখন সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তখন তার চরিত্রমহিমা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রানীর অনুরোধ উপরোধে রাজা যতই অটল থেকেছে ততই গুণবতীর ধারণা হয়েছে সে নিঃসন্তানা বলে রাজার তার প্রতি এত অবজ্ঞা। রাজার সংকল্পে দৃঢ়তা তাই তাকে আরো বেশী সন্তানকামী করে তুলেছে এবং যতই সে সন্তানকামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছে পশুবলিদান প্রথার সাহায্যে, ততই রাজা ও রানীর দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব বর্ধিত হয়েছে। গুণবতী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজা ও রানীর এই সম্পর্ক এবং গুণবতীর বন্ধ্যাজীবনের বেদনার বিষয় নাটকে নূতন এসেছে। গুণবতী একটি প্রাণকণিকাকে দেহে ধারণ করার বিনিময়ে একশো মহিষ তিনশত ছাগের প্রাণনাশ করে পুণ্য অর্জন করতে উদ্যত, এই ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে যে নাটকীয় বিদ্রূপ আছে তাও স্বভাবতই উপন্যাসে ছিল না।

গুণবতীর প্রেম গোবিন্দমাণিক্যের সংকল্পের পথে, বিবেকসংগত সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর অপর্ণার প্রেম জয়সিংহকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই বিবেকসংগত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে শুধু অপর্ণা আসে নি, এই নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে অপর্ণাই দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যখন বিবেকবোধ অপর্ণার কথায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে তখন গোবিন্দমাণিক্যের বিশ্বাস হয়েছে

এই সত্যবাণী কোন ভিখারিনী বালিকার নয়, এই বাণী স্বয়ং জগন্মাতার। জয়সিংহের মনে নূতন জিজ্ঞাসা জাগাতে সাহায্য করেছে অপর্ণার প্রতি জয়সিংহের নবজাগ্রত প্রেম। এই প্রেমও নূতন উপকরণ—উপন্যাসে স্বভাবতই এই ভাবাবেগ অনুপস্থিত ছিল। গুরুদেবের প্রতি আস্থা এবং অপর্ণার প্রতি ভালোবাসার বিরোধের সুযোগে রবীন্দ্রনাথ নাটকে দীর্ঘ দীর্ঘ শেকসপীরীয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়-আন্দোলিত মানসিক অবস্থা চিত্রিত করেছেন। জয়সিংহের প্রেম নাটকেই প্রথম রূপায়িত হয়েছে; কিন্তু জয়সিংহের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যদিও নাটকেই প্রথম স্থান পায় নি, কিন্তু নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজশক্তি এবং যাজকশক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধের যে কথা উপন্যাসে অনতিস্পষ্ট ছিল, নাটকে তা অতিতীব্র স্পষ্টতায় নানাজনের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। রঘুপতি সব চেয়ে তীব্রভাবে বলেছে—

> এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
> ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
> পৃথিবীর রাজত্বের সীমা, বসিয়াছে
> দেবতার দ্বার রোধ করি···। (১/৪)

ধ্রুবকে হত্যার ব্যাপারে নক্ষত্ররায়ের সিংহাসন কামনার সঙ্গে বিসর্জন নাটকে আরো একটি নূতন উপাদান যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুবকে হত্যার চিন্তা নাটকে প্রথম এসেছে গুণবতীর মাথায়, উপন্যাসে এসেছে রঘুপতির মাথায়। উপন্যাসে জয়সিংহের আত্মবলির পরেও প্রতিহিংসা-পরায়ণ রঘুপতির মতিপরিবর্তন হয় নি, সে গোবিন্দমাণিক্যকে আঘাত দেবার জন্য নক্ষত্ররায়কে ধ্রুবহত্যার পাপ-পরামর্শ দিয়েছে। উপন্যাসে রঘুপতি নক্ষত্রকে বলেছিল—'এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজ-বংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?' মুকুট নিয়ে ধ্রুবর কালখেলা দেখে এবং রাজার হৃদয়ে ধ্রুবর স্নেহের আসন উপলব্ধি করে নাটকে রানী গুণবতী ধ্রুবর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, কেননা এই সিংহাসন, রাজার হৃদয়ে এই স্নেহের আসন ছিল তারই অজাত সন্তানের জন্য বিধিনির্দিষ্ট। রানী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তাই নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনের

লোভ দেখিয়ে ধ্রুবকে হত্যার জন্য উত্তেজিত করেছে। রঘুপতির পূর্বোদ্ধৃত উক্তি তাই এখানে গুণবতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

গুণবতী ॥ যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি?

নক্ষত্র ॥ সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী ॥ ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উচ্চ হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র ॥ তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব—মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী ॥ মুকুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা।
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা। (৪/২)

উপন্যাসে ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা জয়সিংহের আত্মবলিদানের পরে ঘটেছে। নাটকের ঘটনাদুটির কালক্রম বিপরীতভাবে বিন্যাস করায় যে লাভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জয়সিংহের আত্মত্যাগের পূর্বে ধ্রুবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রঘুপতির হৃদয়-পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছেন—যেখানে মন্দিরে হত্যার জন্য আনীত ঘুমন্ত ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুপতির মনে পড়ে গিয়েছে জয়সিংহের শৈশবের কথা। মন্দিরের সোপান-পাষাণের মতো কঠিন রঘুপতির ললাট এই প্রথম কোমল হলো। রাজার আদেশপালনে নয়নরায়ের অক্ষমতা সত্বেও রাজার প্রতি নয়নরায়ের সত্যকার আনুগত্য এবং গভীর আনুগত্যের কথা সব সময় মুখে বলা সত্বেও চাঁদপালের বিশ্বাসঘাতকতা—এই দুইটি বৈপরীত্যময় নাটকীয় উপাদান নূতন চরিত্রদ্বয় আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে নূতন এসেছে।

কাহিনী-চরিত্র-বিষয়গত পরিবর্তন ছাড়া আছে ভাষাগত রূপান্তর এবং এই রূপান্তর কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এই ভাষাগত পরিবর্তন দুই জাতীয়। প্রথমত, যেখানে রাজর্ষির গদ্যসংলাপকে বিসর্জনেও গদ্য রাখা হয়েছে, যেমন প্রজাবৃন্দের কথোপকথনে অথবা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে অন্য চরিত্রগুলির কথোপকথনে। দ্বিতীয়ত, যেখানে রাজর্ষির গদ্য-সংলাপকে বিসর্জনে

অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দুই জাতীয় রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য নিদর্শনের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। রাজর্ষির সংলাপে ক্রিয়াব্যবহার সম্বন্ধে আমরা একটি দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করি। বউঠাকুরানীর হাটে সমস্ত সংলাপে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু রাজর্ষিতে তথাকথিত ইতরলোকের কথাবার্তায় সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের বর্ণসংকরত্ব লক্ষিত হয়। যেমন, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে একবার প্রজাবৃন্দের মুখে পাই সাধু ক্রিয়ার ব্যবহার—'রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব!' অন্যত্র সেই প্রজাদের অন্যতমের উক্তিতে পাই চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ—'প্রভু, বলে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।' অবশ্য রাজর্ষিতে শিষ্টজনের পারস্পরিক কথোপকথনে সব সময়েই প্রায় সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইতরজনের সঙ্গে কথাবার্তায় শিষ্টজনও অনেক সময় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ফেলে। একই পরিচ্ছেদে রঘুপতি প্রজাদের তিরস্কার করেছে—'ঠাকরুন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কৈ? তিনি চলে গেছেন।' বিসর্জনে রূপান্তরকালে যেখানে রবীন্দ্রনাথ গদ্যভাষা সংলাপে অবলম্বন করেছেন সেখানে শিষ্ট-ইতরজন নির্বিশেষে সব গদ্যসংলাপেই চলিত ক্রিয়াপদ করা হয়েছে। প্রথমে গদ্য থেকে গদ্যসংলাপে রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দিই।

রাজর্ষি

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন, মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্বার পদার্পণ করিবেন।" (১৩)

বিসর্জন

রঘুপতি॥ তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে। (৩/১)

রাজর্ষি

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস—চল্ একবার মন্দিরে চল।" (১৩)

বিসর্জন

রঘুপতি॥ তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ। (৩।১)

দুই ক্ষেত্রেই শুধু যে সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন করে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে তাই নয়, অভিনয়ের প্রয়োজনে সংলাপের ভাষা সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জন করে হয়েছে ক্ষিপ্রগতি। এই সংলাপের স্রোতের পথে সামান্য উপলখণ্ডের বাধাও অপসারিত হয়েছে। মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়ে রঘুপতি যখন প্রজাবৃন্দকে উপন্যাসে এবং নাটকে দেবীপ্রতিমার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিয়েছে, যখন প্রজাবৃন্দের মুখ থেকে হাহাকার ও বিলাপধ্বনি উঠেছে, সেখানে জয়সিংহের সঙ্গে রঘুপতির যে কথোপকথন তা ক্রিয়াপদ পরিবর্তন ব্যতীত সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে উপন্যাস থেকে নাটকে গৃহীত হয়েছে।

যেখানে রাজর্ষির গদ্যসংলাপ বিসর্জনে পদ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে সংলাপের ভাষাগত আলোচনার ক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলি আরো বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। এই উদাহরণগুলি কাব্যনাট্য সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করে—যে কথা গদ্যে প্রকাশ করা যায় সে কথা পদ্যের সাহায্যে আরো সুচারুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। রাজর্ষির তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবলম্বনে বিসর্জন নাটকের ১।২ দৃশ্য রচিত হয়েছে—গদ্যসংলাপের পদ্যে রূপান্তরের প্রথম নিদর্শন এখান থেকে গৃহীত হয়েছে।

রাজর্ষি

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই (পুরোহিত) রঘুপতি বলিলেন, 'আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিতেছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।" (৩)

বিসর্জন

গোবিন্দমাণিক্য ॥ মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায় ॥ বলি নিষেধ ?

মন্ত্রী ॥ নিষেধ !

নক্ষত্ররায় ॥ তাই তো ! বলি নিষেধ !

রঘুপতি ॥ এ কি স্বপ্নে শুনি ?

গোবিন্দমাণিক্য ॥ স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি ॥ এতদিন
সহিল কী করে ? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি ?

গোবিন্দমাণিক্য ॥ করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন। (১/২)

এই রূপান্তরে ভাষা সংহতি পেয়েছে এবং সংহতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অধিকতর ব্যঞ্জনা—'আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে' এই বাক্যাংশের সঙ্গে 'আজ জাগরণ' এই বাক্যাংশের তুলনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। দুইটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে কিন্তু বক্তব্য অণুমাত্র হারায় নি। অথচ শৈথিল্যের দুর্বলতা ছন্দোবন্ধন সহজেই দূর করে দিয়েছে। ভাষার মধ্যে ছন্দোবদ্ধতার দরুন এই ভাষা অভিনেতাকে স্বরক্ষেপে অধিকতর সামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ দেয়; শুধু তাই নয়, ছন্দোতরঙ্গের শোষণক্ষমতার ফলে এই সংলাপ একই সঙ্গে অনুভূতির উচ্চতম স্তরকে প্রকাশ করতে পারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিম্নতম সাধারণতম স্তরে নেমে আসতে পারে। নিতান্ত চলিত কথাকে সে অবহেলা করে না, আবার উচ্চতম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাকে কাব্যিক বলে অগ্রাহ্য করে না। এখানে কাব্যের উচ্চতম অনুভূতি এবং জীবনের দীনতম কার্যকলাপ ও ভাষা একই সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে।

রাজর্ষি উপন্যাসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ একত্রিত করে বিসর্জন নাটকের ২।১ দৃশ্য রচিত হয়েছে। জয়সিংহের সম্মুখে রঘুপতি যখন নক্ষত্ররায়কে

উত্তেজিত করছিল গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য তখন ভাইকে দিয়ে ভাই হত্যার এই চেষ্টায় বাধা দিয়েছে জয়সিংহ। তখন জয়সিংহের বিবেককে নিরস্ত করার জন্য এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছে রঘুপতি। পূর্বে আমরা ছোট ছোট সংলাপের কথাচালাচালিকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন দেখেছি; নিম্নের উদাহরণে দেখবো আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজর্ষিতে গদ্যে রঘুপতি যে দীর্ঘ উক্তি করেছে সেই উক্তিটিকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন।

রাজর্ষি

রঘুপতি॥ শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে? হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো? এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবনমৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষকোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দিক হইতে বীরশোণিতের স্রোত তাহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। (৬)

বিসর্জন

রঘুপতি॥ তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহাহত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কী জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।

হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্তে দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—( ২/১ )

প্রথম রূপের তুলনায় দ্বিতীয় রূপে ভাষাগুণে এবং ভাষাগুণে বলেই যে আবেগাধিক্যে শ্রেয়তর তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—এই শ্রেয়তা স্বতঃপ্রকাশ। প্রথম তিন চরণে রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষির গদ্যরূপকে অনুসরণ করেছেন, অষ্টম ও নবম পংক্তিতে পুনরায় ফিরে গেছেন রাজর্ষির মূল উক্তিটিতে এবং বিশ্বের চতুর্দিক থেকে রক্তধারা মহামায়ার খর্পরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এই কথাও আমরা রাজর্ষির উক্তিটির মধ্যে পাই। কিন্তু 'এ জগৎ মহাহত্যাশালা' এই একটি বাক্যের মধ্যে সমস্ত উক্তির সার ধারণ করা, 'হত্যা অরণ্যের মাঝে' এই বাক্যাংশ থেকে আরম্ভ করে পুনঃ পুনঃ একই জাতীয় বাক্যাংশে সেই সার সত্যের নিদর্শন দেওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'হত্যা' কথাটির উপর বাক্যে ও উচ্চারণে আঘাত করে চরম থেকে চরমতর শীর্ষে নিয়ে যাওয়া এবং দুইটি আশ্চর্য উপমার মধ্যে দিয়ে এই দীর্ঘ উক্তির সমাপ্তি—এর কোন কিছুই রাজর্ষির ভাষার মধ্যে নেই। দ্বিতীয় উপমাটির আভাস যদিও রাজর্ষির সংলাপে ছিল, কিন্তু তার মধ্যে 'নিষ্পেষিত দ্রাক্ষার' ইমেজ ছিল না, যার জন্য উপমাটি মহত্ত্ব ও অনন্যতা লাভ করেছে। হত্যার বিমূর্ত-ভাবের সঙ্গে বিদ্যুৎগামী আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্রের তুলনাও মহোপমাজাতীয়। অর্থাৎ রাজর্ষির এই উক্তিটির রূপান্তর শুধু গদ্য রূপান্তর নয়, 'sea-change' বা জন্মান্তর, যেন সাধারণ স্তর বা 'হীন স্বপ্নের' জগৎ থেকে 'সমুন্নত স্বপ্নে'র জগতে উত্তরণ।

## (গ) প্রজাপতির নির্বন্ধ : চিরকুমার সভা।

প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভা প্রহসন-নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। উপন্যাসাকারে প্রথম প্রকাশসময়ে উপন্যাসটির নাম কিন্তু চিরকুমার সভাই ছিল। • গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নূতন নামকরণ করেন প্রজাপতির নির্বন্ধ। প্রজাপতির নির্বন্ধকে যখন তিনি নাট্যরূপ দিলেন তখন পূর্বে ব্যবহৃত নামটি--চিরকুমার সভা—নাট্যরূপের জন্য গ্রহণ করলেন। এই প্রসঙ্গে নাচঘরে ১২ই ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে প্রকাশিত খবর উল্লেখযোগ্য—'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা চিরকুমার সভার অভিনয় হবে। সকলেই জানেন, চিরকুমার সভা এতদিন আধা-উপন্যাস ও আধা-নাটকের আকারে বর্তমান ছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়ের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাকে পুরাদস্তুর নাটকে রূপান্তরিত করেছেন এবং সেজন্যে চিরকুমার সভার মধ্যে যে আবশ্যকমত পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য' (দেশ ৩২ বর্ষ ১৫ সংখ্যায় অমল মিত্রের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার' প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। সংলাপবহুল বর্ণনাবিরল এই 'আধা-উপন্যাস ও আধা-নাটককে' 'পুরাদস্তুর নাটকে' রূপান্তরিত করা কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল না। নাটকের মতো করেই সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে উপন্যাসটি লিখিত হয়েছিল, উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি আসলে নাটকের দৃশ্যের মতোই বিভক্ত। তাছাড়া নাটকের মতো করেই প্রস্থান-প্রবেশ প্রভৃতির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর আচরণ নির্দেশ করা হয়েছে। উপন্যাসের যে যে পরিচ্ছেদের ঘটনা একই স্থানে ঘটেছে এবং যেগুলির মধ্যে গল্পগত পরম্পরা বিদ্যমান, সেগুলিকে একত্র করে সাধারণত নাটকের এক-একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য উপন্যাসের একটিমাত্র পরিচ্ছেদ অবলম্বনে নাটকের একটি দৃশ্য লিখিত হয়েছে। সংলাপের প্রায় কোন পরিবর্তন হয় নি। এমন কি নাট্যনির্দেশের প্রয়োজনীয় বর্ণনাগুলি পর্যন্ত উপন্যাস থেকে নাটকে অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে, যেমন, 'নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মতো নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।' গানের ওস্তাদ গুরুদাস নাটকে একমাত্র নবাগত প্রসঙ্গ, যদিও তার উল্লেখ উপন্যাসেও ছিল। দুই-একটি গান কোথাও কোথাও নাটকে নূতন যুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ নূতন গান নারীকণ্ঠে গীত হবার জন্য যুক্ত—নৃপ ও নীরবালার কণ্ঠে। উপন্যাসের শেষে রসিক বলেছে, 'এইবারে

নাটক শেষ হলো'। এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি নাটকেও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান। এই উক্তিটি থেকে বোঝা যায় শুধু পাঠক কেন, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরাও উপলব্ধি করেছিল এই উপন্যাসটি প্রহসনধর্মী 'আধা-নাটক' এবং তাই সহজে এই 'আধা-নাটককে' 'পুরাদস্তর নাটকে' পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

ছয়

## কাব্যকবিতা থেকে নাটক

রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনাবলী-আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রুদ্রচণ্ড, বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় সকলেরই নায়ক এক কবি।' এর মধ্যে রুদ্রচণ্ড রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস। এবং নাট্যপ্রয়াসটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী একটি রচনার রূপান্তর। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী যে রূপান্তর পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, সেই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল তাঁর প্রথম নাটক রুদ্রচণ্ডেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করি, "আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া পৃথ্বীরাজের পরাজয় নামে যে কাব্য রচনা করেন ( ১৮৭৩ মার্চ ) এই রুদ্রচণ্ড তাহারই নাট্যরূপ।···আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টিপ্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদাকে' উপহার দিলেন।" কিন্তু যেহেতু 'তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই,' সেইজন্য সেই বাল্যরচিত কাব্য কী ভাবে রুদ্রচণ্ড নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

### (ক) কবিকাহিনী : ভগ্নহৃদয় : নলিনী।

কবিকাহিনীর সঙ্গে ভগ্নহৃদয় এবং ভগ্নহৃদয়ের সঙ্গে নলিনী নামক নাটকের এমন গভীর যোগ আছে যে এই রচনাগুলিকে একই কাহিনীর রূপান্তর বলা চলে। সুতরাং কবিতা বা কাব্য থেকে নাটকে রূপান্তরের উদাহরণ দিতে

গেলে সেই আলোচনার সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন কবিকাহিনী নামক কৈশোররচিত কাব্যের নাট্যরূপান্তর থেকে। এই রচনাগুলির নায়ক যে কবি, সে স্বয়ং রচয়িতার 'অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তিটাকেই' অবলম্বন করে কল্পিত। এই রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল 'এমন এক সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে' (জীবনস্মৃতি)। কিন্তু এই ছায়াচ্ছন্নতা, অপরিস্ফুটতা, এই আলো-অন্ধকার কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় এবং নলিনী নাটকের মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য নয়। এই সাদৃশ্য এতই প্রবল যে একটি রচনাকে অন্য রচনার রূপান্তর বলা চলে। রবীন্দ্রজীবনীকারও এই কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, 'কবিকাহিনীর সহিত ভগ্নহৃদয়ের গল্পাংশের কিছু সাদৃশ্য আছে, নলিনী নাটকেরও যোগ আছে' (রবীন্দ্রজীবনী ১)।

কবিকাহিনীর নায়ক কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য ও ভাবানুভূতির সন্ধান করে বেড়ায় কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি তার প্রাণের সুগভীর শূন্যতা ঘোচাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত তার শূন্য হৃদয় নলিনীনাম্নী বালিকার হৃদয়ে আশ্রয় পেয়েছে। 'এত সুখ প্রণয়ে' একথা নিজেদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল 'দুইজন প্রকৃতির বালকবালিকা'। দুইজনের এই স্বপ্নময় প্রেম কল্পনার উপাদানে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রেমেও কবির হৃদয়ের শূন্যতা ঘোচে নি, কিন্তু বালিকা রিক্ত, তার আর দেবার কিছু নেই। সুতরাং কবি যখন বলেছে 'নলিনি! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী' তখন নলিনী প্রত্যুত্তরে তাকে জানিয়েছে 'মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক'। বিশ্বভ্রমণের শেষে ফিরে এসে কবি দেখল বিরহমুহ্যমানা নলিনী স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। আবার কবি বেরিয়ে পড়ল—জগৎ সংসার প্রথমে মনে হলো তার কাছে মায়াময়, পরে নলিনীর ভালোবাসার স্মৃতিতে, কীটস তাঁর শীর্ণায়ু জীবনের সমস্ত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার পরিণামে যে উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি করে এই কবি-নায়ক বলল, 'যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল।' এই সত্য তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন ও ধ্যান দিয়ে অর্জন করেছেন এমন প্রমাণ এই দুর্বল রচনায় নেই, এই সুভাষিত কীটসের প্রতিধ্বনি মাত্র। বার্ধক্যে হিমাচলবাসী কবি লোভ-দুঃখ-পীড়িত পৃথিবীর বেদনা অনুভব করে, শেষ পর্যন্ত একদিন 'অযুত

মানবগণ এক কণ্ঠে' গান করবে এই বিশ্বমৈত্রীর সম্ভাবনায় আস্থা পোষণ করেছে। পরিণামে কবির মৃত্যু।

ভগ্নহৃদয় বস্তুত নাটকাকারে লিখিত কাব্য। নাটকের মতো করে লেখা হলেও সাহিত্যের শ্রেণী-বিচারের দিক থেকে কবিকাহিনী ও ভগ্নহৃদয়ে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য করার অর্থ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভগ্নহৃদয়ের ভূমিকায় বলেছেন, 'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন।' রবীন্দ্রনাথ শুধু এখানে নয়, পরবর্তীকালেও এমন এক-একটি রচনা লিখেছেন যেখানে সাহিত্যের প্রচলিত শ্রেণীভেদ অর্থহীন হয়ে গেছে। যদিও বলা হয় বাঁশরী নাটক, আর মালঞ্চ, দুইবোন এবং চার অধ্যায় উপন্যাস কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে এই দুই জাতীয় রচনার মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ-রেখা টানা যায় কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রজীবনীকার বাঁশরী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য—'বাঁশরী নাটকাকারে লিখিত উপন্যাস।' ভগ্নহৃদয়ও যে নাটকাকারে লিখিত কাব্য সে-কথা শুধু রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা থেকে বোঝা যায় না, বোঝা যায় নাটকাকারে লিখিত এই রচনার অংশ-বিভাগগুলিকে সর্গ-নামে চিহ্নিত করায়। কবিকাহিনী এবং ভগ্নহৃদয় কাব্য হলেও কবিকাহিনী যেখানে প্রধানত অমিত্রাক্ষরে রচিত, ভগ্নহৃদয় সেখানে সমিল পয়ার, মহাপয়ার এবং লিরিকস্তবকসমূহের মাল্যবন্ধনে রচিত। যেখানে পয়ার বা মহাপয়ার ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও যেন উচ্ছ্বসিত লিরিকধর্ম সংগীতে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই লিরিকগুণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন, কাব্যটিকে তিনি বলেছেন 'গীতিকাব্য'। ভূমিকার উপমাত্মক উক্তিটি থেকেও অনুমান করা যায় এই কাব্যের গীতিপ্রবণতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, 'নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।'

ভগ্নহৃদয়ে অনিল ও ললিতার উপকাহিনী সম্পূর্ণ নূতন রচনা। অনিল ও মুরলার মধ্যে যে ভাইবোনের মত ভালোবাসা তার এক পূর্বরূপ পাই রুদ্রচণ্ড নাটকে। স্ত্রী ললিতার গভীর নীরব প্রেম স্বামী অনিলকে তৃপ্ত করতে পারে না, আকাঙ্ক্ষা ও কামনার অগ্নিতে সে দগ্ধ হয়। পরে অবশ্য ললিতার ভালোবাসার মূল্য অনিল বুঝেছে, ললিতাও ইতিমধ্যে পরিস্ফুট বিকশিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যার শেষ নেই—অকুণ্ঠিত ভালোবাসা দিয়ে ললিতা

অনিলের ভালোবাসা হারায়, অনিল নিজেকে অপরাধী মনে করে, দুইজনেই সন্দেহ করে অপরজন বুঝি ভালোবাসে না, দুইজনেই ভাবে অপরজন বুঝি অন্যে আসক্ত। কবির প্রতি মুরলার প্রচ্ছন্ন প্রেম নূতন উপাদান, এই উপাদান কবিকাহিনীতে ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগ্নহৃদয়ের মুরলার সঙ্গে কবি-কাহিনীর নলিনীর সাদৃশ্য বেশী, আর ভগ্নহৃদয়ের নলিনী নামেই কবিকাহিনীর নলিনী—সে 'এক চপলস্বভাবা কুমারী'। নলিনীর বহু প্রণয়ী এক দিকে যেমন নলিনীর চাপল্য রূপায়ণে সাহায্য করেছে, তেমনি কাহিনীকে পল্লবিত করতে সাহায্য করেছে। কবির প্রতি প্রেমাসক্ত মুরলাকে কবি যখন জানায় নলিনীর প্রতি তার ভালোবাসার কথা তখন আত্মপ্রেম-গোপনকারিণী মুরলা প্রার্থনা জানায়, 'চির জন্ম সুখী করো কবিরে আমার।' কবিকাহিনীর নলিনীর 'মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক'—এই উক্তিটির পাশে যখন মুরলার সদ্যউদ্ধৃত উক্তিটি, অথবা মুরলা সন্ন্যাসে দীক্ষিত হবার পূর্বাহ্ণে কবির প্রতি যে উক্তি করেছে, 'তুমি সুখী হলে মোর কোন দুঃখ নাই' সেটি স্থাপন করি, তখন বুঝি নামসাদৃশ্য সত্ত্বেও কবিকাহিনীর নলিনীর সাদৃশ্য ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর সঙ্গে নয়, তার আন্তরিক সাদৃশ্য মুরলার সঙ্গে। কবি নলিনীকে ভালোবাসে, যদিও নলিনীর চাপল্য কখনও কখনও কবিকে পীড়িত করে তথাপি তার প্রেমে কবি সুখী, অপরদিকে নলিনী স্বভাবগত চাপল্য সত্ত্বেও কবির প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। কিন্তু নিজের গোপন প্রেমের গুরুভার বহন করে মুরলা যখন বিদায় নিল তখন কবির যেন চৈতন্য ফিরল—চপলা নলিনী হলো উপেক্ষিতা, মুরলার সন্ধানে এখন কবি তৎপর। প্রেম ও অপ্রেমের দোলায় দোদুল্যমান অনিল ললিতাকে ত্যাগ করে যাবার পর ললিতার 'শুধু শ্রান্তি, শুধু শ্রান্তি'। পরিত্যক্তা নলিনী বলে, 'আজ আমি নিতান্ত একাকী।' অনিলের প্ররোচনায় কবি ও মুরলার 'মরণের উপকূলে হইবে মিলন।' কবিও বললো, 'চিতার বাসরশয্যা হোক আমাদের।' ললিতা পরিণামে ফিরে পেল অনিলকে। এই যুগে যে নাম রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল শুধু সেই নলিনী-নামধারিণীর জন্য কোন সান্ত্বনার আয়োজন রবীন্দ্রনাথ করেন নি, এই চপলাই কাব্যে একমাত্র উপেক্ষিতা। কবিকাহিনীতে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণকারিণী প্রেমিকাকে হারিয়ে কবির হিমালয়-প্রস্থে যাত্রা, ভগ্নহৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ব্যর্থপ্রেমের বোঝা বয়ে মুরলার সন্ন্যাসগ্রহণ। কবিকাহিনীতে প্রেমিকাকে হারিয়ে দীর্ঘকাল নির্জনতাযাপনের পর কবির মৃত্যুতে কাব্যের সমাপ্তি, ভগ্নহৃদয়ে প্রেমিকার সঙ্গে মিলন এবং মৃত্যু একই

সঙ্গে—চিতাশয্যাই বাসরশয্যা। অন্যান্য নূতন চরিত্র ও উপাখ্যান আনয়নের ফলে ভগ্নহৃদয়ে যে কাহিনীগত জটিলতা আছে তা স্বভাবতই কবিকাহিনীতে ছিল না।

কবিত্বের আবির্ভাব, কল্পনার আকর্ষণ এবং এক অপরিস্ফুট, ছায়াচ্ছন্ন ভাবানুভূতির হাতছানি কবিকাহিনীর নায়কের মতো ভগ্নহৃদয়ের নায়ক-কবিকেও বিচলিত করে। বর্ণনাগুলিও বহুক্ষেত্রে সদৃশ, তবে ভগ্নহৃদয়ের ভাষা অনেক বেশী পরিণত। দুটি উদাহরণ দিলেই এই বক্তব্যের সত্য স্পষ্ট হবে।

কবিকাহিনী

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,<br>
সে সমুদ্রে চন্দ্রস্মূর্য গ্রহতারকার<br>
প্রতিবিম্ব দিবানিশি খেলিত পড়িত,<br>
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছন-পরশে<br>
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,<br>
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত<br>
সমস্ত পৃথিবী-দেবী পারিত বেষ্টিতে<br>
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু-হৃদয়ে<br>
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ<br>
হু-হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।<br>
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্বতগহ্বর,<br>
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি। (১)

ভগ্নহৃদয়

কবি॥ প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে,<br>
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে!<br>
মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানি করি বিদারিত<br>
সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত!…<br>
জোছনা-মদিরাধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,<br>
ঘূর্ণ্যমাণ ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা<br>
কৌতুকে দেখিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা,<br>
দুরন্ত ঝটিকা হোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া<br>
তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া। (১)

একই সর্গে যদি কবিকাহিনীর সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের এত সাদৃশ্য মেলে, ভাষাগত বর্ণনাগত, তাহলে কবিকাহিনীর সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের সামগ্রিক বিচারে সাদৃশ্যের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

কবিকাহিনী

( নলিনীর উক্তি )

যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।
হরিণশাবক এক আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক। (২)

ভগ্নহৃদয়

কবি ( মুরলার প্রতি ) ॥ হরিণশাবক যত ভুলিবে তরাস
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিবি তুলি,
সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
আমি হোয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর,
কল্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরাণে! (১)

যুক্তাক্ষর-বিরল কবিকাহিনীর দুর্বল অমিত্রাক্ষরে তো বটেই, এমন কি অন্য অংশগুলিতেও ছন্দের বন্ধন থাকা সত্ত্বেও, সেই প্রাণস্পন্দন নেই যা কবিতাকে সঞ্জীবিত করে। অক্ষরগণনা করে ছন্দোরক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু ভাষার দুর্বলতায় উপলব্ধির দীনতায় ছন্দ স্পন্দিত হয়ে ওঠে নি। ভগ্নহৃদয়ে ভাষা ও ছন্দে কবি যে এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েছেন এ কথা বোঝা যায় তখন, যখন আমরা অনুরূপ বর্ণনাগুলি পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করি।

এই কাহিনীর আরো একটি রূপান্তর আমরা পাই। কবিকাহিনী কাব্য, ভগ্নহৃদয় নাটকাকারে কাব্য, পরবর্তী রূপান্তর নলিনী সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগগত দ্বিধা কাটিয়ে পরিপূর্ণ নাটক। কবিকাহিনী ও ভগ্নহৃদয় পদ্যে লেখা, নলিনীতে সেই পদ্য গদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; বস্তুত গদ্যনাটকের ক্ষেত্রে নলিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রচেষ্টা। রূপগত এই পরিবর্তন ছাড়া এখানে

এসেছে কাহিনীগত পরিবর্তন। ভগ্নহৃদয়ের ললিতা-অনিলের উপাখ্যান এই নাটকে বর্জিত হয়েছে, ফলে সেই অবান্তর উপাখ্যানের ভার হারিয়ে নলিনী নাটকের কাহিনী যে অনেক ঐক্য অর্জন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে কবির নামকরণ হয়েছে নীরদ, ভগ্নহৃদয়ের মুরলা নামান্তরিত হয়ে নীরজা হয়েছে, নলিনী চরিত্রে ও নামে অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু সান্ত্বনাস্পর্শহীন উপেক্ষিতা নলিনীর প্রতি ভগ্নহৃদয়ে যে অবিচার রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, এখানে সেই অবিচারের সংশোধন হয়েছে। মনে হয় শুধু নাট্যাকার কাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করার পরীক্ষার জন্য বা গদ্যনাটকে হাত-পাকানোর জন্য নয়, তাঁর প্রিয়নামধারিণী নলিনীর প্রতি পূর্ব অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যও বোধহয় ভগ্নহৃদয়ের এই নাট্যরূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করেছিলেন। স্বেচ্ছা-নির্বাসিত নীরদ নীরজাকে বিবাহ করতে চেয়েছে, যদিও সে ভালোবাসে নলিনীকে। নীরজা জানে নীরদের ভালোবাসা কার প্রতি ধাবিত—তাই সে বলে, 'আমাদের এ বাসরঘর শ্মশানের উপর গড়া নয় তো?' নীরজার এই কথার মধ্যে ভগ্নহৃদয়ের কবির কথার—'চিতার বাসরশয্যা হোক আমাদের'—প্রতিধ্বনি পাই বটে, কিন্তু দুই ক্ষেত্রে বক্তব্যের তাৎপর্য ভিন্ন। ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু সত্ত্বেও মিলন, নলিনী নাটকে নীরদ-নীরজার বিবাহের মধ্যেও বিচ্ছেদ-বীজের সম্ভাবনা। মুরলা যেমন ভগ্নহৃদয়ে আত্মত্যাগ করেছিল, এখানেও তেমনি নীরজা আত্মত্যাগে উৎসুক—নিজের কথা ভেবে বিবাহে নীরজার আপত্তি নয়, তার ভয় এই বিবাহে নীরদ শেষ পর্যন্ত অসুখী হবে। বিবাহের পর দেশে ফিরে এল নবদম্পতি। নলিনীর গৃহে বসন্ত-উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে নীরদা যখন উদ্যানে নীরজার সঙ্গে অন্যমনে পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে রত তখন বিশীর্ণ নলিনীর প্রবেশ ও প্রস্থান। নবীন এসে নীরদকে বলেছে, 'এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা, এই বাগানেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে।' নলিনীর সন্নিধানে গেলে নলিনী মূর্ছিত হয়েছে এবং তার মূর্ছাভঙ্গে নীরজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, 'আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।' শেষ দৃশ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করেছে মৃত্যুমুখী নীরজা। সে নীরদকে বলেছে, 'আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মতো জেগে না থাকি।' নলিনী ও নীরদকে পরস্পরের হাতে সমর্পণ করে চিরবিদায় নিয়েছে নীরজা। সমাপ্তি ভগ্নহৃয়ের একেবারে বিপরীত। ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর প্রতি অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত হলো। কবির প্রণয়ের দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মধ্যে শোধবোধ হয়ে গেল—একবার নলিনী উপেক্ষিত হলো মুরজা ও কবির মিলনলগ্নে, অন্যবার কবি নীরদ ও

নলিনীর মিলন ঘটিয়ে মুরলার রূপান্তর যে নীরজা তাকে বিদায় নিতে হলো। এ এক নূতন রকমের পোয়েটিক জাস্টিস্।

গদ্য, মনে করা হয়, বাস্তবজীবনের অনেক নিকটবর্তী। কিন্তু যদি নলিনী নাটকের ভাষা বিচার করি তাহলে দেখব কবিকাহিনী ও ভগ্নহৃদয়ের মতো এই ভাষাও বস্তুজগতের স্পর্শবিরহিত। এই কল্পলোকে হৃদয়ের উত্তাপ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের তাপ একমাত্র সত্য। ভগ্নহৃদয় এবং নলিনী থেকে পাশাপাশি দুইটি উদ্ধৃতি দিলে প্রমাণিত হবে ভাষা পদ্য থেকে গদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে বটে, কিন্তু অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ভাষার কোন অগ্রগতি হয় নি। উদ্ধৃতি দুইটি সদৃশ বলে তুলনা সহজ, দুই ক্ষেত্রেই নায়ক নলিনীর চাপল্যে, তার গভীরতার অভাবে বেদনার্ত হয়ে অভিযোগ করছে।

ভগ্নহৃদয়

( কবি মুরলাকে )

গান গেয়ে হেসে হেসে

যেথা আমি বসেছিনু আসিল সেথায়—
চলিয়া গেল সে, যেন দেখে নি আমায়!
একেলা বসিয়া আমি রহিনু আঁধারে
সমস্ত রজনী, সখি, সেই পথ-ধারে।
কেন, সখি, এত হাসি, এত কেন গান?
কিসের উল্লাসে এত পূর্ণ ছিল প্রাণ?
মন এক দলিবার আছে গো ক্ষমতা,
যখন তখন খুশি দিতে পারে ব্যথা,
তাই গর্বে কোন দিকে ফিরেও না চায়? (১৪)

নলিনী

নীরদ (স্বগতোক্তি)॥ একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চঞ্চলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ-প্রমোদের কি একটুকুও বিরাম নেই? দিনের আলো যখন নিবে এসেছে, পাখীগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে—তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদে না? এক মুহূর্তের জন্যও কি ইচ্ছে যায় না—এই কোলাহলশূন্য জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি। (১)

কবিকাহিনী-ভগ্নহৃদয়-নলিনীর এই কাহিনী আরো দুইটি রূপান্তর-পর্যায় পরবর্তীকালে অতিক্রম করেছে। সেই পরবর্তী বিবর্তন-ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে মায়ার খেলা গীতিনাট্য ও মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে। সেই রূপান্তর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করব।

## (খ) পূজারিনী : নটীর পূজা।

দুইটি কাহিনী-কবিতার বিষয় অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ পরে নাটক রচনা করছিলেন। প্রথমটি পরিশোধ কবিতা—এই কবিতা অবলম্বনে পরিশোধ গীতি-নাট্য এবং শ্যামা নৃত্যনাট্য রচিত হয়। নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের আলোচনাকালে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। দ্বিতীয় যে কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছিলেন সেই কবিতার নাম পূজারিনী ( ১৯০০ ), সেই নাটকের নাম নটীর পূজা ( ১৯২৬ )। আমরা জানি যে কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পূজারিনীর মূকনৃত্যাভিনয়ের আয়োজনে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নটীর পূজা লেখেন। পূজারিনী কবিতার বহিঃরেখার সঙ্গে নটীর পূজা নাটকের সাদৃশ্য আছে, গল্প মূলত এক। নায়িকা সেই নটী শ্রীমতী। কবিতায় শ্রীমতীর পূজানিবেদনের উদ্যোগ দেখে বধূ অমিতা ও রাজকুমারী শুক্লার মধ্যে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়া এখন নাটকে আরো বিস্তারিত হয়ে নন্দা অজিতা ভদ্রা—বিশেষ করে বাসবী ও রত্নাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরের বর্ণনা নাটকে শুধু বিস্তারিত হয় নি—তার চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। একটি উদাহরণই এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

পূজারিনী

এমন সময় হেরিল চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত--
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপ-মালার মতো।

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি

শুধাল, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি!'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী।'
সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

নটীর পূজায় 'প্রভুর আসনবেদীর সামনে' শ্রীমতীকে নাচতে হবে রাজা এই আদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সেবিকা বুদ্ধের বেদীর সামনে নটী হয়ে নাচছে এই কৌতুক দেখার জন্য কেউ সমবেত হয়েছে, কেউ এসেছে এক অজানা আশঙ্কা অন্তরে বহন করে। 'শ্রীমতী আসছে। দেখো, দেখো, যেন চলেছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।' রাজাদেশ সত্ত্বেও অন্তরে যারা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করে তারা স্তূপের সম্মুখে নটীর নাচের চিন্তায় পীড়িত হয়েছে, শ্রীমতীর উদ্দেশ্য না জেনে শ্রীমতীকে ধিক্কার দিয়েছে, নিজেদের ধিক্কার দিয়েছে—'এখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা।' নাচের নামে শ্রীমতী আরতি আরম্ভ করেছে, গান ও নাচের মাধ্যমে মহাজীবন ও মহামরণের কাছে শরণভিক্ষা করেছে, 'বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সংগীতে বিরাজে।' 'গয়নাগুলি একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।' তারপর নিরলংকারা শ্রীমতী প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ করেছে বুদ্ধবন্দনা—'বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি' ইত্যাদি। রক্ষিণীরা একই সঙ্গে রাজাদেশে তাকে অস্ত্রাঘাত করেছে, অন্যদিকে নটীর পায়ের ধুলো নিয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। প্রথমে রত্নাবলী ব্যতীত সকলে বুদ্ধবন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, পরে নিঃসঙ্গ রঙ্গমঞ্চে রত্নাবলীও উচ্চারণ করেছে সেই মহৎ মন্ত্র। পূজারিনী কবিতার 'শেষ আরতির শিখা' নির্বাপিত হয়েছে নীরবে নিভৃতে কিন্তু নটীর পূজায় শ্রীমতীর আত্ম-নিবেদন অনেক প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, রত্নাবলীও এখন তার মধ্যে একটি প্রদীপ।

নটীর পূজার অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে রানী লোকেশ্বরী চরিত্রের বীজ ছিল পূজারিনী কবিতার মহিষীর মধ্যে। কিন্তু পূজারিনী কবিতার মহিষী ছিল শুধুই অজাতশত্রুর ভয়ে ভীতা।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
'একথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপর মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে ?'

কিন্তু নটীর পূজায় লোকেশ্বরীর আচরণের কারণ অনেক বেশি জটিল। স্বামীর আদেশে তত নয়, 'রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে, স্বামীর পরে অভিমানে' তত নয়, যত তার বিমুখতার কারণ তার পুত্রের ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণে। 'আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে, তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।' কিন্তু এই লোকেশ্বরী শেষপর্যন্ত বুদ্ধবন্দনামন্ত্রোচ্চারণে নেতৃত্বদান করেছে। কিন্তু মালতী ও উৎপলপর্ণা চরিত্রের কোন অপরিস্ফুট বীজও পূজারিনী কবিতায় ছিল না। আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য—পরিশোধ কবিতার কোন কোন বাক্যাংশ বা বাক্য যেমন প্রায় অবিকলভাবে পরিশোধ গীতিনাট্য বা শ্যামা নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে, পূজারিনী কবিতার তেমন কোন বাক্যের ব্যবহার নটীর পূজা নাটকে পাই না। পূজারিনী থেকে কাহিনীর বীজটুকু নিয়ে নটীর পূজা নাটক সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা।

## সাত

## গদ্যনাটক থেকে পদ্যনাটক

### (ক) প্রায়শ্চিত্ত : মুক্তধারা : পরিত্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের গল্পকবিতার কাহিনীকে নাটকে বা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন তাই নয়, তিনি নিজের পূর্বরচিত নাটকগুলিকেও কখনও একবার, কখনও একাধিকবার পরিবর্তিত রূপ দিয়েছেন। এই

পরিবর্তন-পর্যায়ের আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রায়শ্চিত্ত নাটকের। বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাস কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেই প্রসঙ্গে দেখিয়েছি বউ-ঠাকুরানীর হাটের প্রতাপ-উদয়াদিত্যের প্রধানতঃ পারিবারিক কাহিনী কীভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র এবং প্রজাবিদ্রোহের উপকাহিনী যুক্ত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত নাটকে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। যদিও উপন্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদগুলিই প্রধানত নাটকের হ্রস্বকায় দৃশ্যাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, তথাপি উদয়াদিত্যের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক, প্রজাগণের বিদ্রোহে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বদানের নূতন উপকাহিনী প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যুক্ত হওয়ায় বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের কাহিনী নাটকে রূপান্তরকালে ঐক্য হারিয়েছে। দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীর উপাদান যে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ছিল এই কথা প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরবর্তী রূপান্তর আলোচনাকালে স্মরণে রাখা দরকার।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরবর্তী রূপান্তর মুক্তধারা নাটক (১৯২৫)—ষোল বছর পরে রচিত। মুক্তধারা সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই মন্তব্য করেছেন, 'এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ প্রায়শ্চিত্ত নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া।' অন্যত্র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এতে (অর্থাৎ মুক্তধারায়) কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই…।' নাট্যকারের এই দুটি মন্তব্য পড়লে মনে হয় ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং তার কথোপকথন ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সঙ্গে মুক্তধারা নাটকের কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু গভীরভাবে যদি দুইটি নাটককে পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করা যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দুটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। পূর্বেই বলেছি, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে দুইটি সমান্তরাল কাহিনীর উপস্থিতির ফলে ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। বউঠাকুরানীর হাটে যা একমাত্র ছিল, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যা প্রধান ছিল, সেই পারিবারিক কাহিনী মুক্তধারায় বর্জিত হয়েছে এবং প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যে অপ্রধান প্রজাবিদ্রোহের কাহিনী ছিল তাই এখানে পরিপূর্ণ নাট্যরূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ঐক্যভ্রষ্টকারী কাহিনী দুইটির একটি অবলম্বনে মুক্তধারা নামক নাট্যরূপান্তর রচনা করেছেন এবং প্রধানত অন্যটি অবলম্বনে পরবর্তীকালে পরিত্রাণ নামে আর একটি রূপান্তরিত নাটক রচনা করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্তের রাজা-প্রজা সম্পর্কের উপকাহিনী এখানে প্রাধান্য পেয়েছে সেই কারণে এবং প্রায়শ্চিত্ত ছিল

কাহিনীনাট্য, মুক্তধারা প্রতীকনাট্য সেই কারণে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তার কথোপকথন ব্যতীত 'আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই'।

মুক্তধারা নাটকে রাজা রণজিৎ প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্যের নামান্তর বই নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার; প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ ও প্রচণ্ডতা যতটা রাজা রণজিতে বর্তেছে তার চেয়ে বেশি বর্তেছে বিভূতিতে, তাই বিভূতি শুধু যন্ত্রবিদ্ নয়, সে যন্ত্ররাজ। মুক্তধারার রণজিৎ ও বিভূতি একত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপ। কিন্তু প্রতীকনাট্যের সুযোগে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্যের নির্মম প্রচণ্ডতার অধিকাংশ মুক্তধারায় কোন ব্যক্তিবিশেষে নয়, প্রতীকে রূপায়িত ও আরোপ করেছেন। নানাজনের কথায় প্রতীকের সেই প্রেতচ্ছায়া প্রতিফলিত। প্রায়শ্চিত্তে বসন্ত রায় প্রতাপকে বলেছিল, 'তুমি যখন একবার ছুরি তোল তখন সে ছুরি একজনের উপর পড়তেই চায়, আমি তার লক্ষ্য হতে সরে পড়লুম বলে আর-একজন তার লক্ষ্য হয়েছে।' যন্ত্ররাজ বিভূতি-নির্মিত বাঁধের প্রতীকের মধ্যে নানাজনে দেখেছে এই হিংস্র প্রতাপের নির্মমতার ছবি।

(১) পথিক॥ বাবা রে, ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করিয়ে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

(২) মন্ত্রী॥ আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

(৩) সঞ্জয়॥ দেখছ না, যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না।

প্রতাপের মধ্যে যে প্রাণশক্তি-হরণকারী ভয়াবহ শক্তির প্রকাশ ছিল সেই ভয়াবহ প্রাণনাশী শক্তিকে মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ যন্ত্ররাজ বিভূতি-নির্মিত বাঁধের প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। শক্তি একই, এক জায়গায় সেই শক্তি কাহিনীনাট্যে, অন্য জায়গায় প্রতীকনাট্যে রূপায়িত হয়েছে বলে, এক ক্ষেত্রে সেই শক্তিপ্রকাশের মাধ্যম চরিত্র, অন্যত্র সেই শক্তিপ্রকাশের মাধ্যম প্রতীক। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়ে মানুষের তথা প্রতাপের স্পর্ধা বেড়ে উঠেছিল,

মুক্তধারাতেও ঈশ্বরের মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে বাঁধের যন্ত্রের স্পর্ধিত উদ্ধত শির। প্রতাপের রূপান্তর যদিও প্রধানত যন্ত্ররাজ বিভূতি এবং বাঁধের প্রতীক, তথাপি প্রতাপের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্কের ব্যাপারে প্রায়শ্চিত্তের যে প্রতাপাদিত্যকে পাই, মুক্তধারায় সেই প্রতাপাদিত্যের রূপান্তর রাজা রণজিৎ। রণজিতের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক আলোচনা করলেই এই মন্তব্যের সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধনঞ্জয় বৈরাগী সম্বন্ধে প্রতাপাদিত্য এবং রণজিৎ দুইজনেই বলেছে, 'এবার তার কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হবে।'

প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য রণজিৎ-পুত্র অভিজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মনে হয় প্রায়শ্চিত্তে ব্যবহৃত প্রতাপাদিত্য-কাহিনীর যে সামান্য পরিমাণ ঐতিহাসিক উপাদান ছিল এই প্রতীকনাট্যে সেটুকুও অনুপস্থিত বলে রণজিৎ ও অভিজিৎ, এই নামান্তর ব্যবহার করা হয়েছে। অভিজিৎ-ও উদয়ের মতো কোমলস্বভাব কবিপ্রাণ। উদয়াদিত্য যেমন মাধবপুর শাসনে প্রেরিত হয়ে প্রজাবৃন্দের সপ্রীতি আনুগত্য অর্জন করেছিল, তেমনি অভিজিৎ শিবতরাই শাসনে প্রেরিত হয়ে প্রজাবৃন্দের নিকট থেকে অনুরূপ ভালোবাসা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। প্রায়শ্চিত্তে মাধবপুরের প্রজারা যুবরাজকে চেয়েছে। ১।৬ দৃশ্যে প্রজাদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের নিম্নরূপ কথোপকথন পাই—

৩॥ আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়॥ কী চাইবি রে?

৩॥ আমরা যুবরাজকে চাইব।

৩।১ দৃশ্যে মাধবপুরের প্রজারা এসেছে উদয়াদিত্যের কাছে। তাদের বক্তব্যে এখন লেগেছে বিদ্রোহের সুর—'আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে জানি না—আমরা তোমাকে রাজা করব।' প্রতাপাদিত্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের সুর নেমে গেছে বটে, কিন্তু তারা দরবার জানাতে ভোলে নি—'আমরা যুবরাজকে চাই', 'আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।' এই উক্তিগুলির সঙ্গে তুলনীয় মুক্তধারার প্রথমে শিবতরাইয়ের প্রজাবৃন্দের নিজেদের মধ্যে আলোচনা, পরে রাজার সঙ্গে সেই প্রজাদের কথোপকথন।

বিষণ॥ যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে॥ সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ॥ কী করবি?

সকলে ॥ ফিরিয়ে নিয়ে যাব।
বিষণ ॥ কী করে ?
সকলে ॥ জোর করে।
বিষণ ॥ রাজার সঙ্গে পারবি ?
সকলে ॥ রাজাকে মানি না।

ঠিক তার পরেই যখন রাজা মন্ত্রীসহ প্রবেশ করেছে তখন প্রজারা তাদের আবেদন রাজার কাছে উপস্থিত করেছে একই ভাষায়।

গণেশ ॥ তোমার কাছে দরবারে এসেছি।
রণজিৎ ॥ কিসের দরবার।
সকলে ॥ আমরা যুবরাজকে চাই !
রণজিৎ ॥ বলিস কী ?
১ ॥ হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্যের সঙ্গে মাধবপুরের প্রজাদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তার কারণ, উদয়াদিত্য সিংহাসনের লোভে প্রজাদের নিজের পক্ষে টানছে, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে উদয়াদিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় দুর্ণাম দেওয়া হয়েছে। মুক্তধারায় অভিজিৎ সম্বন্ধেও একই জাতীয় অপবাদ দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সুযোগে বন্দীশালা থেকে যুবরাজের মুক্তির ব্যবস্থা করার ঘটনা দুই নাটকেই এক এবং প্রায়শ্চিত্তে এই সময় ধনঞ্জয় বৈরাগী যে অগ্নিবন্দনা গান গেয়েছে—'আগুন আমার ভাই'—সেই গানও এখানে অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত। তবে উদয়াদিত্যের সঙ্গে অভিজিৎ চরিত্রের তুলনা করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, প্রায়শ্চিত্তে প্রতাপাদিত্যের তুলনায় পুত্র উদয়াদিত্য যতটা দুর্বল ছিল, রণজিতের তুলনায় অভিজিৎ সেই রকম দুর্বল নয়। প্রতাপাদিত্যের নির্মম ভয়াবহতা যেমন প্রতীকে ও বিভূতিতে আরোপিত হওয়ায় রণজিৎ প্রতাপের তুলনায় অনেক হিংস্রতা হারিয়ে মানবিক গুণান্বিত হয়েছে, তেমনি বিপরীতক্রমে অভিজিৎ উদয়াদিত্যের তুলনায় অনেক সবল হয়েছে, অনেক বেশি পৌরুষ লাভ করেছে।

মন্ত্রী চরিত্রও দুই নাটকে এক। দুই নাটকেই মন্ত্রী জানে প্রজার স্বেচ্ছানুগত্যের উপর রাজার আসন প্রতিষ্ঠিত। তাই দুই ক্ষেত্রেই রাজা যখন প্রজাদমনমূলক নীতি প্রয়োগ করতে উদ্যত হয় তখন বিজ্ঞ মন্ত্রী সাধ্যানুসারে বাধা দিতে চেষ্টা করে। মুক্তধারা নাটকে মোহনগড়ের খুড়োমহারাজ বিশ্বজিৎ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রতিনিধি। দুইজনই

সদানন্দময় পুরুষ, রাজনীতির চেয়ে হৃদয়সম্পর্ক তারা বেশি বোঝে। বসন্ত রায় বিভার কাছে এসেছিল 'এক মাথা পুরোনো পাকাচুল' নিয়ে, আর বিশ্বজিতের 'শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ'। দুই পিতৃব্যেরই যুবরাজের প্রতি স্নেহ অপরিসীম। অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেদিন যুবরাজের মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল সেইদিন দুই পিতৃব্যই তাকে সাহায্য করার জন্য অকুস্থলে উপস্থিত ছিল—যদিও উদয়াদিত্য সাহায্য নিয়েছে কিন্তু অভিজিৎ সাহায্য নেয় নি। এই সাদৃশ্যের কথা মনে রেখেও অবশ্যই বলতে হবে, স্বাভাবিক কারণেই প্রায়শ্চিত্তের বসন্ত রায়ের তুলনায় মুক্তধারায় বিশ্বজিতের ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে মুক্তধারার এই জাতীয় নিবিড় সাদৃশ্য আছে বলে জোর করে বলা যায় মুক্তধারা প্রায়শ্চিত্ত নাটকেরই রূপান্তর। কিন্তু এই রূপান্তরে একটি উপকাহিনী প্রধান কাহিনী হয়ে ওঠায় এবং যা ছিল ঘটনাবহুল কাহিনীনাট্য তা ভাববহুল প্রতীকনাট্য হয়ে ওঠায় সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই রূপে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। মুক্তধারায় দৃশ্য-অঙ্কের সমস্ত ভেদরেখা লুপ্ত। পূর্বেই বলেছি এই নাটকের পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ'—নাটকের ঘটনাবলী প্রায়শ্চিত্তের মতো নানাস্থানে ঘটে নি, সবই ঘটেছে পথে। তাই যেমন দৃশ্যপট নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে, তেমনি সুকৌশলে অঙ্কদৃশ্যের বিভাজন বর্জন করায় সমস্ত নাটক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পথের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়েছে। দুই রূপের মধ্যে প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য ঘটেছে মুক্তধারায় প্রতীক ব্যবহার করায়। বাঁধ ও মুক্তধারার বিরোধী প্রতীক ব্যবহারের ফলে পাত্রপাত্রীর আচরণ, বিশেষ করে ভাষার উপর সেই প্রতীকের সর্বগ্রাসী প্রভাব পড়েছে। এ ছাড়াও আছে নানা সামান্য পরিবর্তন। অভিজিতের কুড়িয়ে পাওয়ার উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ নূতন যোজনা—সে যে জন্ম থেকেই মুক্ত এই ইঙ্গিত দেবার জন্য বোধহয় এই উপাখ্যানটি যোগ করা হয়েছে। স্বাদেশিকতার উত্তেজনা বারভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে যে সোরগোল শুরু করেছিল, রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাটে সেই প্রতাপাদিত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে তীব্র সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। সেই কথা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল বলেই হোক অথবা মুক্তধারা নাটক লেখার সমসাময়িককালে ইউরোপে যে অন্ধ আত্মনাশী স্বাদেশিকতাবুদ্ধি বলবান হয়ে উঠেছিল তার মিথ্যার দিক প্রদর্শনের জন্যই হোক, মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমে গোঁড়া স্বাদেশিকতা-প্রচারকে

একটি দৃশ্যের মাধ্যমে তীব্রভাবে পরিহাস করেছেন। এই দৃশ্যের কোন পূর্বাভাস প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ধনঞ্জয় চরিত্র ও তার কথোপকথন অনেকাংশে প্রায়শ্চিত্তের নাটক থেকে নেওয়া। প্রতাপাদিত্য ও বৈরাগীর কথোপকথনের সঙ্গে যদি রণজিৎ ও বৈরাগীর সংলাপ পাশাপাশি রেখে তুলনা করি তাহলে দেখব এই সংলাপ প্রায় অপরিবর্তিত।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রতাপাদিত্য ॥ দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দুবছরের খাজনা বাকী—দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয় ॥ না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য ॥ দেবে না। এত বড়ো স্পর্ধা।

ধনঞ্জয় ॥ যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য ॥ আমার নয়!

ধনঞ্জয় ॥ আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর,এ আমি তোমাকে দিই কী করে?

প্রতাপাদিত্য ॥ তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয় ॥ হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে। (৩/১)

মুক্তধারা

রণজিৎ ॥ পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।

ধনঞ্জয় ॥ না মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ ॥ দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয় ॥ যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ ॥ আমার নয়?

ধনঞ্জয় ॥ আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ ॥ তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয় ॥ ওরা তো ভয়ে ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

বিস্ময় জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে, 'স্পর্ধা' হয়েছে 'আস্পর্ধা' এবং কিছু শব্দ হারিয়ে সংলাপের বাক্যবন্ধ হালকা হলেও মোটের উপর মুক্তধারার এই সংলাপ যে প্রায়শ্চিত্তের সংলাপেরই প্রায় অবিকৃত রূপ একথা বলা চলে। 'তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে,' প্রায়শ্চিত্তে এই উক্তির মধ্যে ধনঞ্জয়ের যে রাজনৈতিক চতুরতা প্রকাশ পেয়েছিল, লক্ষণীয় যে, সেই উক্তিটি রূপান্তরে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ক্ষেত্রবিশেষে এই আপাত অবিকারের সূত্র ধরে একটি গভীর পরিবর্তন মুক্তধারার সংলাপে এসেছে। একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করি।

প্রায়শ্চিত্ত

ধনঞ্জয় ॥ একেবারে সব মুখ চূন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনও ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

১ ॥ রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয় ॥ আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনও সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনও তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনও আরও অনেক বাকি আছে! (১/৬)

মুক্তধারা

ধনঞ্জয় ॥ একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১ ॥ প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয় ॥ ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২ ॥ রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয় ॥ তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে ; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

পূর্বে যেখানে ছিল বাস্তবের কথা সেখানে সংলাপের ভাষার সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে সেই অন্তর্নিহিত প্রতীকী সত্যের কথা, এই ইন্দ্রিয়ময় জগৎ যে গর্ভগৃহের সম্মুখে কম্পমান পর্দা মাত্র। তাই বারে বারে 'ভিতরের যে ঠাকুরটি আছেন' তার কথা আসে, সংলাপের মাধ্যমে এখন প্রতীকী সত্যের ইঙ্গিত ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত ও ব্যঞ্জিত হয়। এই ব্যঞ্জনা, এই বলার চতুর্দিকে না-বলার যে বিচ্ছুরণ, এ বিশেষ করে কবিতার ধর্ম। তাই মুক্তধারার ভাষাগত রূপান্তর সম্বন্ধে বলা যায় প্রতীকের ব্যবহারের ফলে এবং প্রতীক যেহেতু এই নাটকে বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া একটি ব্যাপার নয়, নাটকের সঙ্গে যেহেতু প্রতীক অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে নিবিষ্ট-নিবিড় সেই কারণে প্রায়শ্চিত্তে যে ভাষা ছিল শুধুই গদ্য, মুক্তধারায় সেই ভাষা ব্যাকরণগতভাবে গদ্য থেকেও ব্যঞ্জনাগুণের প্রতীকীধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহুলাংশে কাব্যের গুণ লাভ করেছে। এই গুণের সন্নিবেশই প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তধারায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভাষাগত পরিবর্তন। তাই মুক্তধারায় নাটকের আন্তরিক প্রয়োজনে এমন কাব্যময় গদ্যভাষা পাই, প্রায়শ্চিত্ত স্বতন্ত্রধর্মী নাটক হওয়ায় সেখানে সে জাতীয় ভাষার সাক্ষাৎ নেই, থাকলেও অস্বাভাবিক হতো।

সঞ্জয় ॥ গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্য দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না ?

অভিজিৎ ॥ হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু গাছের চূড়ায় ডালটির উপর একলা বসে আছে ; ও কি নীড়ে যাবে না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে, সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে মুক্তধারার গানগুলির ব্যবহার তুলনা করলে আমরা কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার লক্ষ্য করি। প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দুইটি গান—'প্রভু আরো আরো' এবং 'রইলে বলে রাখলে কারে'—সংলাপপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণত একই সঙ্গে গেয় ছিল। কিন্তু তার ফলে ঘটনা ও সংলাপ স্তম্ভিত হয়ে থাকে বলে এবং অন্যান্য ভূমিকার অভিনেতৃ ঐ সময়ে রঙ্গমঞ্চে অপ্রস্তুত বোধ করে বলে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি গানকে মুক্তধারায় সংলাপপ্রবাহের অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন। গদ্যসংলাপের কিছু অংশ এবং গানের টুকরো পর পর চলেছে যাতে সংলাপের ও নাটকের গতি একেবারে থেমে না যায়। কিন্তু নাটককে গতি দেওয়া এবং সহ-অভিনেতা অভিনেত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে উদ্ধার করাই যদি এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হবে, তাহলে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ কেন করেছেন তা বোঝা যায় না। প্রায়শ্চিত্তে 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' গানটি সংলাপের মধ্যে গ্রথিত ছিল, সংলাপের মধ্যে মধ্যে গানটির এক-একটি স্তবক গীত হয়েছিল, কিন্তু মুক্তধারায় সংলাপপ্রবাহ এবং নাটকের ঘটনাপ্রবাহ রুদ্ধ করে সমস্ত গানটিকে স্বতন্ত্রভাবে একসঙ্গে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার 'আমারে যে বাঁধবে ধরে এই হবে তার সাধন' গানটি প্রায়শ্চিত্তে সম্পূর্ণত এক-সঙ্গে গেয় ছিল, মুক্তধারাতেও তাই আছে। সুতরাং গানের ব্যবহারের এই বিচিত্র পরিবর্তন কোন্ কারণে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন।

যে কাহিনীর আদি রূপ পেয়েছিলাম বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে, ১৯২৯-এ সেই কাহিনীর তৃতীয় রূপান্তর পাই পরিত্রাণ নাটকে। কিন্তু পরিত্রাণ মুক্তধারার পরবর্তী রূপ নয়, মুক্তধারা যেমন প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর, পরিত্রাণও তেমনি প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর। বউঠাকুরানীর হাট প্রধানত যে পারিবারিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যে পারিবারিক কাহিনী প্রধান ছিল, মুক্তধারায় যে পারিবারিক কাহিনী বর্জিত হয়েছিল, সেই পারিবারিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাট্যরূপান্তর পরিত্রাণ। অর্থাৎ যে দুইটি কাহিনী, প্রধান ও অপ্রধান, থাকার জন্য প্রায়শ্চিত্ত নাটক ঐক্য ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল, তার একটি অবলম্বনে মুক্তধারা, অন্যটি অবলম্বনে পরিত্রাণ নাটক রচিত হয়েছে। সেই কারণে মুক্তধারা ও পরিত্রাণ দুইটিই প্রায়শ্চিত্ত নাটকের রূপান্তর। প্রজাবিদ্রোহের উপাখ্যান যে গুরুত্ব পাওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত নাটকে অন্যতম কাহিনীর মর্যাদা পেয়েছিল, সেই গুরুত্ব এখানে না দেওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্হিত ঐক্য পরিত্রাণে ফিরে এসেছে।

মুক্তধারায় যেমন অঙ্কদৃশ্যবিভাগহীন নিরবচ্ছিন্ন নাটক চলেছে, পরিত্রাণে তেমন নয়। অঙ্কদৃশ্যের নিয়মিত ভাগ এখানে পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। পাত্রপাত্রীর নামধাম সবই প্রায়শ্চিত্তের; এখানে প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য, প্রজাবিদ্রোহের উপকাহিনীর গুরুত্বহ্রাস ছাড়া, অঙ্কদৃশ্যবিভাগের পুনর্ব্যবস্থাপনায়। বউঠাকুরানীর হাটের প্রায় প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত আকারের পরিচ্ছেদ অবলম্বনে প্রায়শ্চিত্তের এক-একটি দৃশ্য লিখিত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি অতি-সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই বিরক্তিকর হ্রস্বকায়তার দোষ নিরাকরণার্থে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্তের একাধিক দৃশ্য স্থকৌশলে যুক্ত করে পরিত্রাণের সংগততর দৈর্ঘ্যের দৃশ্যগুলি রচনা করেছেন। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত যে উপন্যাস-অতীতের উত্তরাধিকার তার নাট্যদেহে বহন করছিল, সেই উত্তরাধিকারের দায় পরিত্রাণ নাটক পরিত্যাগ করেছে। প্রায়শ্চিত্তের কয়েকটি দৃশ্য কীভাবে যুক্ত হয়ে পরিত্রাণের এক-একটি দৃশ্য নির্মিত হয়েছে কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা সহজে উপলব্ধি করা যাবে। প্রায়শ্চিত্তের ১।১ দৃশ্যে উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে উদয়াদিত্য ও সরমার কথোপকথন, ১।৫ দৃশ্যে রাজান্তঃপুরে প্রথমে বিভা ও সরমা এবং পরে বসন্ত রায়ের সংলাপ এবং ২।৫ দৃশ্যে প্রতাপাদিত্যের শয়নকক্ষে প্রতাপ, লছমন সর্দার, রাজশ্যালক এবং বসন্ত রায়ের কথোপকথন অবলম্বনে পরিত্রাণের ১।৩ দৃশ্য রচিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের ৪।১ দৃশ্যে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রীর সংলাপ, ৪।৪ দৃশ্যে বসন্ত রায়, প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের সংলাপ, ৪।৬ খালের ধারে নৌকার সম্মুখের দৃশ্য, ৪।৭ দৃশ্যে প্রতাপাদিত্যের কক্ষে প্রতাপ, মন্ত্রী, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতির সংলাপ এবং ৫।৩ দৃশ্যে বন্দী উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য, মহিষী ও বিভার সংলাপ, এই পাঁচটি দৃশ্যের সমবায়ে পরিত্রাণের ৩।১ দৃশ্য রচনা করা হয়েছে। দৃশ্যগুলিকে সংযুক্ত করার সময় প্রায়শ্চিত্তের ৪।৬ দৃশ্যকে পরিবর্তিত ও ৪।৭ দৃশ্যের কিয়দংশ বর্জিত করে পরিত্রাণে গ্রহণ করা হয়েছে। ৫।৩ দৃশ্যে বিভার শ্বশুরালয়ে যাওয়ায় যে কথা ছিল তা পরিত্রাণে নেই। পরিত্রাণেও অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে উদয় মুক্তি পেয়েছে, উদয় উত্তরাধিকারের দাবী ত্যাগ করেছে, কিন্তু বসন্ত রায়ের সঙ্গে তার চলে যাওয়ার যে কথা প্রায়শ্চিত্তে ছিল পরিত্রাণে তা নেই। উপসংহারে ধনঞ্জয়, উদয়াদিত্য এবং বিভার মিলন সর্বত্যাগের মধ্যে। এইভাবে শুধু যে পরিত্রাণের দৃশ্যগুলি যথোচিত পরিমাণে দীর্ঘ হয়েছে তাই নয়, পঞ্চমাঙ্কে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত নাটক ফলে পরিত্রাণে চার অঙ্কে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

পরিত্রাণের গদ্যসংলাপ প্রায়শ্চিত্ত থেকে অবিকৃত ও অরূপান্তরিতভাবে এসেছে। এমন কি লক্ষ্য করার বিষয়, মধ্যবর্তীকালে মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্তের সংলাপের যে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পরিবর্তন করে, সেই পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণে পুনরায় প্রায়শ্চিত্তের সংলাপকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রায়শ্চিত্ত থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও প্রজাদের সংলাপের একটি অংশ উদ্ধার করেছিলাম, যেখানে রাজার কাছারিতে প্রজাবৃন্দের মারার এবং তাতে তাদের অপমানের কথা আছে। সেই অংশের সঙ্গে মুক্তধারার পরিবর্তিত রূপের তুলনা করেছিলাম এবং তুলনাকালে দেখিয়েছিলাম নাট্যকার কী জাতীয় ছোট ছোট অথচ তৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন সেই সংলাপের ভাষায় এবং রূপান্তরের ফলে কীভাবে নিত্যনৈমিত্তিক গদ্যের মধ্যে এসেছে প্রতীকী সত্যের তথা কাব্যধর্মের ব্যঞ্জনা। প্রতীকের প্রয়োজনে ও প্রভাবে মুক্তধারায় এই জাতীয় পরিবর্তন করতে হয়েছিল এবং পরিত্রাণ যেহেতু প্রতীকনাট্য নয়, কাহিনীপ্রধান নাটক, তাই এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের প্রয়োজনে সাধিত পরিবর্তনগুলি অস্বীকার করে প্রায়শ্চিত্তের গদ্যভাষায় ফিরে গেছেন। প্রজাবৃন্দকে রাজার কাছারিতে মারা বিষয়ে সংলাপ অংশে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও প্রজাবৃন্দের উক্তি পরিত্রাণ নাটকে অক্ষরে অক্ষরে প্রায়শ্চিত্ত থেকে গৃহীত হয়েছে। এই রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনাকালে গানের ব্যবহার লক্ষণীয়। গানের সংখ্যা প্রায়শ্চিত্তের (২৩) তুলনায় পরিত্রাণেও (২১) বেশি। হয়তো প্রতীকধর্মী নাটকে গানের এই জাতীয় প্রাচুর্য কিছুদূর পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যে নাটক কাহিনী ও ঘটনা-প্রধান সেই নাটকে এই গীতিবহুলতা নাটকের সাফল্যের পথে বাধাই দেয়।

### (খ) রাজা : অরূপরতন : শাপমোচন কবিতা : শাপমোচন কথিকা।

রাজা নাটকে ( ১৯১০ ) গান আছে, 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে / তাই হেরি তায় সকল খানে'। অরূপরতনের (১৯২০) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে প্রভু কোন বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।' সুতরাং রাজা ও অরূপরতনের মূল কাহিনী শুধু নয়, মূল বক্তব্যও এক। 'এই নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের

অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।' এই উক্তিতে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে অরূপরতন রাজার রূপান্তর, অভিনয়ের সুবিধার জন্য এই রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এই উক্তিটির মধ্যে আর একটি প্রচ্ছন্ন কারণের আভাস পাই—শুধু সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই রূপান্তর করা হয় নি, যেখানে রাজা ছিল নাটক সেখানে অরূপরতন হয়েছে নাট্যরূপক—এই রূপকধর্মের দিকে অধিকতর জোর দেবার জন্যও এই রূপান্তর। উক্তিটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকায় রবীন্দ্রজীবনীকারের মতো স্পষ্ট করে না বললেও চলে যে, 'অরূপরতন মূল রাজা নাটক হইতে বেশি রূপকঘেঁষা বা symbolistic। রাজার মধ্যে রূপক আছে, তবে উহাকে প্রতীকের খাঁজে খাঁজে বসাইবার চেষ্টা নাই বলিয়া ইহার রমণীয় নাটকীয়তা অক্ষুন্ন আছে' (রবীন্দ্রজীবনী, ৩)। আপাতত রূপক ও প্রতীকের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির গোলকধাঁধায় প্রবেশ না করে লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রাজা নাটকেরও রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে। 'রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, তার অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হলো না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।' কিন্তু এই তত্ত্ব নাট্যকারের মনে রাজা নাটক রচনাকালে উপস্থিত ছিল মনে হয় না, মনে হয় এই তত্ত্বব্যাখ্যা পরবর্তী চিন্তনের ফল। বস্তুত রূপকের দিকে, তাত্ত্বিকতার দিকে অরূপরতনে যে রাজার তুলনায় অধিকতর ঝোঁক পড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ঝোঁক যে শুধু সমগ্র নাটকের উপরে পড়েছে তা নয়, কাহিনীর প্রায় প্রত্যেক অংশে এবং সংলাপে তার প্রভাব আমরা কার্যকর হতে দেখি। রাজা নাটকে সুদর্শনা যেখানে বলে—

> না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব। (১)

সেখানে অরূপরতনের সুদর্শনা বলে—

না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখবো—সেইখানেই যে আমি আছি। (১)

দুই অংশের বক্তব্যের সার হয়তো একই, কিন্তু ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য তা লক্ষণীয়। প্রথম উক্তিটিতে যে রূপকসত্যের ইঙ্গিত নেই তা নয়, কিন্তু সেখানে 'গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথরের' জগৎ উপস্থিত এবং সেই জগৎ কুয়াশার মতো নিরবয়ব নয়—সমস্ত কিছুর পিছনে সেখানে বস্তুজগতের পটভূমিকা বিদ্যমান। কিন্তু অরূপরতনে 'গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর' হয়ে গেল 'চোখের দেখার জগৎ' এবং মূর্ত থেকে বিমূর্তে এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি রাজার তুলনায় রূপকপ্রবণতা এই নবরূপে বেশি সক্রিয়। রাজা নাটকে যে কংক্রিটনেস বা অবয়বত্ব ছিল সেই অবয়বত্ব একই কারণে অরূপরতনে কম। রাজায় নেপথ্যবাসী রাজা সুদর্শনার রূপ বর্ণনা করেছে—

দেখতে পাই যে অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আলো, কত ঋতুর উপহার! (১)

অরূপরতনে রাজা বলেছে—

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুলফল। তুমি বহু পুরাতনের নূতন রূপ। (১)

'কত ঋতুর উপহারের' তুলনায় 'বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুলফলে' মূর্ততা বেশি সন্দেহ নেই, কিন্তু সুদর্শনার মধ্যে 'যুগযুগান্তরের ধ্যান' রূপ নিয়েছে বললে সেই রূপ যত মূর্ত হয়ে ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশি মূর্ত হয় যখন রাজা বলে তার 'আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায়' সুদর্শনার মধ্যে 'রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে'। অরূপরতনের রাজা যখন বলে 'তুমি বহু পুরাতনের নূতন রূপ' তখন বোঝা যায় বিমূর্ততার দিকে অরূপরতনের বিষয় এবং ভাষার প্রবণতা বেশি।

রাজায় ছিল ছাব্বিশটি গান, অরূপরতনে আছে পঁচিশটি। এই গানের মালার মধ্যে এগারটি মাত্র সাধারণ অর্থাৎ রাজা এবং অরূপরতন দুই রূপেই উপস্থিত। অর্থাৎ রাজা নাটকের অনেকগুলি গান বর্জিত হয়ে অরূপরতনে অনেকগুলি নূতন গান গৃহীত হয়েছে। রাজায় বসন্ত ঋতুর বাতাবরণ অনেক

সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু ঋতুর সেই পটভূমিকা অরূপরতনে অত বেশি প্রকট নয়। সেই কারণে বোধহয় বসন্ত ঋতুর তিনটি গান—'আজি কমলমুকুলদল খুলিল', 'বসন্তে কি শুধু কেবল,' এবং 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—অরূপরতনে গৃহীত হয় নি। গানের ব্যবহারে একটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। রাজা নাটকে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গানটি নেপথ্যচারী রাজা গেয়েছে, অরূপরতনে ঐ গানটি গেয়েছে সুরঙ্গমা।

সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য রূপ প্রস্তুত করতে যেয়ে মূল কাহিনী অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রনাথ অরূপরতনে কাহিনীকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। রাজার যে পরিমাণ নেপথ্যসংলাপ রাজা নাটকে ছিল, প্রয়োজনগত ব্যবহারিক কারণে সম্ভবত সেই নেপথ্যসংলাপ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ফলে শুধু 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' গান নয়, রাজার মুখের অনেক সংলাপও অরূপরতনে স্থানান্তরিত হয়ে নেপথ্যরাজার সমুপস্থিত-প্রতিনিধি সুরঙ্গমার মুখে বসেছে। কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পুনর্লিখনকালে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন তার আভাস পাওয়া যাবে নিচের বিবরণ থেকে। রাজা নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য পথ এবং তৃতীয় দৃশ্য কুঞ্জবনের দ্বারের প্রথমাংশ যুক্ত করে অরূপরতন নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য উৎসব-ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। অরূপরতনের দৃশ্য বিচিত্রতরভাবে রচিত হয়েছে। রাজা নাটকের পঞ্চম সপ্তম দশম দ্বাদশ ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতিতম দৃশ্যের অংশবিশেষ গ্রহণ-বর্জন করে অরূপরতনের এই দীর্ঘ দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। কোন কোন দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে, যেমন রাজা নাটকের স্বয়ম্বর দৃশ্য। রোহিণী ও কান্যকুব্জরাজ চরিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। কোন কোন দৃশ্যের একাংশমাত্র গৃহীত হয়েছে, অন্য অংশ রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে।

রূপান্তরে দৃশ্যসমূহের পুনর্বিন্যাসকালে সমগ্র নাটকের অধিকতর রূপক-প্রবণতার দিকে নজর রেখে সংলাপের কী জাতীয় পরিবর্তন করা হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিই।

রাজা

সুদর্শনা ॥ তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন।

সুরঙ্গমা ॥ মা, আমাকে কেন বলছো। আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে। উত্তর যদি দেন তো

নিজেই এমনি করে দেবেন যে, কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্বাক হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছু বুঝি নে জানি, সেইজন্য কোন দিন তাঁর বিচার করি নে। (১২)

অরূপরতন

সুদর্শনা ॥ একবারও বারণ করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার?

সুরঙ্গমা ॥ সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোন দিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা ॥ তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা ॥ সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক, সেই কঠিনেরই জয় হোক। (৪)

সংলাপের বাক্যগুলি শুধু লঘুভার দ্রুতগামী হয়েছে তাই নয়, যে রহস্য বিরোধাভাস এবং আপাতহেঁয়ালির চাবিকাঠি দিয়ে মরমীয়াগণ আধ্যাত্মিকতার গর্ভগৃহের দ্বার কিঞ্চিৎ উন্মোচনের চেষ্টা করেন, তারই স্পর্শ লেগেছে অরূপ-রতনে রূপান্তরকালে সংলাপের ভাষায়।

রাজা থেকে অরূপরতন—এই রূপান্তর নাট্যরূপান্তর। কিন্তু রাজা নাটকে যে কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম রূপায়িত করেছিলেন সেই কাহিনীর ভাববস্তুর আরো দুটি রূপান্তর আমরা রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাই। একটি শাপমোচন কথিকা, অপরটি পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শাপমোচন কবিতা। আমরা কাব্য বা কবিতার নাট্যরূপান্তরের উদাহরণ পূর্বে পেয়েছি; এই ক্ষেত্রে আমরা তার বিপরীত দৃষ্টান্ত পেলাম। শাপমোচন কথিকার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হলো। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।' একদিক থেকে শাপমোচন কথিকা পূর্ববর্তী, ১৩৩৮-এর ১৫ পৌষ পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'উক্ত পুস্তিকার কথিকা অংশ ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় মুদ্রিত হয় এবং ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে স্বতন্ত্র কবিতা আকারে উহা পুনশ্চ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।' এই কবিতা রচনার পরে আবার ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসে শাপমোচন কথিকার পুনরভিনয়কালে তার একটি পরিমার্জিত নাট্যরূপ

প্রকাশিত হয়। বর্তমানে শাপমোচন কথিকা বলতে সেই পরিবর্তিত নাট্য-রূপকে বোঝায়। সেদিক থেকে শাপমোচন কবিতা পূর্ববর্তী, কথিকা পরবর্তী রচনা।

মূল ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে শাপমোচনে কাহিনী পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্বর্গভ্রষ্ট সৌরসেন ও মধুশ্রী মর্ত্যে অরুণেশ্বর ও কমলিকা হয়ে জন্মাল। কমলিকার চিত্র দেখে অরুণেশ্বরের 'মনে হলো, যা হারিয়েছিল এই জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।' গন্ধর্বরাজের প্রেরিত বিবাহপ্রস্তাব মেনে নিলেন কমলিকার বাবা। রাজা ও অরূপরতনে প্রিয়-মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিল নারী, এখানে প্রিয়মিলনের জন্য উৎসুক হয়েছে পুরুষ।

রাজা

সুদর্শনা॥ ভগবান্ চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলি কটাক্ষপাত করছো। তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে—কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই—আমি যেন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি। ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগত নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে। (৪)

অরূপরতন

সুদর্শনা॥ ভগবান্ চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলি কটাক্ষপাত করছো। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে। (৩)

শাপমোচন

চৈত্রপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন। সেই বিবাহরাত্রে দূরে একলা বসে রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল। কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকান্তরে কার সঙ্গে এই রকম জ্যোৎস্না-রাত্রে সে যেন এক-দোলায় দুলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়ছে মনে।

বিবাহে রাজার প্রতিনিধি তারই বক্ষোবিহারিণী বীণা। সেই বীণার সঙ্গে কমলিকার মাল্য-বিনিময় হল—'লহো লহো তুলে লহো; নীরব বীণাখানি'।

অন্ধকারের রাজাকে নিয়ে তুষ্ট থাকে নি সুদর্শনা ; রাজার সুদর্শনা রাজাকে বাস্তবজগতে দেখতে চেয়েছে, অরূপরতনের সুদর্শনা তাকে 'চোখের দেখার জগতে' চেয়েছে, কমলিকারও মন ভরে না, সেও তার রাজাকে দেখতে চায়। উত্তরে তারা শোনে—

শাপমোচন

আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙ্গে।

অরূপরতন

চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

রাজা

মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

রাজায় ইঙ্গিতে বলা হয়েছে মন দিয়ে যখন সুন্দর দেখা যাবে তখন চোখ দিয়ে দেখলেও মনের মতো সুন্দর হবে। অর্থাৎ পরে চোখের দেখা হতে পারে এমন আভাস আছে রাজায়, মন প্রস্তুত হলে। শাপমোচনেও একই কথা, অন্তর প্রস্তুত হলে 'বাইরে দেখবার দিন আসবে'। রাজা এবং শাপমোচন 'চোখের দেখার জগৎ'-কে পুরোপুরি অস্বীকার করে নি। অরূপরতন বলে মন যতই প্রস্তুত হোক 'চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে', সুতরাং মন শুদ্ধ করে অন্তরে দেখতে হবে বাইরে নয় কোনদিন। রাজায় আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা আছে, অরূপরতনে আধ্যাত্মিকতা অতি-প্রকট, শাপমোচনে অরুণেশ্বর-কমলিকার সম্পর্ক মানবিক প্রেমের সম্পর্ক। তত্ত্ববিরল মানবিকতার ভিত্তির উপরে শাপমোচনের গল্পের প্রতিষ্ঠা।

রাজা, অরূপরতন এবং শাপমোচন কথিকা—তিনক্ষেত্রে গানের বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে' গানটি অপরিবর্তিতভাবে স্থান পেয়েছে। কারণ, কাহিনীর তিনটি রূপান্তরের মধ্যে যে মূল সত্য অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান সেই মূল সত্যটি এই গানের পদাবলীর মধ্যে রয়ে গেছে। সেই কারণে এই গানটি কেন্দ্রীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত বলে নানা রূপান্তর ও নানা নূতন গান রচনা সত্ত্বেও এই গানটি তিনরূপেই বিরাজমান।

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহনরবে বাজবে বাঁশী

তখন আপনি সেধে ফিরবে, কেঁদে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে ত্বরা, ঘুরিয়া মরা হেথাহোথায়।

যেখানে বসন্তউৎসবে 'পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে' রাজা ও অরূপরতন নাটকের নেপথ্যচারী রাজা নৃত্যোৎসবের ভিড়ের মধ্যে ইশারায় সুদর্শনার কাছে নিজের পরিচয় দেবে বলেছে। শাপমোচনের রাজা বলেছে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে দেখো চেয়ে।' 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো, সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

রাজা

রাজা॥ আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে—চেয়ে দেখো—আমার বাগানের সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।

সুদর্শনা॥ তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা॥ বারবার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। (১)

অরূপরতন

সুদর্শনা॥ এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব— সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে॥ আচ্ছা দেখো, তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা॥ চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে॥ বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। (১)

রাজার এই কৌশলে দেখা দেওয়ায় সত্য রাজার পরিচয় রাণী জানতে পারে নি। রাজা ও অরূপরতনে অন্য সুরূপ পুরুষকে সুদর্শনা রাজা বলে মনে করেছিল চোখের দেখায়; শাপমোচনে কুরূপ বলে রাজাকে রাজা বলে চিনতে পারে নি। 'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে' বলে সে নিষ্ঠুর হয়েছিল সেই কুশ্রী মানুষের প্রতি—করুণায় তার হৃদয় মধুর হয় নি বলে কুশ্রী মানুষের মধ্যে সে রাজাকে চিনতে পারে নি। বীণাবাদনের মধ্য দিয়ে রাজা, অরূপরতন ও শাপমোচনের নেপথ্যবাসী রাজা করেছে রাণীর হৃদয় জাগানোর তপস্যা, যে হৃদয় জাগলে 'চপল আঁখি' দিয়ে দেখতে হয় না, হৃদয়ের চোখ

দিয়ে দেখে সত্যকারের মানুষকে চেনা যায়। বীণার সুরমন্ত্রের মধ্যে বাজে রাজার ধীর তপস্যার বেদনা।

শাপমোচন

আধো ঘুমে সে শুনতে পায় বীণাধ্বনির আর্তরাগিনী। স্বপ্নে দূরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সুর বহুদিনের চেনা।··· বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাহিরে নেই, এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।

অরূপরতন

সুদর্শনা॥ কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সেই বীণা তুই কি শুনেছিলি, সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন? (৪)

রাজা

সুদর্শনা॥ দেখ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে (১২)

কথিকার শেষে মিলন-নৃত্যের মধ্য দিয়ে অরূপের রূপ দেখল কমলিকা। রাজা ও অরূপরতন নাটকে নৃত্যের মধ্যে সমাপ্তি ছিল না। শাপমোচনে নৃত্যের মধ্য দিয়ে মিলনানন্দকে পরিপূর্ণ করে তোলার সুযোগ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যেহেতু এই কথিকা যে গানের মালা গেঁথে রচিত, সেই গানগুলির সুরের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে নৃত্য। নাটক কথিকায় রূপান্তরিত হয়েছে; নাটকে যেমন সংলাপ, এখানে প্রাধান্য পেয়েছে গান, গানেরই অভিনয় নৃত্যের ভঙ্গিমা।

কবিতা থেকে কথিকায় রূপান্তরকালে উনত্রিশটি গান নৃত্য সহযোগে ব্যবহারের জন্য যুক্ত করা হয়েছে। গদ্যছন্দের অন্তর্নিহিত ছন্দোস্পন্দের প্রয়োজনে কবিতায় যে শব্দ ও বাক্যের বিন্যাস ছিল কথিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন করা হয়েছে। শুধু কমলিকার উদ্দেশে অরুণেশ্বরের পত্রপ্রেরণের কথা কথিকায় নূতন এসেছে। 'স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সঙ্গে এনেছে অরুণেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।··· তাপার্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তৃষ্ণার জল, বীণা কোলে নিয়ে গান করে,—' এই জাতীয় কিছু কিছু বর্ণনাংশ শাপমোচন কবিতায় অবশ্য ছিল না, কিন্তু মোটের উপর শাপমোচন গদ্যকবিতারই রূপান্তর শাপমোচনের

গদ্যকথিকা। গদ্যকবিতাকে কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে রূপান্তরিত করেছেন, এই সুযোগে সেই প্রক্রিয়াটি আমরা অনুধাবন করতে পারি।

শাপমোচন কবিতা

গন্ধর্ব সৌরসেন **সুরলোকের সঙ্গীতসভায়**
**কলানায়কদের** অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের **মন** ছিল **উদাসী**।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর **নাচে** শমে পড়লো বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

শাপমোচন কথিকা

গন্ধর্ব সৌরসেন **সুরসভায় গীতনায়কদের** অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহী **চিত্ত** ছিল **উৎকণ্ঠিত**। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, **নৃত্যে** উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

শাপমোচন গদ্যকবিতায় উচ্চারণ-সৌকর্য এবং অর্থবোধের জন্য বাক্যের মাঝখানে যেখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য বিরাম গ্রহণ করি, সেই বিরামস্থান পর্যন্ত এক-একটি পর্ব হিসাবে গ্রহণ করে বাক্যগুলিকে একাধিক চরণে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। কথিকার গদ্যে সেই প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'সুরলোকের সঙ্গীতসভা' হয়েছে সংক্ষিপ্ত 'সুরসভা' এবং 'মন' হয়েছে 'চিত্ত', 'উদাসী' হয়েছে 'উৎকণ্ঠিত'—ছন্দস্পন্দের প্রয়োজনে কবিতায় যুক্তাক্ষর বর্জনের যে তাগিদ ছিল এখন যেহেতু তা নেই। 'নাচ' একই কারণে 'নৃত্য' হয়েছে—গদ্যকবিতার অন্তর্লীন ছন্দস্পন্দের অভাব গদ্যে যুক্তাক্ষরের যুগ্মধ্বনির যোগে পূরণের চেষ্টা হয়েছে। কথিকায়—'নৃত্যে উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা', কবিতায় ছিল, 'উর্বশীর নাচে শাম পড়ল বাধা'। কবিতায় ঠিক এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যবন্ধ—'মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে' এবং 'ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে'—তার সঙ্গে ধ্বনিগত ও বিন্যাসগত সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে ঐ বাক্যভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছিল।

শাপমোচন কবিতা

অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে **দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়,**
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদারবনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার **হাহাকার মূর্তি।**

শাপমোচন কথিকা

অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মত নাচে চোখে **দেখি নে, তার হৃদয় দেখি**—জনশূন্য দেওদারবনের দোলায়িত শাখায় **যেন** দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার **হাহাকার।**

উচ্চারণ-সৌকর্য, অর্থবোধের জন্য গদ্যপাঠকালে আমাদের যে মাঝে মাঝে বিরাম নিতে হয়, তার থেকে গদ্যরচনা সম্বন্ধেও একটি ছন্দোবোধ জন্মে; সেই বিরামস্থানে গদ্যের যতটুকু বাক্যাংশ সমাপ্ত হয়, পূর্বেই বলেছি, সেই বাক্যাংশ-টুকুকে গদ্যকবিতায় একটি পর্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু পদ্যছন্দের মত গদ্যছন্দের এই উচ্চারণ ও অর্থবোধজনিত পর্ব যেহেতু সময়ে সুনিয়মিত নয় সেই কারণে এই গদ্যছন্দে পর্ব স্থিতিস্থাপকও বটে। অর্থবোধজনিত পর্ব একটি চরণে একাধিক থাকলে এক চরণকে সহজেই একাধিক চরণের মর্যাদা দেওয়া যায়। যেমন, 'তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়' এই অংশটিকে সহজেই

তাকে চোখে দেখে না,
তাকে হৃদয়ে দেখা যায়,

এইভাবে দুইচরণে বিন্যস্ত করা যায়।

কবিতায় যেখানে ছিল কবির বর্ণনা, তাই প্রথম পুরুষের ব্যবহার, কথিকায় সেখানে কমলিকার ভাবনা, তাই উত্তম পুরুষের ব্যবহার। 'তাকে চোখে দেখে না' তাই হয়েছে 'তাকে চোখে দেখি নে'। কবিতায় যেহেতু প্রথম পুরুষের ব্যবহার তাই সেখানে হওয়া উচিত ছিল 'তার হৃদয় দেখে', কিন্তু গভীরতর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা এসেছে সামান্য পরিবর্তনে—'তাকে হৃদয়ে দেখা যায়'। এখন তার হৃদয় আর স্বতন্ত্র নয়, হৃদয়ে-হৃদয়ে এখন একাকার। পূর্ববর্তী চরণের দুইবার 'দেখা'র সঙ্গে ধ্বনিসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে, পদ্যছন্দের অনুপ্রাসের মাধুর্য গদ্যছন্দে আনার চেষ্টায় কবিতার তৃতীয় চরণে পাই 'যেমন দেখা যায়'—কথিকার গদ্যে এই বাক্যাংশটি নেই। কবিতায় যা 'মূর্তি' পেয়েছে, কথিকায় তাই হয়েছে 'হাওয়ার হাহাকার'।

**(গ) অচলায়তন : গুরু।**

'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি গুরু নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।' গুরু নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন। কিন্তু এই রূপান্তরের বিস্তারিত আলোচনা করলে আমরা দেখব এই রূপান্তরের উদ্দেশ্য শুধু লঘুতাসাধন বা সহজে অভিনয়যোগ্যতা নয়। তার সঙ্গে অন্য প্রবণতাও কাজ করেছে।

অচলায়তন নাটকে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের সংলাপের মধ্য দিয়ে অচলায়তনের শাস্ত্রশাসিত রুদ্ধ পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রথমেই।

মহাপঞ্চক ॥ গান! আবার গান!

পঞ্চক ॥ দাদা, তুমি তো দেখলে—তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুতেই পারলুম না।

মহাপঞ্চক ॥ সে তো দেখতে বাকি নেই। কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়। তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে।

পঞ্চক ॥ একমাত্র ওইটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক ॥ পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই যে বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ কতদিন ধরে তোমার মুখস্থ হলো না, আজ তার কী করলে। (১)

অপরপক্ষে গুরু নাটকের প্রথমেই পাই বালকদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গুরুর আসন্ন আগমনের কথা।

প্রথম ॥ কিন্তু উপাধ্যায় মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয় ॥ কী বলেছেন বল না।

প্রথম ॥ গুরু আসছেন।

সকলে ॥ গুরু আসছেন!...

প্রথম ॥ শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয় ॥ তাহলে এখানে কোথায় ধরবে?

প্রথম ॥ পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না। (১)

এর পরেই পঞ্চক গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেছে এবং ডাক দিয়ে বলেছে, 'ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।'

সহজেই বোঝা যায় নাটকের আরম্ভে এই পরিবর্তন নিতান্ত দৃশ্যের পুনর্বিন্যাসের দ্বারা লঘুতা সম্পাদনের জন্য নয়, সহজ অভিনয়যোগ্যতার জন্যও

নয়। অচলায়তনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ-পরিহাসপ্রাধান্য থেকে গুরু নাটকে আধ্যাত্মিক সত্যরূপায়ণের প্রবণতা—এই লক্ষ্য পরিবর্তনই অচলায়তন থেকে গুরুতে রূপান্তরের প্রধান কারণ। নামান্তরের মধ্যেও, কোন্ দিকে নাট্যকার গুরুত্ব দিচ্ছেন, ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। অচলায়তনের সংস্কারের জন্য নাট্যকার ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত করেছিলেন প্রথম নাটকে—সেখানে জোর পড়েছিল অচলায়তন ভাঙার উপরে। গুরু নাটকে ভাঙা নয়, গুরুর আগমনের উপরে, শাস্ত্রশাসনের মূঢ়তার চেয়ে আধ্যাত্মিক সত্যের উপরে জোর পড়েছে বেশি। অচলায়তনের অন্ধতা সম্বন্ধে প্রথম নাটকে যে বিদ্রূপের প্রখরতা ছিল, তা যে এখন রূপান্তরে আধ্যাত্মিক আনন্দবাদের বিভায় কোমল হয়ে এসেছে, একটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতির দ্বারা তার প্রমাণ দেওয়া যায়। অচলায়তনের প্রথমেই পঞ্চক-মহাপঞ্চকের সংলাপ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। সেই সংলাপের যে রূপান্তর করা হয়েছে গুরু নাটকে তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

মহাপঞ্চক ॥ গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে।

পঞ্চক ॥ এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান করতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হলো।

মহাপঞ্চক ॥ আমি মহাপঞ্চক গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক ॥ ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক ॥ কেন বলো তো?

পঞ্চক ॥ গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে! (১) গুরু নাটকে যে শাস্ত্র-মানা অচলায়তনের প্রতি বিদ্রূপ নেই তা নয়, 'অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র' ও 'সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের' কথা এখানেও আছে; কিন্তু উদ্ধৃত সংলাপাংশের পূর্বরূপের সঙ্গে পরবর্তীরূপের তুলনা করলে রূপান্তরের তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়বে। একদিকে স্যাটায়ার—শাস্ত্রের অন্ধতা, মঠের রুদ্ধতা, আচারের মূঢ়তা সম্বন্ধে, কুসংস্কারের হাস্যকরতা, মন্ত্রের অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে। অন্যদিকে প্রাধান্য পেয়েছে মুক্তিতত্ত্ব, সেখানে স্যাটায়ারের প্রাক্তন তীব্রতা অনুপস্থিত। দাদাঠাকুরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা সমস্ত রূপান্তরিত রচনাটিকে স্তরান্তরে উন্নীত করেছে।

তারপর নাটকের দুই রূপেই এল সুভদ্রের পাপের কথা। মূঢ় আচার, অবরুদ্ধ মঠ এবং অন্ধ শাস্ত্রের শাসনের বেদনাময় দিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম, যখন দেখলাম অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে

বাইরেটা দেখে ফেলার পরম পাপের জন্য বালক সুভদ্র স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। 'তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ' বলে পঞ্চক সুভদ্রকে অভিনন্দিত করে, কিন্তু উপাধ্যায় ভাবে 'বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন।' কিন্তু পরিবেশের পীড়নে অভ্যস্ত বালক বলে, 'আমাকে মহাপাতক করাও।' অচলায়তন নাটকে সুভদ্র-উপকাহিনী প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছিল। সেই ছড়িয়ে থাকা উপকাহিনীটি গুরু নাটকে ঐক্য লাভ করেছে। সুভদ্রের তথাকথিত পাপ, মহাপঞ্চক কর্তৃক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাতামসব্রত ('কেন না আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন') পালনের নির্দেশ, আচার্যের মনে এই মঠের রুদ্ধ পরিবেষ্টন সম্বন্ধে সন্দেহ ('আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেওয়ালের প্রত্যেকটা পাথর পর্যন্ত বিচলিত।' 'এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।'), আচার্য-কর্তৃক সুভদ্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ—'সুভদ্রকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না' এবং ফলে মহাপঞ্চক-উপাধ্যায় প্রভৃতির বিস্ময়-ক্রোধ এবং বিদ্রোহী মনোভাব ('আচার্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।')—এই সমস্ত ঘটনাতে দুটি স্বতন্ত্র দৃশ্য থেকে নিয়ে একত্র করে গুরু নাটকে এক দৃশ্যে সংহত রূপ দেওয়া হয়েছে।

অচলায়তনের তৃতীয় দৃশ্য থেকে রাজার প্রবেশ ও দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোনপাংশুদের আক্রমণের সংবাদ ('দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।') সুভদ্র-উপকাহিনীর পরে যুক্ত হয়েছে গুরু নাটকে—'দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে এসে বাসা বেঁধেছে।' অচলায়তনের শোনপাংশুরা গুরুতে হয়েছে যূনক। অচলায়তনের দ্বিতীয় দৃশ্য পাহাড়মাঠ গুরুতে কিছু সংক্ষিপ্ত হলেও মোটের উপর অবিকৃত আছে। এই দৃশ্যে দাদাঠাকুরের প্রবেশের পর পঞ্চক ও দাদাঠাকুরের মধ্যে যে দীর্ঘ সংলাপ সেই সংলাপের শেষাংশে গুরুর আগমন সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অনেকটা অংশ বর্জন করে গুরু নাটকে দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বাদ পড়েছে রূপান্তরে এই দৃশ্যের কয়েকটি গান—'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন', পঞ্চকের কণ্ঠে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' এবং দাদাঠাকুরের অভ্যর্থনার গান। এই দৃশ্যে দাদাঠাকুর

ও পঞ্চকের কথোপকথনের অনেক অংশ বর্জিত হলেও ঐ কথোপকথনের শেষে শোনপাংশু-যূনকগণ স্থবিরপত্তনের রাজা কর্তৃক চণ্ডককে মেরে ফেলার যে সংবাদ দিয়েছিল এবং দাদাঠাকুর তাদের নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যে অভিযানের আহ্বান দিয়েছিল, সেই অংশ রূপান্তরে অক্ষুণ্ণ আছে। অচলায়তনে দর্ভক-পল্লীর দৃশ্য ছিল চতুর্থ দৃশ্য, গুরুতে হয়েছে তৃতীয় দৃশ্য, যদিও অচলায়তনের ঐ দৃশ্যের শেষাংশ গুরুতে কিয়ৎপরিমাণে বর্জিত। অচলায়তনে পঞ্চম দৃশ্যে শঙ্খবাদক ও মালী এসে মঠবাসীদের গুরুর আগমন সংবাদ দিয়েছে, অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে ('অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।') যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুর প্রথমে দেখা দিয়েছে মঠবাসীর সম্মুখে; ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রথমে মালী এসে দর্ভকপল্লীতে আচার্যদেবকে খবর দিয়েছে এবং তারপরে স্বয়ং দাদাঠাকুর আচার্যের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে দাদাঠাকুর-আচার্য-পঞ্চক-সুভদ্র, অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রাণের শিখা দীপ্যমান ছিল তাদের মিলনে নাটকের সমাপ্তি। অচলায়তনের বিচ্ছিন্ন সুভদ্র-উপকাহিনীকে যেমন গুরুতে একত্র করা হয়েছিল, তেমনি অচলায়তনের দর্ভকপল্লীর চতুর্থ ও ষষ্ঠ দৃশ্যকে গুরু নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে অবিচ্ছিন্ন আকার দেওয়া হয়েছে। ফলে নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে। দর্ভকপল্লীতে দর্ভকগণ পঞ্চক ও আচার্যদেবের সংলাপের পর মালী প্রবেশ করে গুরুর আগমনসংবাদ আচার্যদেবকে দিয়েছে। অচলায়তনে দাদাঠাকুররূপী-গুরুর সঙ্গে প্রথমে মঠবাসীদের ও পরে আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এখানে কিন্তু দর্ভকপল্লীর দৃশ্যদ্বয়কে এক দৃশ্যে পরিণত করার প্রয়োজনে গুরুর সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ হয়েছে আচার্যের। অচলায়তনে পঞ্চম দৃশ্য হয়েছে গুরুর চতুর্থ বা শেষ দৃশ্য। আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাদা-ঠাকুররূপী গুরু এসেছে মঠবাসীদের সামনে। তার আগমনবার্তা এখানেও দিয়েছে শঙ্খবাদক ও মালী, এখানেও দাদাঠাকুরের যোদ্ধবেশে প্রবেশ। অচলায়তনের পঞ্চম দৃশ্যে নাটকীয় ভাবে গুরুর আবির্ভাবের পর ষষ্ঠ দৃশ্যে দাদা-ঠাকুর-আচার্য-পঞ্চক ও সুভদ্রর মিলনে নাটক সমাপ্ত হয়েছিল। গুরুতে পরিণতি দ্বিধাগ্রস্ত—তৃতীয় দৃশ্য দর্ভকপল্লীতে হয়েছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য ও পঞ্চকের সাক্ষাৎ, কিন্তু তার সঙ্গে পঞ্চক ও সুভদ্রের সাক্ষাৎ হয়েছে চতুর্থ দৃশ্যে। দাদাঠাকুরের প্রেরণায় সেখানে পঞ্চক সুভদ্রকে বলেছে 'দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।' তাছাড়া, দর্ভকপল্লীর দুইটি দৃশ্যকে একটি দৃশ্যে পরিণত করতে

যেয়ে নাটকীয়তা নষ্ট হয়েছে। মঠবাসীদের সামনে গুরুর অতর্কিত আবির্ভাবে যে নাটকীয়তা ছিল, আচার্যের সঙ্গে দেখা করার পর মঠবাসীদের সামনে আসায় সেই নাটকীয়তা অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে গেছে।

## আট

### ॥ পদ্যনাট্য থেকে গদ্যনাটক ॥

### রাজা ও রানী : তপতী।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের দুটি রূপান্তর মুক্তধারা ও পরিত্রাণ, রাজার রূপান্তর অরূপরতন এবং অচলায়তনের রূপান্তর গুরু পূর্ব রূপের মতো গদ্যেই লেখা! কিন্তু রাজা ও রানী পদ্যনাট্য (১৮২৯), আর তার নবরূপান্তর তপতী (১৯২৯) গদ্যে লেখা। রাজা ও রাণীর তপতীতে রূপান্তরের দুইটি কারণ অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাজা ও রানী সম্বন্ধে বলেছেন যে এই নাটকটি তিনি শেকসপীয়রীয় ধরনে রচনার চেষ্টা করেছিলেন, অথচ 'এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল'। দ্বিতীয়ত, রাজা ও রানী হয়েছিল মেলোড্রামা; পুনঃপুনঃ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজা ও রানীর পরিণতি হওয়ায় অথচ নাটকে ট্র্যাজিক শুদ্ধির কোন আভাস না থাকায়, রাজা ও রানী একটি রক্তবক্রময় অতি-নাটকে পরিণত হয়েছিল। মনে করার সংগত কারণ আছে যে এই 'লিরিকের প্লাবন' এবং এই মৃত্যুর ঘনঘটাজনিত দুর্বলতা দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানীর পরিবর্তিত রূপ তপতীতে হাত দিয়েছিলেন।

কিন্তু তপতী নাটক পর্যালোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুর্বলতা দূর করতে পারেন নি, এবং দ্বিতীয় দুর্বলতা দূর করেছেন অন্য দুর্বলতাকে প্রশ্রয়দানের মূল্যে। যে লিরিকের প্লাবনের কথা রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী নাটক সম্বন্ধে বলেছিলেন তা প্রধানত এসেছিল অপ্রাসঙ্গিক 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্তের মাধ্যমে'। তপতীতে সেই প্রেমের প্রতিধ্বনি আছে বিপাশার প্রেমের উপাখ্যানে। একথা ঠিক যে কুমার-ইলার তুলনায় বিপাশার প্রেমের কাহিনী সমগ্র নাটকের বিচারে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, বিক্রমের কর্তব্যবিমুখ প্রেমের পাশে বিপাশার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমের প্রয়োজন ছিল প্রতিতুলনার

জন্য এবং বিপাশা কর্তব্যপালনের মধ্যে যে প্রেমের সাধনা করে সেই গভীর প্রেমানুভূতি ইলার মধ্যে ছিল না। কিন্তু তথাপি এই উপাখ্যানের মাধ্যমে তপতী নাটকে লিরিকভাবরসের উপস্থিতিজনিত ত্রুটি রাজা ও রানীর তুলনায় কম নয়। রাজা ও রানীতে মোট সাতটি গান আছে, ইলা সখীবৃন্দ কাঠুরিয়া প্রভৃতির মুখে। তপতীতে আছে দশটি গান এবং তার মধ্যে একটি ব্যতীত সব কয়টিই বিপাশার জন্য রচিত। এ ছাড়া আছে বিক্রমকর্তৃক মীনকেতুবন্দনার কবিতা আবৃত্তি, আছে মন্ত্রস্তবগান। সুতরাং গানের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যদি লিরিকের প্লাবন রাজা ও রানীর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে তবে তা তপতীতেও প্রবেশ করেছে এবং করেছে অধিকতর পরিমাণে। যদি কুমার-ইলার সুকোমল প্রেমোপাখ্যানের দ্বারা এই লিরিক প্রভাব রাজা ও রানী নাটকে এসে থাকে তবে নরেশ-বিপাশার প্রেমবৃত্তান্তের দ্বারাও এই লিরিক প্রভাব তপতী নাটককে কম আচ্ছন্ন করে নি।

রাজা ও রানী

ইলা ॥ সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে।
কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন হারাব।
একা বসে বসে ভাবি কোথা আছ তুমি
কী করিছ। কল্পনা কাঁদিয়া ফিরিয়া আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানি নে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্বদা—
কিছুই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ নাকি নাথ?
কুমারসেন ॥ ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বলো দেখি
কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব। (৩।২)

তপতী

বিপাশা ॥ এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে,
ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে পথে। এই তো তার সময়—

ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ ॥ খুব খুশি হয়েছ, বিপাশা।

বিপাশা ॥ খুব খুশি আমি।

নরেশ ॥ কোনো দুঃখই বাজছে না তোমার মনে?

বিপাশা ॥ এমন সুখ কোথায় পাব, কুমার, যাতে কোনো দুঃখ নেই।

নরেশ ॥ বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে?[১]

বিপাশা ॥ যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরোব।

নরেশ ॥ তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা ॥ কী হবে ফিরিয়ে, বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।

নরেশ ॥ আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব এক দিন। (২)

উন্নতি যে অনেক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,—সংলাপ ক্ষিপ্রগতি হয়েছে, ইলার উক্তিসমূহের অতিতরলতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা বিপাশার মধ্যে নেই। কিন্তু সংলাপের ভিত্তিতে চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন সৌভাগ্যক্রমে নারীচরিত্র অতিপেলবতা ও নমনীয়তা হারিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পুরুষচরিত্রের মেরুদণ্ড নমনীয় হতে আরম্ভ করেছে। ফলে মোটের উপরে চরিত্রকল্পনায় পেলবতাজনিত দুর্বলতা দূর হয় নি। দুইটি উক্তি পাশাপাশি তুলনা করলে একটি কৌতুককর ব্যাপার চোখে পড়ে, যার সঙ্গে পূর্বের মন্তব্যের সম্পর্ক আছে। রাজা ও রানীতে ইলা ফেরাতে চেয়েছিল কুমারকে, নারী রচনা করতে চেয়েছিল বন্ধনের পাশ, কিন্তু তপতীতে নরেশ তুলেছে ফেরার প্রশ্ন, কিন্তু নারী উত্তরে বলেছে 'কী হবে ফিরিয়ে, বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।' রূপান্তরে নারী-পুরুষ যেন ভূমিকা বদল করেছে।

পূর্বোদ্ধৃত অংশে যেমন রাজা ও রানীর পদ্যছন্দে লিখিত সংলাপের দুর্বলতা দূরীকৃত হয়েছে তপতীতে, সংলাপের গদ্যরূপান্তরের ফলে, তেমনি বিপরীত দৃষ্টান্তও বহু ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা ও রানীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ সংলাপের মধ্যে যে প্রত্যক্ষতা, স্পষ্টতা এবং সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের সক্ষমতা লক্ষিত হয়, তা তপতীর অবিচিত্র গদ্যের মধ্যে মেলে না।

রাজা ও রানী

বিক্রমদেব ॥ রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।

জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা ॥ শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে। (১।৩)

তপতী

সুমিত্রা ॥ এখন আর কী চাও।

বিক্রম ॥ পেয়েছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার করতে হবে কোন্ শুভক্ষণে? সুর মেলাতে পারছি নে, পেয়েও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে দান পেয়েছি, সেই দানই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।

সুমিত্রা ॥ মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ, পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আমারও কিছু চাবার নেই কি।

বিক্রম ॥ সব চাইতে পার, কিছু চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সুমিত্রা ॥ আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম ॥ পাও নি?

সুমিত্রা ॥ না পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে? (১)

রাজা ও রানীর উদ্ধৃত অংশটিতে সুমিত্রা মূল বক্তব্যে পৌছুতে কোনো বিলম্ব করে নি, তপতীর সংলাপাংশটিতে সেই বিলম্ব—অধীর গতি নেই। রাজা ও রানীর উক্তিতে আক্ষিপ্ত উপমার মধ্যে যে অনিবার্যতা, প্রত্যক্ষতা ছিল, তপতীতে বিক্রমের 'পেয়েছি বীণাটিকে' উক্তির মধ্যে সুমিত্রার সঙ্গে বীণার তুলনায় সেই অপৃথগ্‌যত্ন অনিবার্যতা নেই, এখানে উপমাটিকে নিতান্ত আলংকারিক প্রসাধন মনে হয়। রাজা ও রানীর উদ্ধৃত অংশটিতে যে বিষয়ের স্পষ্টতা এবং ভাষার ঋজুতা ছিল তা তপতীর রূপান্তরের মধ্যে নেই। ছন্দের টান অপসৃত হওয়ায়

যে ধনুকে টঙ্কার বাজত, সেই ধনুকে ছিলা শিথিল হয়ে গেছে, তার মধ্যে পূর্বরূপের সংহতি গতি এবং প্রত্যক্ষতা পাই না। এই সব ক্ষেত্রে রাজা ও রানীর ভাষা পদ্যছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নাটকীয়, কিন্তু তপতীর ভাষা গদ্য হওয়া সত্ত্বেও বহুলাংশে নাটকীয়তা গুণে বঞ্চিত।

রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানীর নাট্যকাহিনীকে পদ্য থেকে তপতীর গদ্যে রূপান্তর সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন, অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি 'নেড়াছন্দে ব্ল্যাংকভাসে' নাটকটি লেখেন নি, কারণ 'আমি স্পষ্টই দেখলুম, গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মত, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের; কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি।' এই কথা হয়তো তত্ত্বগত দিক থেকে সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু শেকসপীয়রের নাটকাবলীর সঙ্গে যারই পরিচয় আছে তিনিই জানেন পদ্যভাষায় নাট্য-সংলাপ রচনা করেও তার মধ্যে 'নানা মেজাজের রূপ আনা যায়'। দ্বিতীয়ত মনে রাখা দরকার, যে সমস্ত সমালোচক স্রষ্টা হিসাবেই প্রধানত খ্যাত তাদের সমালোচনা বা সাহিত্যসম্বন্ধীয় মন্তব্য সাধারণত নিজেদের সৃষ্টিকর্মের অভিজ্ঞতা, এমন কি নিজেরা যে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত সেখানে যে বিষয় ও আঙ্গিক তিনি ব্যবহারে ইচ্ছুক সেই ইচ্ছার রঙে রঙীন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় গদ্যকবিতা এবং গদ্যছন্দের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তান্বিত ছিলেন, সেই বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা যে তপতীতে গদ্য-ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে এই মন্তব্যটিকে প্রভাবিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রযোজ্য হোক বা না হোক, যে নাটকের প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে সেই তপতী সম্বন্ধে কিন্তু এই মন্তব্য খাটে না। অভিজ্ঞতার স্তরের তারতম্য, উপলব্ধির উচ্চাবচতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তি প্রকাশে তপতীর গদ্যভাষা এমন কোন বৈচিত্র্য, এমন কোন বহুমুখী ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে নি যার জন্য তপতীর গদ্যকে স্থলদৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে 'অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি'-র প্রতিমান খুঁজে পাওয়া যায়। তুলনায় রাজা ও রানীর পদ্যবন্ধে রচিত সংলাপ অনেক বেশি নাট্যগুণান্বিত; বিচিত্র চরিত্রের মনোভাব রূপায়ণে, বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রকাশে সেই ভাষা অনেক বেশি সক্ষম। এক দিকে এই ভাষায় দেবদত্তের রসিকতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বেদনা প্রকাশ পায়, রেবতীর হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে সুমিত্রার প্রভাস্বর ক্রোধের দীপ্তি মুহূর্তে ঠিকরিয়ে ওঠে।

ঘৃণা করো মহারাজ, ঘৃণা করো মোরে
সেও ভালো—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ। (২।২)

এই জাতীয় উপলব্ধি-বৈচিত্র্যের প্রকাশ, ভাবতরঙ্গের তারতম্য আমরা তপতীর গদ্যসংলাপে পাই না। রাজা ও রানীর সংলাপ 'নেড়াছন্দে ব্ল্যাংকভার্সে' অমিত্রাক্ষরে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকাংশে যে নাটকীয়তা আছে, তপতী নাটক গদ্যে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তার সংলাপের মধ্যে সেই নাটকীয়তার টান নেই। সেই কারণে বলা যায়, যে লিরিকের প্লাবন রাজা ও রানীর নাটকীয়তাকে ব্যাহত করেছে বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, কুমার-ইলার অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান বাদ দিয়েও সেই গীতিপেলবতার দোষ রবীন্দ্রনাথ তপতীতে শোধন করতে পারেন নি; বরং সেই দুশ্চিকিৎস্য গীতিপ্রবণতা বিপাশা-নরেশের প্রেম, বিপাশার গান এবং তপতীর নিজস্ব গদ্যের মাধ্যমে ফিরে এসেছে। এই গদ্য লিরিকের লাবণ্যে মধুর। এই প্রসঙ্গে তপতীর স্বপক্ষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। রাজা ও রানীর সামগ্রিক নাট্যচরিত্রের সঙ্গে ইলা-কুমারের অপ্রাসঙ্গিক প্রেমোপাখ্যানের মাধ্যমে যে লিরিকধর্ম অনুপ্রবেশ করেছিল তাতে পরস্পরবিরোধ ছিল। কিন্তু গীতিধর্ম সমগ্র তপতী নাটকের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এখানে সেই বিরোধের কোন প্রমাণ নেই। সেই দিক থেকে তপতীতে নাটকীয় ঐক্য যে অধিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাজা ও রানীর সঙ্গে তপতীর প্রধান পার্থক্য নাটকের পরিণতিতে। রাজা ও রানীর শেষে স্বর্ণথালে কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে সুমিত্রা প্রবেশ করেছে এবং রাজাকে।

এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিশিখা—
সুখী হও তুমি। (৫।৯)

বলে সুমিত্রা দয়াময়ী জগজ্জননীর কোলে স্থান ভিক্ষা করেছে, তার পতন এবং মৃত্যু হয়েছে। পরে ইলা প্রবেশ করে এই দৃশ্য দেখে সেও মূর্ছিত হয়েছে। রাজা ও রানীর মৃত্যুঘনঘটাপূর্ণ পরিণাম রবীন্দ্রনাথের কাছে পরে অসহ্য মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মৃত্যুর ঘনঘটার' দ্বারা 'চমৎকার উৎপাদন' 'আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়'। সুতরাং আখ্যানের পক্ষে যা অনিবার্য ছিল না সেই অকারণ মৃত্যু-বাহুল্য দূর করার জন্য তিনি তপতীতে

নাট্যপরিণামকে পরিবর্তিত করেছিলেন। এই পরিবর্তনের আরো একটি কারণ ছিল। তপতীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা। রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি।' এই ভাবটি যাতে পরিস্ফুট হয়, তপতীতে রাজা ও রানীর শেষাংশ পরিবর্তনের সময় রবীন্দ্রনাথ সেইদিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঘনঘটাকে রাজা ও রানীর রূপান্তরকালে যে বহিষ্কৃত করেছিলেন তার কারণ শুধু এই নয় যে ঐ মৃত্যু আখ্যানের অনিবার্য পরিণাম ছিল না, মেলোড্রামার অতি-চমৎকারিত্ব দূর করার প্রয়োজনেও শুধু এই পরিবর্তন নয়, মনে হয় এই পরিবর্তনের কারণ একদিকে তত্ত্বগত, অন্যদিকে নাট্যকারের মানসিক প্রবণতাজাত। যে জীবনদৃষ্টির ফলে ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি কোনদিন প্রশ্রয় পায় নি সেই জীবনদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অধিক পরিমাণে লাভ করেছিল। উপনিষদীয় আনন্দবাদের তত্ত্বকে তিনি যে শুধু সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, তাঁর ঐতিহ্যপরায়ণ মনের স্বাভাবিক গঠনও ঐ মতবাদের অনুকূল ছিল। এই কারণেও মনে হয় রাজা ও রানীর দুঃখবিষাদশূন্যতাময় আপাত শেক্সপীয়রীয় পরিণতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ তপতী রচনাকালে অনুভব করেছিলেন। আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় চেতনা ট্র্যাজেডির সত্যকে সত্যের মর্যাদা দেয় নি সাহিত্যে, সেই চেতনার উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ, আঙ্গিকগত পরিবর্তনের প্রয়োজনেই রাজা ও রানীকে তপতীতে রূপান্তরিত করেন নি, এই ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি রাজা ও রানী নাটকের ট্র্যাজিকচেতনার অসম্পূর্ণ ও অসার্থক প্রকাশটুকু তপতী রচনাকালে অপসারিত করেছেন। তাই তপতী নাটক রাজা ও রানীর মত বিক্রমের অনুতাপের হাহাকারে সমাপ্ত হয় নি, এই নাটক শেষ হয়েছে বিষাদের ঊর্ধ্বে, মিলনের ঊর্ধ্বে, এক সুদূর অমৃতলোকের বিভায়। সংলাপে লিরিকের লাবণ্যমাধুর্য সঞ্চার করার ফলে এবং পরিণতিতে এই সুদূর অধ্যাত্মলোকের বিভা বিকিরণ করায়, রাজা ও রানীতে যা ছিল মানুষের প্রেম, বেদনা ও অতিপ্রেমের ব্যর্থতার কথা, তপতীতে সেই কাহিনী যেন তার মানবিকগুণ বহুলাংশে হারিয়েছে। তপতীর সুমিত্রা স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসায়, বেদনায় এবং ক্রোধে আর যেন রাজা ও রানীর মানবী নয়, সে পূজারিণী, তপস্বিনী, যেন প্রায় দেবীর জ্যোতির্মণ্ডল তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। এ কথা রবীন্দ্রনাথও যে বুঝতে

পারেন নি তা নয়—সেই কারণে রাজা ও রানীর এই রূপান্তরের নাম প্রথমে 'সুমিত্রা' রাখতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি 'তপতী' রাখাই সাব্যস্ত করেন। 'সুমিত্রা' নাম দিলে সেই নামের মধ্য দিয়ে এক মানবীর কাহিনীর উপর জোর দেওয়া হতো, সে ক্ষেত্রে নামকরণ ও নাটকের মধ্যে বৈষম্যের সম্ভাবনা দেখা দিত ; সেই নারীর মানবগুণের উপর নয়, তার আদর্শের উপর, তার সাধনার উপর তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত তিনি নাটকের নাম 'সুমিত্রা' রাখেন নি।

রাজা ও রানীতে রচনার দোষে নাটকের যে মূল সত্যটি পরিস্ফুট হয় নি তাকে পরিস্ফুট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তপতী নাটকের শেষাংশের পরিবর্তন করেছিলেন এ কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে জেনেছি। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি 'সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্যোপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো' নাটকের এই মূল কথাকে ফুটিয়ে তুলতে অধিকতর সাফল্যলাভ করেছেন এ কথা মনে হয় না। সুমিত্রা বলেছে, 'রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেক দিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।' বহু দুঃখের দ্বারা আয়োজিত অগ্নিশয্যায় পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা সূর্যমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রবেশ করেছে। শঙ্করের বা বিপাশার মোহমুক্তি হয়েছে হয়তো কিন্তু বিক্রমের মোহমুক্তি আসক্তি দূর হয়েছে কিনা নাটকে তার কোন প্রমাণ নেই। কারণ চিতাগ্নি জ্বলে ওঠার পর বিক্রম সপার্ষদ প্রবেশ করেছে যেই, অমনি যবনিকা নেমে এসেছে। সুতরাং রাজা ও রানীতে নতজানু বিক্রমের অন্তিম অনুশোচনা ও অনুতাপে তার আসক্তি-অবসানের ও বিক্রম-কর্তৃক সুমিত্রার সত্যপরিচয় লাভের যতটুকু প্রমাণ ছিল, তপতীর শেষ দৃশ্যে সেটুকুও নেই। রাজা ও রানীতে অপরাধবোধে পীড়িত রাজা বিক্রম শান্তি পেয়েছে এমন প্রমাণ নেই। তপতীর পরিণামে মার্তণ্ডমন্দিরে শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হলো বটে, কিন্তু সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হলো কিনা, বিক্রমের হৃদয়ে শান্তি এল কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। বিক্রমের মোহমুক্ত দৃষ্টি সুমিত্রার সত্য-পরিচয় পেয়েছে কিনা এবং বিক্রমের হৃদয় শান্ত হলো কিনা, নাটক সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দেয় না, কারণ নাট্যকার শেষ দৃশ্যে নির্বাক বিক্রমের সামনে যবনিকার আবরণ টেনে দিয়েছেন।

রাজা ও রানী থেকে তপতীতে রূপান্তরে এই পরিবর্তনগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে যে কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন সেই-সেই ব্যাপারে তপতীতে তিনি সন্দেহজনক সার্থকতা অর্জন করেছেন। অন্যান্য পরিবর্তনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা এই তপতী নাটকের দৃশ্যগুলি রাজা ও রানীর মতো বহুধাবিভক্ত নয় এবং ফলে অতি-সংক্ষিপ্ত নয়। রাজা ও রানীর পাঁচটি অঙ্কের অন্তর্গত ত্রিশটি দৃশ্য এখানে চারটি দীর্ঘ এবং একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। অবান্তর উপকাহিনী এবং অবান্তর চরিত্র বর্জিত হওয়ায় মূল কাহিনী লঘুভার ঐক্য অর্জন করেছে রূপান্তরে। নারায়ণী চরিত্র এবং নারায়ণী-দেবদত্তের দাম্পত্য-আলাপ তপতীতে পরিত্যক্ত হয়েছে, পরিত্যক্ত হয়েছে রেবতীর চরিত্র। কুমার-ইলার উপকাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরে গ্রহণ করেন নি, ইলা তাই সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত, কুমারসেনের ভূমিকাও অনেক সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ইলার সঙ্গে সঙ্গে ইলার পিতা অমরুরাজও বর্জিত। রানীর লুব্ধ পরোপজীবী আত্মীয়দলের প্রতিনিধি মিহিরগুপ্ত ও জয়সেন রাজা ও রানীতে কুশীলব হিসাবে উপস্থিত ছিল, এখানে প্রত্যক্ষভাবে আর কেউ উপস্থিত নয়। ত্রিবেদীও বহুল পরিবর্তিত চরিত্র। যে ত্রিবেদী ম্যালাপ্রপিজম্-খচিত সংলাপে রাজা ও রানীতে হাস্যরসের বিষয় ছিল, তপতীতে সে আর তা নয়।

## নয়

## গদ্য নাটক থেকে পদ্য নাটক

কালের যাত্রা গ্রন্থের প্রথম নাটক রথের রশি 'রথযাত্রা' নামে প্রথমে প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুই রূপে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। রথযাত্রার জগৎ সম্পূর্ণ পুরুষের জগৎ, কিন্তু রথের রশির প্রথমেই শুধু আমরা রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের সংলাপ পাই না, এই পরিবর্তিত রূপে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ব্রাহ্মণ-সামন্ত-ধনিকের পর শক্তির কেন্দ্র হবে শূদ্র, এই ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় বিমূর্ত তত্ত্ব বাস্তব পটভূমিকা পেয়েছে। রথ চলছে না, রথের রশি অনড় পড়ে আছে—এই দৃশ্য মেয়েদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করেছে তার ফলে মহাকালের গতির পিছনে একটি বাস্তবজীবনের পশ্চাৎ-পট রচিত হয়েছে।

(১) রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।

(২) গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও!

(৩) জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

রথযাত্রায় সেই সন্ন্যাসী ছিল না, যে সন্ন্যাসী রথের রশিতে বারবার মঞ্চে প্রবেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছে মূর্তিমান বিবেকের মতো। নাটকের মধ্যে কবি যেমন নাট্যকারের প্রতিভূ, তেমনি এই সন্ন্যাসী একদিকে কবির প্রতিভূ, অন্যদিকে কালপুরুষ বিধাতাপুরুষের প্রতিনিধি—তার সতর্কবাণী যেন দৈববাণী।

(১) তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

(২) সর্বনাশ এল।
গুরু গুরু শব্দ মাটির নিচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

মেয়েদের এবং সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতিতে প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রথম রূপে একদিকে যেমন বাস্তব জীবনযাত্রার পশ্চাৎপট ছিল না, তেমনি অন্যদিকে ছিল না নাটকীয় ঘটনার উপরে ভবিতব্যভারাতুর মেঘ।

মেয়েদের দল এবং সন্ন্যাসী চরিত্র যোগ করায় নানা জনের প্রবেশ-প্রস্থান ক্রমের পরিবর্তন করতে হয়েছে। রথযাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল নাগরিকদের সংলাপে, রথের রশি শুরু হয়েছে রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের সংলাপ দিয়ে। দ্বিতীয় রূপে নাগরিকদের কথোপকথন পাই অনেক পরে। পূর্ব রূপে নাগরিকদের পরেই সৈন্যদল প্রবেশ করেছিল, রূপান্তরে সৈন্যদল প্রবেশ করেছে অনেক পরে। অনুরূপভাবে পূর্ব রূপের তুলনায় মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ নূতন

রূপে বিলম্বিত হয়েছে। সংলাপের এই জাতীয় পুনর্বিন্যাসকালে পূর্বের সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হলেও, কোথাও কোথাও সংলাপের মূলভাব এক রেখেও ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে; যেমন নিচের উদ্ধৃত অংশে হয়েছে বক্তব্যের অতিস্পষ্টতাদোষ দূরীকরণের প্রয়োজনে।

রথযাত্রা

মন্ত্রী॥ দেখ শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চলেছে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটের প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে-না-ধরতে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মত ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বলো, শস্ত্রই বলো সব অর্থহীন হয়ে পড়েছে—অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

রথের রশি

মন্ত্রী॥ অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

রথযাত্রা শেষ হয়েছিল 'not with a bang, but a whimper'। শেষ সংলাপ পাই পুরোহিত ও সৈনিকের সঙ্গে কবির। কবির যে উক্তির পরে যবনিকা নেমে এসেছে তার মধ্যে কোন দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা নেই। যে শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা, সামাজিক শক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তন নাটকের মূল বক্তব্য, তার পাশে নাট্যপরিণামের এই উক্তি বিবর্ণ রক্তশূন্য, ফলে সংগতিহীন মনে হয়। তার সঙ্গে তুলনায় মেয়েদের প্রশ্নের উত্তরে কবির উক্তি ও সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনির মধ্যে রথের রশির যে পরিণতি তার মধ্যে নাট্যবিষয়ের উপযুক্ত দৃঢ়তা প্রখরতা ও বলিষ্ঠতা এসেছে, ক্রান্তিকালের বাণী তার মধ্যে সংক্রামিত। তুলনার দ্বারা এই মন্তব্যের যথার্থতা স্পষ্ট হবে।

রথযাত্রা

সৈনিক। আমরা কি করব?
পুরোহিত আমি কি করব?

কবি ॥ তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তারপরে ডাক পড়বার জন্য তৈরি হয়ে থাকো।

রথের রশি

প্রথমা ॥ তারপরে হবে কী।

কবি ॥ তারপরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক
একবার মাথা তুলে।

( সন্ন্যাসীর প্রবেশ )

সন্ন্যাসী ॥ জয়—মহাকালনাথের জয়!

কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের চিহ্ন রয়েছে অন্যত্র। রথযাত্রা গদ্যে লেখা, রথের রশিতে সেই গদ্য সংলাপ গদ্যকবিতায় পরিবর্তিত। সেই দিক থেকে এই রূপান্তর রাজা ও রানী নাটক থেকে তপতীতে রূপান্তরের বিপরীতধর্মী। গদ্য সংলাপ কী কৌশলে গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সূত্র নির্ণয় করা সহজ হয় যখন দেখি, নিঃশ্বাসের পতন, উচ্চারণের সুবিধা এবং ভাব অনুযায়ী গদ্যের বাক্যগুলিকে নানা দীর্ঘহ্রস্ব পংক্তিতে বিন্যস্ত করা হয় এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বসে কর্মের বা অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ; যেখানে গদ্যের মতো বাক্যের শেষে বসে সেখানে ব্যতিক্রম বৈচিত্র্যসৃষ্টির দায়ে। নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের দুইরূপ লক্ষ্য করলে এই দুইটি সূত্র সত্য বলে গ্রাহ্য হবে মনে হয়।

রথযাত্রা

২ সৈনিক ॥ কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো?

কবি ॥ পারি বৈ কি।

১ সৈনিক ॥ পুরুতের হাতে রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী?

কবি ॥ ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হয় না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক ॥ কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে, খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি ॥ ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শুধু চলাটাই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের ওপর ল্যাজ আছড়াচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরোহিত ॥ আর তোমার শূদ্রগুলিই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে?

কবি ॥ হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে। দেখো না কালই বলতে শুরু করবে, আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকেই গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

রথের রশি

দ্বিতীয় সৈনিক ॥ একী উলটো পালটা ব্যাপার কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু?

কবি ॥ ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নিচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে—দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত ॥ তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরা কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি ॥ পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

কালের যাত্রার অন্তর্ভুক্ত অন্য নাটিকা 'কবির দীক্ষা'র নাম মাসিক বসুমতীর বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশ কালে ছিল 'শিবের ভিক্ষা'। পত্রিকার সূচীপত্রে রচনাটিকে 'কবিতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দুইজনের সংলাপ অবলম্বনে এই নাটিকা লিখিত হলেও বস্তুত এটি একটি কবিতা। কিঞ্চিৎ নাট্যলক্ষণ থাকায় যদি এই রচনাটিকে এবং রথের রশি রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রচনাবলীর গদ্যনাটকসম্বলিত খণ্ডের মধ্যে নয়, আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য সম্বলিত খণ্ডটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কারণ রচনা দুইটিতে নাট্যের গুণের চেয়ে কাব্যের গুণ বেশি এবং রচনাদ্বয়ের সংলাপ গদ্য নয়, গদ্যকবিতা।

শিবের ভিক্ষার নাম কবির দীক্ষা হওয়ায় বক্তব্যবিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি— যদিও নামকরণের সুদূর পরিবর্তনে নাটকের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে এমন সন্দেহ হতে পারে। শিবের ভিক্ষায় শিবের কথা থাকলেও, শিবের শিষ্য যে কবি সেই কথাই নাটিকার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। সুতরাং এই নামান্তর নাটিকার বিষয়বস্তু বিবেচনায় সংগত হয়েছে। দুই রূপেই কবি বলেছে, 'শিবমন্ত্র তো আমিই দিয়ে থাকি। আমি যে শৈবসন্ন্যাসী। কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।'

শিবের ভিক্ষার গদ্যসংলাপ কী ভাবে গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিই। গদ্যকবিতায় রূপান্তরে যে ব্যঞ্জনাধর্ম অর্জিত হয়েছে তার ফলে যে কথা মূল গদ্যে অতি স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন হয়েছিল এখন সে প্রয়োজন আর নেই, অথচ বক্তব্য তার ভগ্নাংশও হারায় নি।

## শিবের ভিক্ষা

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস আছে বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবার আশ্বাস দেবেন বলে। অমরাবতীতে যে দেবতাদের বাসা, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁদের কোন দ্বন্দ্বই নেই—তাঁরা অমৃত পান করে পূর্ণ হয়েই বসে আছেন। কিন্তু মানুষের যে শিব, বিষ পান করে তাঁকে বিষ কাটাতে হয়, শ্মশানের ভিতর দিয়েই মৃত্যুকে জয় করতে হয়। মানুষের কাছে ভিক্ষুক দেবতা তার প্রাণও চাচ্ছেন, যারা অসংকোচে সেই ভিক্ষা দিতে পারে, তারাই যথার্থভাবে প্রাণে বেঁচে যায়—যারা পারলে না, তাদের সকল রাস্তাই মরবার দিকে পৌঁছে দেয়। লোকালয়ের পথে পথে দ্বারে দ্বারে দেবতার কণ্ঠে রব উঠেছে ভিক্ষে দাও, ভিক্ষে দাও। সেই দেবতার ভিক্ষে অল্প নয়, সে মুষ্টিভিক্ষে নয়, অবজ্ঞার ভিক্ষে নয়। আপনার প্রতি যে দাতার শ্রদ্ধা আছে, তারই দান অকৃপণ হয়, পূর্ণ হয়, তার মধ্যে হীনতা থাকে না, অশুচিতা থাকে না। দানে যখন মলিনতা, নিস্তেজতা দেখি, তখনি বুঝি দাতা শ্রদ্ধা হারিয়েছে, নির্ঝ'রিণীর স্রোত যেই অলস হয়ে পড়ে, পাঁক সেই প্রধান হয়ে ওঠে, সেই কলুষিত দানে দুর্বল আত্মার আত্মাবমাননাই প্রকাশ পায়, দেবতার তৃতীয় নেত্র অগ্নিদীপ্ত হয়ে ওঠে।

## কবির দীক্ষা

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে
দ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষ পান করেন বিষ কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও' 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তার কণ্ঠে—
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝ'রিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

দশ

## গীতিনাট্যের রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে 'যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল' তখন যে গীতিনাট্যগুলি তিনি লিখেছিলেন তাদের অনুপ্রেরণা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সংগীতচর্চার পরিবেশ কী ভাবে কাজ করছিল তার বিবরণ শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থের, 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য' অধ্যায়ে দিয়েছেন। 'ঐ যুগের শিক্ষিতদের মধ্যে বিলেতি সংগীতের আন্দোলন কী রকম জেগেছিল' তার পরিচয় ঐ অধ্যায়টি থেকে পাই। বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় বিলেতিসংগীত চর্চার দিকে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ আগ্রহ বোধ করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীও রবীন্দ্রনাথের বিলেতি সংগীতচর্চার অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন। বাল্মীকিপ্রতিভার পূর্ব থেকে ঠাকুর পরিবারে বিলেতি অপেরার অনুসরণে গীতিনাট্য রচনা ও অভিনয়ের বিবরণ আমরা পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিরচিত মানময়ী একটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য। জানা যায়, মানময়ীরও পূর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত বসন্ত উৎসব নামে একটি গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সুতরাং বাল্মিকীপ্রতিভা রচনার প্রস্তুতি হিসাবে এই পারিবারিক গীতিনাট্য চর্চা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহায্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল। ঐ সময়ের অন্যান্য গীতিনাট্যগুলি যেমন বিদেশী অপেরার অনুসরণে গড়ে উঠেছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্য-গুলির—বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলার মৌলিক আদর্শ পাশ্চাত্য অপেরা।

কিন্তু অপেরায় সুরেরই প্রাধান্য, সংগীতের কথা ও নাটকীয় ঘটনাবস্তু অপেরায় অনেক পরিমাণে অবহেলিত হয় সেদিক থেকে মায়ার খেলার সংগে পাশ্চাত্য অপেরার সাহায্য বেশি—কারণ যদিও মায়ার খেলার সংগীতে কথা অবহেলিত নয়, কিন্তু এই গীতিনাট্যে নাটকীয়তার পরিমাণ সামান্য। মায়ার খেলায় নাট্য মুখ্য নয়, গীতই মুখ্য। মায়ার খেলা নাট্যের সূত্রে গানের মালা। নাট্যবস্তু ব্যবহার করা হয়েছে গানগুলি সাজানোর উপায় হিসাবে। এই গীতিনাট্য রচনাকালে গানের রসে কবির মন অভিষিক্ত ছিল, একথা কবি নিজেই বলেছেন। বোঝা যায় এই গীতিনাট্য রচনাকালে গান রচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী এবং গানগুলিও তাই পেয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। কিন্তু বাল্মীকি-

প্রতিভা ঠিক অপেরা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই গীতিনাট্যের গোত্র পরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন 'ইহা সুরে নাটিকা ; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার মধ্যে নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।' কথার সাহায্যে এবং কথার সঙ্গে যথোপযুক্ত সুরের সাহায্যে বাল্মীকিপ্রতিভায় নাট্যরসকে প্রকাশ করার প্রয়াস হয়েছে। কখনও বিলেতি সুর, কখনও দেশি রাগরাগিণী নাট্যোপযোগী সুরের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন এবং নিজের উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন। এই গীতিনাট্যে সুরের যে স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই, নাট্যরসকে প্রকাশ করার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এখানে যে সুরের ব্যবহার সে কথা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি থেকেই বোঝা যায়—'এই গীতিনাট্যে তাহাকে (রাগরাগিণীকে) তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।···সংগীতকে এইরূপ নাট্যকর্মে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতকে এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষ ভাবে অধিকার করিয়াছিল।' এই নূতন সৃষ্টির উল্লাসের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও রোমন্থন করেছেন—'বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।' লক্ষণীয় যে কথাটি 'আমার উত্তেজনা' নয়, 'আমাদের উত্তেজনা'। বোঝা যায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার সংঘর্ষের বিস্তীর্ণ পরিসরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্রতর বিশেষ ক্ষেত্রে, বিলেতি সংগীত চর্চার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে যে 'সংগীতের উত্তেজনা' সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি গীতিনাট্য বস্তুত তারই ফসল।

## (ক) বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া।

এই গীতিনাট্যগুলির রূপান্তর বিষয়ে একটি আলোচ্য প্রথম সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ বা বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকিপ্রতিভার রূপান্তর এবং এই রূপান্তরকালে কালমৃগয়া গীতিনাট্যের উপকরণ বাল্মীকি-প্রতিভায় ব্যবহার। বাল্মীকিপ্রতিভা পরিকল্পনার দিক থেকে যে আংশিক ভাবে বিহারীলালের সারদামঙ্গলের অনুসারী এবং বিহারীলালের কাব্যের

ভাষাগত কিছু উপকরণও যে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভায় গ্রহণ করেছেন সে কথা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রথম সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য বর্তমানে রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। বাল্মীকিপ্রতিভার রূপান্তরিত দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত মূল রবীন্দ্ররচনাবলীর পৃথক ও গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য পাই—'বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার পুনর্লিখিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা সংগত নহে।' কালমৃগয়াও এখন অচলিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণের প্রথম দস্যুর 'আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ' গানের পূর্বে দ্বিতীয় সংস্করণে বনদেবীগণের গান এবং প্রথম দস্যুর 'আঃ বেঁচেছি এখন' গান যুক্ত হয়েছে। প্রথম দস্যুর কণ্ঠের এই নবযুক্ত গানটি কালমৃগয়া গীতিনাট্যের পঞ্চম দৃশ্যের বিদূষকের গানের রূপান্তরমাত্র। কালমৃগয়ার বিদূষক ছিল শিকারীদলের সঙ্গে কিন্তু প্রথম দস্যু দস্যুদলের একজন। কিন্তু বিদূষকের গান দস্যুর মুখে বসায় প্রথম দস্যু নামত দস্যু হয়েও কার্যত বিদূষক। দুইজনের অবস্থাস্বাতন্ত্র্যের জন্য গানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

কালমৃগয়া

বিদূষক ॥ আঃ বেঁচেছি এখন। শর্মা ওদিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন।
বাবা! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত কপাটি,
পড়ল খসে হাতের লাঠি
কে জানে কখন। (৫)

বাল্মীকিপ্রতিভা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

*প্রথম দস্যু* ॥ আঃ বেঁচেছি এখন। শর্মা ওদিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি ফাটাফাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন—
আহা সটকেছি কেমন। (১)

গানটির অধিকাংশ রূপান্তর নয়, সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা। নূতন করে লিখতে

যেয়ে 'শুধু মুখের জোরে, গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে' এই যে ভাবটি এসেছে সেই ভাব কালমৃগয়ার বিদূষকের মধ্যে ছিল না। এই ভাব যুক্ত হওয়ায় প্রথম দস্যু আপাতত দস্যু হলেও সে যে বস্তুত বিদূষক তা আরো প্রকট হয়েছে। প্রথম সংস্করণে বালিকারূপী সরস্বতী 'এ কী ঘোর বনে' গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেছে কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের পূর্বে বালিকাকণ্ঠে যুক্ত হয়েছে 'ওই মেঘ করে বুঝি গগনে' এই নবরচিত গানটি। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমেই বাল্মীকির কালীস্তবগান রূপান্তরিত।

বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রথম সংস্করণ)

নিশুম্ভমর্দিনী অম্বে,
মহাসমর প্রমত্ত মাতঙ্গিনী,
কম্পে রণাঙ্গন পদভারে, এ কি!
থরহর মহীসমুদ্র, পর্ব্বতব্যোম,
সুরনর শঙ্কাকুল—কে এ অঙ্গনা! (২)

বাল্মীকিপ্রতিভা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা!
আজি ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মাগো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুচাও তড়িত-অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত ; ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা। (২)

এই রূপান্তর সম্পূর্ণ নূতন রচনা, যদিও 'সুরনর থরহর' বাক্যাংশের প্রতিধ্বনি প্রথম রূপে ছিল। প্রথম রূপে স্তবের ভাব ছিল না যা দ্বিতীয় রূপে এসেছে। এখানে ভাষার পরিণতির, কল্পনার অবয়বত্বের প্রমাণ শুধু পাই না, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রূপে পাই শ্যামাসংগীতের ভাবভাষার প্রভাব। ফলে কালীভক্ত বাল্মীকির এই শ্যামাসংগীতের অনুগামী স্তবগান অনেক সংগত হয়েছে। প্রথম রূপে বোঝা যায় কালীকল্পনা কবিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি, কিন্তু দ্বিতীয় রূপে 'মহাকালসীমন্তিনী' কালীর বর্ণনায় আমরা প্রেরণার উত্তাপ পাই।

প্রথম সংস্করণের তৃতীয় দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে বাল্মীকি 'জীবনের কিছু হল না; হায়!' বলে

হতাশাপীড়িত হয়েছে, এখানে ক্রৌঞ্চবধ, বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও সরস্বতীর আবির্ভাব উপস্থাপিত হয়েছে। এই স্থানান্তরকালে সামান্য পরিবর্তন অবশ্য হয়েছে—সেই পরিবর্তন, বনদেবীদের আবির্ভাব ও গান এবং সরস্বতীর প্রতি নূতন আনুগত্যে কালীর প্রতি 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' বাল্মীকির এই উক্তি। প্রথম সংস্করণের তৃতীয় দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়েছে ষষ্ঠ দৃশ্যে। এখানে সরস্বতীর আবির্ভাবের পর আবার সহসা অন্তর্ধান, বাল্মীকির 'কোথা লুকাইলে' বলে কাতর আহ্বান, লক্ষ্মীর প্রবেশ, বাল্মীকি-কর্তৃক লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান এবং সরস্বতীর পুনরাবির্ভাব উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে স্থানান্তরকালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। সরস্বতীর পুনরাবির্ভাবের পূর্বে বনদেবীগণের একটি নূতন গান যুক্ত হয়েছে, বর্জিত হয়েছে সরস্বতীর আশিসবচনের পূর্বে বাল্মীকির সরস্বতীবন্দনা এবং সরস্বতীর আশিসবচন থেকে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণ—

শুনিতে শুনিতে, বৎস, তোর সে অমর গীত
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যত দিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা, তুই আদি মহাকবি। (৩)

দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্মীকি প্রতিভার তৃতীয় দৃশ্য বাল্মীকির 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে/ভ্রমি একেলা শূন্য মনে' গানটি ব্যতীত সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা। বাল্মীকি প্রস্থান করলে দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরে নিয়ে এসেছে, কারণ দলপতি নিষেধ করা সত্ত্বেও এমন শিকার ছাড়তে তাদের মন উঠছে না। কালীপূজার সামগ্রী তারা সংগ্রহ করেছে এবং বালিকার 'হা, কী দশা হল আমার' এই কাতরোক্তির প্রতি কর্ণপাত না করে কালীপ্রতিমাকে ঘিরে তারা নৃত্য শুরু করেছে। বাল্মীকি প্রবেশ করে তাদের কাজে বাধা দিয়েছে, দস্যুদলকে তিরস্কৃত করেছে এবং অভয় দিয়েছে বালিকাকে। দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ দৃশ্যে দস্যুদের শিকারবৃত্তান্ত কিছু নূতন করে লেখা, কিছু কালমৃগয়ার রূপান্তর। দস্যুদের উদ্দেশে শিকারের জন্য বাল্মীকির আহ্বান 'গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে' সম্পূর্ণ নূতন গান। অতঃপর দস্যুদের শিকারকালীন কথোপকথন প্রায় অপরিবর্তিতভাবে কালমৃগয়া গীতিনাট্যের পঞ্চম দৃশ্য থেকে গৃহীত। এর পরে কালমৃগয়ার বিদূষকের গান প্রথম দস্যুর গানে এবং বিদূষক ও শিকারীগণের সংলাপ প্রথম দস্যু ও দস্যুদলের সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের প্রমাণ 'প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে' গানটির

প্রথমাংশ অপরিবর্তিত ভাবে গৃহীত হলেও—'আমড়াতলায়' পরিবর্তিত হয়েছে 'কচুবনে'। গানটির দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে হয়েছে, কারণ

গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে—(৫)

বলা মাত্র বক্তার বিদূষক পরিচয় প্রকট হয়ে যায় এবং কথার পরিবর্তন না করলে এই গানকে প্রথম দস্যুর গান বলে চালানো যায় না। এই অবস্থান্তরের জন্য বিদূষকের শিকারীগণের প্রতি উক্তিকে প্রথম দস্যুর দস্যুদলের প্রতি উক্তিতে রূপান্তর করার সময় সামান্য পরিবর্তন করতে হয়েছে।

কালমৃগয়া

শিকারীগণ ॥ ঠাকুরমশায় ; দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই বসে। (৫)

বাল্মীকিপ্রতিভা ( দ্বিতীয় সংস্করণ )

দস্যুগণ ॥ সর্দারমশায়, দেরি না সয়
তোমার আশায় সবাই বসে। (৪)

দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধের কাহিনী নিয়ে কালমৃগয়া গীতিকাব্য রচিত হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ নাটক হওয়ার পক্ষে কাহিনীটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও জটিলতা-মুক্ত হওয়ার ফলে, বনদেবী, তপোবনে ঋষিকুমার ও বালিকার সংলাপ যোগ করে নাটকটিকে যথাসাধ্য বৃহদাকার দেবার চেষ্টা হয়েছিল। এই ঘটনাবস্তু অবলম্বনে বড়োজোর একটি কাহিনীকাব্য লেখা চলে। তিন দৃশ্যে সমাপ্ত বাল্মীকিপ্রতিভা শুধু অপরিণত প্রতিভার ছাপ বহন করছিল তাই নয়, পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্যের যথোচিত দৈর্ঘ্য এই নাটকেরও ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে তিন দৃশ্য চারটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়েছে, একটি প্রায় নূতন-লিখিত দৃশ্য যুক্ত এবং কালমৃগয়ার একটি দৃশ্য রূপান্তরিত হয়ে এখানে গৃহীত হয়েছে। ফলে তিন দৃশ্য শেষ পর্যন্ত ছয় দৃশ্য সম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণে প্রায় দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য লাভ করেছে। প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে ভাষাগত যে পরিবর্তন হয়েছে তার থেকে রবীন্দ্রপ্রতিভার অগ্রগতির বেগও অনুমান করা যায়।

## (খ) মায়ার খেলা।

রবীন্দ্রনাথ মায়ার -খেলা গীতিনাট্যের বিজ্ঞাপনে বলেছেন—'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য

আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধনরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।' সেই 'অকিঞ্চিৎকর গন্থনাটিকা' নলিনী। ইতিপূর্বে কাব্য থেকে নাট্যে রূপান্তর দেখাতে যেয়ে কীভাবে কবিকাহিনী কাব্য এবং ভগ্নহৃদয় নামক নাটকাকারে লিখিত সর্গবদ্ধ কাব্য নলিনী নামক প্রথম গন্থনাটকে রূপান্তর লাভ করেছিল সে কথা আলোচনা করেছি। এই পরিবর্তন ধারারই পরবর্তী পদক্ষেপ মায়ার খেলা গীতিনাট্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার মায়ার খেলা গীতিনাট্য ঠিক নলিনী গন্থনাট্যের রূপান্তর নয়—রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা রচনাকালে একদিকে যেমন কাহিনীগত উপকরণ নলিনী থেকে নিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে কাহিনী ও ভাব-গত নানা উপকরণ তৎপূর্বরূপ ভগ্নহৃদয় থেকেও নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থের 'রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত যে কথা বলেছেন সে কথা সমর্থনযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'নলিনীর ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রবিকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; বিশেষত শেষের দিকে 'পতন ও মূর্ছা' প্রভৃতি নাট্যকৌশলের আকস্মিক ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে নাটক সমাপ্ত করার ব্যস্ততাই পরিস্ফুট হয়েছে। নলিনীতে রবীন্দ্রনাথের সেকালের কয়েকটি ভালো গান আছে, তা না হলে ভগ্নহৃদয়ে যত ত্রুটিই থাক, আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ কবিত্বের গুণে তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে নলিনীতে তা নেই। বাইরের প্লটের দিক থেকে, রচনাকালের দিক থেকে, নলিনীর সঙ্গে মায়ার খেলার যত নিকটসম্পর্কই থাকুক, অন্তরে অন্তরে অনেক বেশি মিল আছে তার ভগ্নহৃদয়ের সঙ্গে।' 'আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ' হলেই রচনা সব সময় অধিকতর আকর্ষণীয় হয় কিনা এই বিতর্কের মধ্যে আপাতত না যেয়ে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি, মায়ার খেলা গীতিনাট্য আলোচনা করলে এবং তার সঙ্গে নলিনী ও ভগ্নহৃদয়ের তুলনা করলে, সমর্থন করতে হয়।

ভগ্নহৃদয়ের নায়ক কবির নাম নেই, নলিনীতে তাব নীরদ নামকরণ হয়েছে, মায়ার খেলায় সেই অমর। এখানে নায়িকা শান্তা বহুলাংশে ভগ্নহৃদয়ের মুরলা, যদিও সর্বাংশে নয়। সর্বাংশে নয়, কারণ শান্তার উপর নলিনী নাটকের নীরজার ছায়াও বর্তমান—বিশেষত সপ্তম দৃশ্যে। ভগ্নহৃদয়ের কবি যেমন আত্মচৈতন্য লাভের পর মুরলার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল, এখানেও তেমনি অমর শেষ পর্যন্ত শান্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। মায়ার খেলার শেষ দৃশ্যের কল্পনা যদিও বহুল পরিমাণে নলিনী নাটকের অনুরূপ তবু এখানে ভগ্ন-হৃদয়ের কবি-মুরলার মতো নীরব প্রেমিকা শান্তার সঙ্গে অমরের মিলনে নাটকের

সমাপ্তি হলো। কবি নলিনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলে ভগ্নহৃদয়ের আত্মত্যাগিনী মুরলা বলেছিল, 'তুমি সুখী হলে মোর কোন দুঃখ নাই'। এখানেও শান্তা মুরলার প্রতিধ্বনি করে বলে 'তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো'। মায়ার খেলার চপলা চঞ্চলা প্রমদাও ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর রূপান্তর। অবশ্য নলিনী নাটকের নামচরিত্র নলিনীর সঙ্গেও প্রমদার কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রমদার মধ্যে যে ব্রীড়া ও সংকোচের ভাব মায়ার খেলায় পাই, তা ভগ্নহৃদয়ের নলিনীকে স্মরণ করায়। ভগ্নহৃদয়ে চপলা নলিনী ব্যর্থ হয়েছিল, কবিকে লাভ করেছিল নীরব প্রেমিকা মুরলা, নলিনী নাটকে নীরব প্রেমিকা নীরজা আত্মদান করে নলিনীর সঙ্গে নীরদের হাত মিলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মায়ার খেলায় আবার আমরা ফিরে গেলাম ভগ্নহৃদয়ের পরিণতিতে। যে প্রমদা নলিনীর মতো তার বহু প্রণয়ীর দিকে 'আমি কভু ফিরে নাহি চাই' সেই ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর মতো প্রমদাও এখানে ব্যর্থ; ভগ্নহৃদয়ের মতোই নীরব প্রেমিকা শান্তার সঙ্গে এখানে অমরের মিলন হয়েছে। ভগ্নহৃদয়ের পরিণতিতে নলিনী ব্যর্থ, নলিনী নাটকে পূর্বের ব্যর্থ নলিনীর প্রতি অনুকম্পাবশত কবি নলিনীর প্রেমকে সার্থক করেছিলেন। কিন্তু নলিনীর রূপান্তর যে প্রমদা সে মায়ার খেলা গীতিনাট্যে পুনরায় ব্যর্থতার বোঝা বহন করতে বাধ্য হলো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মায়ার খেলায় ভগ্নহৃদয় বা নলিনীর ভাষা রূপান্তরিত করে গ্রহণ করা হয় নি। একই উপাখ্যান অবলম্বন করে রূপান্তরগুলি মোটের উপর নূতন করে লেখা। তবে ভগ্নহৃদয় নাটকাকারে কাব্য বলে ভগ্নহৃদয়ের ভাষার সঙ্গে কোথাও কোথাও মায়ার খেলা গীতি-নাট্যের ভাষাগত সাদৃশ্যের আভাস পাই।

ভগ্নহৃদয়

নলিনী ॥ সখি! অলকচিকুরে কিশলয় সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে।
চারু! দেখি ও আরশিখানি;
বালা! সিঁথিটি দে ত লো আনি;
লীলা! শিথিল কুন্তল দেখ্ বারবার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার,
একটু এ পাশে সরায়ে দে। (২)

মায়ার খেলা গীতিনাট্য

প্রমদা ॥ দে লো সখী, দে পরাইয়া গলে
সাধের বকুল ফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারবার। (৩)

এই সব ক্ষেত্রে ভাষান্তর মনে হতে পারে সচেতন রূপান্তর, কিন্তু মনে হয় অবস্থা ভাব এবং পরিবেশগত সাদৃশ্যের জন্যই এই ভাষাগত সাদৃশ্যের আভাস।

মায়ার খেলা গীতিনাট্যকে জীবনের শেষে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। বর্তমানে এই নৃত্যনাট্যরূপ গীতবিতানের পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থপরিচয়ে সম্পাদক মহাশয় জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ বয়সে নূতন রূপ দিয়া পুরাতন গানকে নূতন ভাবে রচনা করিয়া এবং বহু নূতন গানও যোজনা করিয়া নৃত্যে অভিনয় করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন।' মায়ার খেলার এই পরিবর্তিতরূপ যে অসম্পূর্ণ এই কথা রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বারংবার বলেছেন। '১২৯৫ সালের মায়ার খেলাকে ১৩৪৬ সালে যে ভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন তা যদি সম্পন্ন করে যেতে পারতেন তাহলে নূতন মায়ার খেলা আমরা দেখতে পেতাম।' অন্যত্র বলেছেন, '১৩৪৫ সনে মায়ার খেলা যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে নৃত্যে অভিনয় করবার কথা হল, তখন গুরুদেব এই নাটকটির আমূল পরিবর্তন করেন। বহু গান তিনি নূতন করে রচনা করেন। এই নূতন মায়ার খেলার রচনা সম্পূর্ণ হয় নি বা তা সম্পূর্ণ অভিনীতও হয় নি।' শান্তিদেব কেন এই নৃত্যনাট্যরূপটিকে অসম্পূর্ণ বলেছিলেন তার কারণ জানা যায় গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় থেকে। জানা যায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও রচনা শুরু হয়, কিছুকাল মহলা চলার পর ওই বৎসর দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতনে তার অংশবিশেষ অভিনীত হয়েছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যটির অভিনয় হয় নি। যে পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার পাঠ মুদ্রিত করা হয়েছে সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নাট্যনির্দেশে কোন কোন স্থলে সংশয়ের অবকাশ আছে। 'পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ অন্যের হাতের নকল হইলেও,

রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু অংশ বর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, বহু নূতন অংশ যোগ করিয়াছেন দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে, রচনা একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।' মায়ার খেলা গীতিনাট্যের এই নৃত্যনাট্যে রূপান্তর পর্যালোচনা করলে 'রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী মানসের আশ্চর্য পরিণতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।'

গীতিনাট্যে অশোক ও কুমারের যে ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকাকে এখানে এতই অকিঞ্চিৎকর করা হয়েছে যে ভূমিকা দুটি প্রায় বর্জিত বলা চলে। শান্তিদেবের গ্রন্থের একটি তথ্য থেকে কুমার ও অশোক চরিত্রের এই পরিণতির কারণ অনুমান করা যায়। 'শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যে অভিনয় করবার জন্য' এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন বলে পুরুষচরিত্রের ভূমিকা যত পরিমাণে সম্ভব তিনি নৃত্যনাট্যে সংক্ষিপ্ত করেছেন। এর ফলে পুরুষচরিত্রের গীতসংলাপ হয় অনেক পরিমাণে বর্জিত নতুবা অন্যজনের মুখে আরোপিত। কয়েকটি উদাহরণ দিই—কুমারের 'যেয়ো না যেয়ো না ফিরে' গানটি নৃত্যনাট্যে অমরের সংলাপ হিসাবে ব্যবহৃত, চতুর্থ দৃশ্যে অশোকের 'তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ' শান্তার মুখে বসেছে, এই দৃশ্যের কুমারের গান সখীর মুখে বসানো হয়েছে, অশোক ও কুমারের অনেক গীতসংলাপ অমর ও সঙ্গীগণের গীতসংলাপে পরিণত হয়েছে, পঞ্চম দৃশ্যে অমরের 'দিবসরজনী আমি যেন কার' গানটি সর্বৈব বর্জিত। 'দ্রুত এবং সুঠাম' ফলত ড্রামাটিক করার প্রয়োজনে, লিরিকের বাড়াবাড়িকে দূরীকরণের প্রয়োজনে, গানের সূত্রে গানের মালা রচনার প্রয়োজনে, নারীচরিত্রের মুখেরও অনেক গান রূপান্তরকালে রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছেন। যেমন প্রথম দ্বিতীয় ও সপ্তম দৃশ্য ব্যতীত মায়াকুমারীগণের উপস্থিতি ও গান আমরা অন্যত্র পাই না। মায়ার খেলার রূপান্তর বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটিতে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—'মায়াকুমারীগণের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে এবং ছিন্ন ছিন্ন গানে নানা করুণ মধুর ভাবুকতাকে নানা করুণ মধুর ভাষায় ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। বাদ দিয়ে, নাটকে বেগ বা নাটকীয়তা বহু গুণে বেড়েছে।' প্রমদার একটি গান এবং অশোক ও সখীগণের মধ্যে সংলাপগানও বর্জিত হয়েছে। পুরাতন গানের পরিবর্তে নূতন গান কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ষষ্ঠ দৃশ্যের প্রথমে অমরের মুখের গানটির এই রূপান্তর পাই।

মায়ার খেলা গীতিনাট্য

অমর ॥ সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল—
সেই রবিশশিতারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন।
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ। (৬)

মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য

অমর ॥ আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় যায় আলোহারা পথে হায়—
গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে। (৬)

যেথানে নূতন গানকে পুরাতনের রূপান্তর বলা চলে না, সেইরূপ নূতন গানের উদাহরণ দিই।

মায়ার খেলা গীতিনাট্য

অমর ॥ আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা।
কাহার মনের কথা মনেই থাকে।
আমি শুধু বুঝি, সখী, সরল ভাষা—
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা।
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে। (৬)

মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য

অমর ॥ ডেকো না আমারে ডেকো না—ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না।…
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ঢেকো না। (৬)

পুরাতন গানের জায়গায় এই নূতন গানগুলির ব্যবহার দেখলে এবং দুই জাতীয় গানের পার্থক্য পর্যালোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট হলে রবীন্দ্রনাথের উক্তির তাৎপর্য বোধগম্য হবে—‘প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা

করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।' মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলির মধ্যে ভাবের বাষ্প আকুল এবং উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তার মধ্যে অনুভূতির সংহত রূপ নেই, কল্পনা সেখানে রূপ বা অবয়ব পায় নি। পূর্ব যুগের গানের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের এই অতিরিক্ততা থাকায় যে সমস্ত চরিত্রের মুখে এই সব গান বসানো হয়েছে সেই চরিত্রগুলিও অনিবার্যভাবে ভাবালুতার দোষে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই গানগুলির এই পরিবর্তনকে এক দিক থেকে চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন শান্তিদেব ঘোষ করেছেন, 'নাটকের চরিত্রগুলির দুর্বল ভাবালুতা তিনি পছন্দ করেন নি, তাই আমূল পরিবর্তন করবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন।' চরিত্রগুলির ভাবালুতা বর্জন করতে গেলে তাদের সংলাপ-গানের ভাবালুতা বর্জন আবশ্যক, কারণ সংলাপের বাইরে নাটকীয় চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আবার এই পরিবর্তনকে গানের দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়—পুরানো গানের ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্যকে পরিহার করে নূতন গানের মাধ্যমে তিনি রূপসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। একটি উদাহরণ দিই যেখানে পুরাতন গানকে রূপান্তরিত করে তিনি নূতন রূপ দিয়েছেন এবং এই রূপান্তরের মাধ্যমে চরিত্রের ভাবালুতা-বর্জনের ও রূপসৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধ করেছেন তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মায়ার খেলা গীতিনাট্য

অমর ॥ আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।...
এ সংসারে কে ফিরাবে—কে লইবে ডাকি
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে॥ (৬)

মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য

অমর ॥ যে ছিল আমার স্বপনচারিণী...
শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।

কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারিনে যুঝিতে।
তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥ (৬)

প্রথম রূপ ছিল একক বেদনার ভাবালুতাপূর্ণ প্রকাশ, দ্বিতীয় রূপে একক বেদনায় সাধারণ বেদনা বিম্বিত হয়েছে ভাবসংহত শব্দপুঞ্জের মাধ্যমে। 'কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে' এই বাক্যাংশের মধ্যে অনুভূতি উপলব্ধির যে ভাবঘনত্ব আছে তার কোন আভাস পূর্বরূপে নেই।

যখন গীতিনাট্যে শান্তার 'আমার পরাণ যাহা চায়' গানের দ্বিতীয়াংশ নৃত্যনাট্যে বর্জিত হতে দেখি, যখন দেখি নব-যুক্ত গান 'ওকি এল, ওকি এল না' নানাজনের মুখে বিভক্ত হয়ে গীত হয়, তখন সন্দেহ করি মায়ার খেলার এই রূপান্তরের আরো একটি কারণ আছে এবং সেই কারণই প্রধানতম। গীতিনাট্য মায়ার খেলার গানগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গান এবং 'এর বহু গানকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও সেগুলি গাহিতে পারা যায়।' গীতিনাট্যে যেখানে ভাষা ও সুরের দুই মাত্রা ছিল, নৃত্যনাট্যে সেখানে তৃতীয় মাত্রা নৃত্য যুক্ত হয় বলে একটি মৌলিক পরিবর্তন সেখানে ঘটে। গীতিনাট্যে একটি সামান্য নাট্যকাহিনীকে অবলম্বন করে সংগীত-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হতে পারে, সেখানে সংগীতেরই প্রাধান্য, নাট্যবিষয় সেখানে গৌণ। কিন্তু নৃত্যের মাত্রা যুক্ত হওয়া মাত্র তাল আসে, সঙ্গে আসে গতি, যা নাটকের একটি মৌলিক লক্ষণ। ফলে নৃত্যের তথা নাট্যের মাত্রা যুক্ত হওয়া মাত্র গীতিনাট্যে যা ছিল বিরল-গতি তা নৃত্যনাট্যে হয়ে ওঠে 'দ্রুত এবং সুঠাম'। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের কাদম্বরী চিত্র প্রবন্ধে লিখেছেন—'গায়ক গান গাহিতেছে 'চ-ল-ত রা-আ-আ-আ-আ', ফিরিয়া পুনরায় 'চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ-আ' সুদীর্ঘ তান —শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না। সমঝদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে তো নাই চলুক, কিন্তু অনটন চলিতে থাকে।' গানের খেলায় উন্মত্ত হওয়া গীতিনাট্যে মানায় কিন্তু নৃত্যনাট্যে মানায় না, কারণ নৃত্যনাট্যে নৃত্যের মাত্রা আছে, সেখানে রাজকুমারীকে চলতেই হয়। নাট্যবিষয়কে রুদ্ধগতি করে গানের প্রবাহ মুক্ত করার কোন সুযোগ নৃত্যনাট্যে নেই। নৃত্যের মাত্রা যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে নাটকীয় গতি আসে তারই ফলে

গীতিনাট্যের বহু অবান্তর বিষয় বর্জিত হয়ে নাট্যবিষয় নৃত্যনাট্যে সরলরেখার ঋজুতা লাভ করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের সংখ্যা এই কারণে কমে এসেছে, যেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গান আছে সেগুলি নাট্যবিষয়ের সঙ্গে অনেক নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। একই গানের নানা অংশ নানাজনের কণ্ঠে গীত হওয়ায় সম্পূর্ণ গান একজন গাইলে যে মন্থরতা দেখা দিত তার পরিবর্তে এসেছে গতি। এই জাতীয় নানা কৌশলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে নাট্যগুণ প্রগাঢ় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মূল উপাদানের আন্তরিক বাধা ও নাটকীয় অভাবের ফলেই হোক অথবা রবীন্দ্রনাথ বেশি মনোনিবেশ করতে না পারার জন্যই হোক, এই চেষ্টায় তিনি যে সার্থক হয়েছেন এমন মনে হয় না। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করার সুযোগ পেলে এবং প্রযোজকের দৃষ্টি দিয়ে নৃত্যনাট্যটি দেখার সুযোগ পেলে হয়তো নাটকীয়তার দিকে আরো অগ্রগতি হতো— প্রযোজনার সুযোগ পেলে দুর্বলতা হয়তো আরো তিনি পরিহার করতে পারতেন। তাঁর বিখ্যাত নৃত্যনাট্যগুলিতে যে সার্থকতার শিখর তিনি অর্জন করেছিলেন এখানে তা অর্জিত হয় নি। অথচ চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের পরে তিনি মায়ার খেলার নৃত্যনাট্য রূপান্তরে হাত দিয়েছিলেন, ফলে আঙ্গিকের দিক থেকে ছিলেন অনেক বেশি আত্মপ্রতিষ্ঠ। মনে হয়, নাটকীয়তা অর্জনের প্রধান সর্ত আঙ্গিকের উপর অধিকার নয়। জীবনের যে সমস্যা, নৈতিক যে নির্বাচন নাটককে নাটকীয় করে তোলে, মনে হয় প্রথম জীবনের ভাববাষ্পে রচিত মায়ার খেলার এই মায়াময় নরনারীর জীবনে তার অভাব ছিল বলেই এখানে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি।

গদ্যনাট্য নলিনীতে আত্মত্যাগকারিণী মুমূর্ষু নীরজা নীরদ-নলিনীর মিলনের পথ প্রশস্ত করে বিদায় নেবার সময় বলেছিল—'আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি!' এই কথার প্রতিধ্বনি করে মায়ার খেলা গীতি-নাট্যে শান্তা বলে—

আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে। (৭)

নৃত্যনাট্যে শান্তা বলে—

বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে। (৭)

মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে প্রমদার ব্যর্থতার মধ্যে অমর ও শান্তার মিলন হয়ে

ছিল। নৃত্যনাট্যে শান্তা আত্মত্যাগ করতে চেয়েছে প্রমদার জন্য, প্রমদাকে সে আহ্বান করেছে 'আদরিণী, লহো তব ঠাঁই যেথা তব আসন বিরাজে।' প্রমদা সে আহ্বান স্বীকার করে নি—

কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো—
ভাঙা ডালি ভরো।
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে। (৭)

এই দোলাচলের অবস্থায় অমর নিজেকে ডাক দিয়ে বলেছে, 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি, যা উড়ে যা উড়ে, যারে একাকী' এবং মুক্তিপিপাসু অমরকে শান্তাও বিদায় দিয়েছে। 'দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে যে প্রেম' তার বন্দনা করেছে মায়াকুমারীগণ। গীতিনাট্য শেষ হয়েছিল অমর-শান্তার মিলনে, প্রমদার ব্যর্থতায় এবং মায়াকুমারীগণের মন্তব্যে, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না/শুধু সুখ চলে যায়/এমনি মায়ার ছলনা।' নৃত্যনাট্য শেষ হলো সমবেত পাত্র-পাত্রীর 'আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়,/সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়' এই বৈরাগ্যের গানে, 'তাপস মৃত্যুঞ্জয়ের' আদর্শের উপলব্ধিতে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে একটি ব্যাপাব খুব কৌতূহলের। ভগ্নহৃদয়ের নায়ক কবি চপলা নলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে শেষ পর্যন্ত নীরব প্রেমিক মুরলার কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিল। নলিনী গদ্যনাট্যে নায়ক নীরদের সঙ্গে মিলন হয়েছে নলিনীর, মুরলার রূপান্তর যে নীরজা সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগ করেছে। গীতিনাট্য মায়ার খেলায় রবীন্দ্রনাথ নলিনী গদ্যনাট্যের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ভগ্নহৃদয়ের পরিকল্পনা পুনরায় গ্রহণ করেছেন—ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর মত চপলা প্রমদা এখানে ব্যর্থতার বোঝা বহন করেছে এবং মুরলার মতো নীরব প্রেমিকা শান্তার সঙ্গে নায়ক অমরের মিলন হয়েছে। সমবেদনার এই আন্দোলনে আন্দোলিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্য মায়ার খেলায় এই আন্দোলন থেমে গেছে—শান্তা বা প্রমদা কারোর প্রতিই নাট্যকার এখানে পক্ষপাতিত্ব করেন নি। এই 'খেলা ভাঙার খেলা' ও 'সুখের বাসা ভাঙা'-র নাট্যে প্রমদা বা শান্তা কেউই অমরকে পায় নি, দুইজনেই অমরকে মুক্তি দিয়েছে, দুইজনেই সমানভাবে 'বিচ্ছেদবহ্নি শিখার আলো' সমস্ত জীবন ধরে বিকিরণের দায়িত্ব নিয়েছে। ট্র্যাজেডির সত্য এইভাবে অস্বীকৃত হয়েছে।

প্রথম দিক বহুলাংশ উচ্ছ্বাসে এবং অকারণ তাত্ত্বিক আলোচনায় ভারাক্রান্ত হলেও রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থের 'রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর' প্রবন্ধের

একেবারে শেষভাগে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত গীতিনাট্য মায়ার খেলা থেকে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলায় রূপান্তরের উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। নাট্যপরিণামের রূপান্তর বিষয়ে তাঁর কয়েকটি সমর্থনযোগ্য মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—'পুরাতন মায়ার খেলার শেষ হয়েছিল দীর্ঘশ্বাসসমীরিত অশ্রুজলে-ভিজে-ভিজে হৃদয়বেদনার একটি বড়ো বাতুলে আবহাওয়ায়।' চরিত্রগত ভাবালুতা দূরীকরণের প্রয়োজনে, গানে ভাবের স্থানে রূপ প্রকাশের প্রয়োজনে এবং নৃত্যের তৃতীয় মাত্রার দাবীতে সেই পরিণামের পরিবর্তন হলো। রূপান্তরে তাই 'নাট্যরস শেষ হলো অবসাদে নয়, বৈরাগ্যে নয়, চোখের জলে বা দীর্ঘশ্বাসে নয়, স্বপ্নলোকে বা বাস্তব সংসারেও নয়।' নৃত্যের যোগে, অবাস্তরের বর্জনে, নাট্যগতি অর্জনে এবং ব্যর্থতাজনিত ট্র্যাজিক উপলব্ধির অস্বীকৃতিতে কী বিপুল পরিবর্তন হয়েছে প্রবন্ধকার একটি বাক্যে বলেছেন—'মায়ার খেলার প্রাথমিক রূপ ও রূপান্তর ( প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ) উভয়ই আমরা আলোচনা করে দেখলেম—একটি 'কবিত্ব-কল্পনা ও ভাবুকতার' রঙিন-কুহকে-আচ্ছন্ন মায়াময় ভুবনে, অন্যটি ঊর্ধ্বলোকে আলোকে ও চেতনায় উদ্ভাসিত, অপূর্ব ছন্দে লয়ে বিধৃত, এবং সব-শেষে পরমানন্দে পরিসমাপ্ত।' অবশ্য পূর্বে যে কথা বলেছি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, নানাকারণে 'ঊর্ধ্বলোকে আলোকে ও চেতনায়' আরোহণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি।

### এগার

## নৃত্যনাট্যের প্রেরণা

নৃত্যকলার প্রতি রবীন্দ্রনাথ একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প হিসাবে নৃত্যের প্রতি এই আকর্ষণের জন্য তত নয়, অন্য কোন গূঢ় প্রবর্তনায় যত তিনি জীবনের অন্তিমপর্যায়ে তাঁর নাটকে নৃত্য প্রয়োগে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রবর্তনা এত প্রবল হয়েছিল যে নৃত্যনাট্যের মধ্যে তিনি নৃত্য ও নাট্যের অভেদ করেছিলেন। শারদোৎসব, অচলয়াতন, ফাল্গুনীতে তিনি বালক অভিনেতাদের গানের সঙ্গে নাচতে উৎসাহিত করতেন। শান্তিদেবের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় শারদোৎসবে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ'

ইত্যাদি গানে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত নাচের ভঙ্গিতে কি ভাবে গানের মর্ম প্রকাশ করতে হবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিতেন। শারদোৎসবের মধ্যে এই যে নৃত্যের প্ররোচনা তার মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী নৃত্যনাট্যের সম্ভাবনা দেখেছেন। কেউ মনে করেন সেইদিনই নৃত্যনাট্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল যেদিন বৃদ্ধ কবি বাউলের ভূমিকায় নেচে দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। প্রতিমা দেবীর মতে, 'শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবগুলির মধ্যে নৃত্যের প্রথম আকৃতি দেখি।' শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী অবশ্য বলেছেন, 'নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই উহার প্রাণবস্তু।' (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ১)। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঋতুনাট্যের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাট্যে নৃত্যের প্রথম পদক্ষেপ সম্বন্ধে অধিকাংশই একমত। যবদ্বীপবাসীর নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির নৃত্যান্দোলনের কথা মনে পড়েছিল, সেই কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি—'এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।' প্রকৃতির আত্মপ্রকাশের নিয়মিত আবর্তন, চাঞ্চল্যরহিত সুনিয়মিত আন্দোলনের সঙ্গে নৃত্যের নিয়মিত তালে পদক্ষেপ ও নর্তকের দেহ-আন্দোলনের কোন নিগূঢ় যোগ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন তাই তিনি ঋতুনাট্যের মধ্যে নৃত্যের অতিরিক্ত মাত্রার প্রথম প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

যদিও আমাদের দেশের প্রচলিত ধারা অনুসারে সব রকম গীতিনাট্যে নাচ বা নাচের অভিনয় ছিল অত্যাবশ্যক, যদিও নাচ ছাড়া গীতিনাট্য হতে পারে একথা আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেন ভাবতেই পারতেন না, তথাপি নাটকে নৃত্য ব্যবহার করায় এবং নৃত্যনাট্য রচনার পথে অগ্রসর হওয়ায় জাভা যাত্রার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে যে সব চেয়ে বেশী সাহস দিয়েছিল এ সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাভা যাত্রাকালে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থের 'জাভা যাত্রীর পত্র' অংশের সঙ্গে সুনীতিকুমারের নবরূপে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থের বিবরণের তুলনা করলে দুইজন সহযাত্রীর দৃষ্টির পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। যে শিল্প-দৃষ্টির অভাবে ও অনুদারতায় অন্য ঐতিহ্যের শিল্পকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা যায় না, তার মর্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত করা যায় না, সুনীতিকুমারের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সেই দৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়।

একটি উদাহরণ দিলে দুইজন সহযাত্রী একই নৃত্যদৃশ্য দেখে কেমন বিপরীত মনোভাব পোষণ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পুরুষের পোষাকে 'মেয়েদের দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত নাচ' দেখে সুনীতিকুমারের শুধুমাত্র 'অদ্ভুত ধরনের' লেগেছে। সেই দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—'দেহটা মেয়ের, কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।' কতদূর গভীর সহানুভূতি ও শিল্পদৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাভার ঐতিহ্যগত নৃত্যকে দেখেছিলেন তা জাভাযাত্রীর পত্রের দুইটি অংশ উদ্ধৃত করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এ দেশের উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ।...এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধহয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে।...কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনাবর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।...কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সংগীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত; কিন্তু তার অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা সমানে পরস্পরের আপোষে তৈরি-করা সংকেতমাত্র। এই দুয়ের যোগে কাব্য।... তেমনি এদের গানের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে।' দ্বিতীয় পত্রটি মাত্র দশ দিন পরে প্রতিমা দেবীকে লেখা। এই পত্রের বিবরণ থেকে দেখি কী ভাবে এই জাতীয় নৃত্যে ছন্দে ও সংকেতে দেহ যে ভঙ্গিতে কথা বলে তাই নয়, মঞ্চনির্দেশও নৃত্য হয়ে ওঠে। 'আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদর খানা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা

নাটকে কবির নির্দেশবাক্য—রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হতো, রথের দ্বারা নয়।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে দুইটি ব্যাপার চোখে পড়ে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ জাভার নৃত্যকলাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন তার কারণ এই নৃত্যকলা তাঁর দীর্ঘকালের পোষিত কতকগুলি ধারণাকে সমর্থন করেছে; দ্বিতীয়ত, নাট্যের সঙ্গে নৃত্যের যোগের আন্তরিক যে প্রয়োজন তিনি শারদোৎসবের যুগ থেকে অনুভব করেছিলেন জাভার নৃত্যনাট্যে সেই পরীক্ষার একটি ঐতিহ্যময় সার্থকতা দেখে তিনি স্বভাবতই উৎসাহ বোধ করেছিলেন। সন্দেহ নেই যে পূর্ব থেকে একটি প্রয়োজনবোধে পীড়িত হয়েছিলেন বলেই তিনি যেন যবদ্বীপের নৃত্য দেখে আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করেছিলেন। কী সেই তাড়না যার বশে তিনি নাটকে নৃত্যের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, কী সেই অজানা যার প্রেরণায় যবদ্বীপের অভিজ্ঞতা ভিন্ন বিলম্বে হলেও নৃত্যনাট্যের দিকে তিনি অনিবার্যভাবে ধাবিত হতেন? রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সেই আন্তরিক প্রেরণা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাঁহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানা নাটককে যখন পরবর্তীকালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণ ভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটি করিয়া গদ্য বা পাত্রপাত্রীর উক্তি।...গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সংকীর্ণতর হইতে হইতে শেষ বয়সে একেবারে সংগীতকে আসর ছাড়িয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

'এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবনপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সংগীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়।...ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল, সুরও যেন আর তাহাকে সম্যক প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকুতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে

নূতন নূতন বাহনের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সন্ধানের সঙ্গে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।'

রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ ভাষার দৈন্য যা প্রকাশ করতে পারে না, কাব্যের ছন্দোময় ভাষা তা পারে, দেখেছিলেন সাধারণ গদ্যের ভাষার মধ্যেও কবিতার ব্যঞ্জনা আভাসিত করা যায়, সে যা পারে না তা পারে সংগীতের সুরসনাথ ভাষা সুরময় গান যে জগৎকে উদ্ঘাটিত করতে অক্ষম সেখানে নৃত্যের আদিম আন্দোলন সার্থকতা দিতে পারে। কিন্তু গানের সঙ্গে নৃত্য যোগ হওয়ায় অভিজ্ঞতার আরো একস্তর উন্মোচিত হয় একথা যত সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য গানের জন্য নাচের আবির্ভাব। সংলাপের ভাষার পরিবর্তন হয়েছে—গদ্য থেকে পদ্য, পদ্য থেকে কাব্যময় গদ্য, কাব্যময় গদ্য বা 'গদ্যলিরিক' থেকে শেষ পর্যন্ত গান। গান যখন সংলাপের ভাষা তখন অভিনয়রীতিতেও পরিবর্তন অনিবার্য—নচেৎ সংলাপ ও অভিনয়রীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে বাধ্য। শ্রীশঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নাটকে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক' নামক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে ( 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ) তাই দেখিয়েছেন, 'কথা যখন সংলাপ হয় তখন তার অভিনয়ের রীতি ভিন্ন, কিন্তু গান যখন সংলাপ তখন নৃত্যই তার অভিনয়—নতুবা একটা মূঢ় স্থিতিতে নাটক বিপন্ন হতে পারে।' সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ গানবহুল শারদোৎসব প্রভৃতিতে গানের সঙ্গে বালকদের নাচবার প্ররোচনা দিতেন, সেইজন্যই তিনি সংগীত সংলাপ ও সাধারণ অভিনয়রীতির অন্তর্বিরোধ ঘোচানোর জন্য ফাল্গুনীতে নেচে অভিনয় করেছিলেন এবং সংলাপ ও অভিনয়রীতির পূর্ব দ্বিধা দূর করেছিলেন। এই সমস্ত উদাহরণের ভিত্তিতে উক্ত লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন 'জাভাযাত্রার অভিজ্ঞতা কবিকে আরো কিছু সাহস দিয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাঙ্গীতিক অভিনয়ের এই প্রাথমিক অন্তর্গত প্রেরণাই তাঁকে অবশেষে নৃত্যনাট্যের তীর্থে উপনীত করেছে, যেখানে নাটকের সংলাপই হলো গান, আর গানের অভিনয়ই হলো নাচ।' অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহ প্রবন্ধকার এখানে যে কথা বলেছেন সে কথার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছিলেন এবং দিয়েছিলেন জাভাভ্রমণকালেই। রথীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রটিতে তিনি বলেছেন, 'নাটকে যখন আমরা ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেই সঙ্গে চলা ফেরা হাব ভাব যদি সহজ রকমই রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেটা অসংগত হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।' নাটকে ব্যবহৃত

ছন্দোময় বাক্য বা পদ্য এমন হবে যে আপাতদৃষ্টিতে দর্শক গদ্যের সঙ্গে সেই পদ্যের পার্থক্য বুঝতে পারবে না, এলিয়ট-কথিত পদ্যনাট্যের ভাষার এই আদর্শ মেনে নিলে ( '…the verse rhythm should have its effect upon the hearers without their being conscious of it.'—Poetry and Drama. ) অবশ্য সেই জাতীয় নাটকের ছন্দোময় বাক্যের সঙ্গে সাধারণ অভিনয়নীতির কোন বিরোধ ঘটে না। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ছন্দোময় বাক্য যেখানে প্রচলিত বাক্যালাপের অন্তর্গত স্পন্দকে মেনে নিয়ে ছন্দোময় হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি নাও নয়, কিন্তু যেখানে গানেই সংলাপ সেই ক্ষেত্রে সাধারণ অঙ্গচালনা ও অভিনয়রীতি অসংগত হতে বাধ্য। এই যে অসংগতির কথা রবীন্দ্রনাথ জাভা-ভ্রমণকালে উপলব্ধি করেছিলেন সেই অসংগতি ক্রমান্বয়ে দূর করতে করতে তিনি নৃত্যনাট্যে এসে উপস্থিত হলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস নাট্যমুহূর্তকে ধারণ করতে পারে যে উপযুক্ত ভাষা সেই ভাষার সন্ধানের ইতিহাস। প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি প্রধানত পদ্যে লেখা, পরবর্তী যুগের স্বতন্ত্রতর উপলব্ধি তিনি গদ্যসংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, যে গদ্যসংলাপ কাব্যের ব্যঞ্জনাগুণে অভিষিক্ত। যেখানে সেই গদ্য সার্থক, যেমন ডাকঘরে, সেখানে ভাষা 'গদ্যলিরিক' হয়ে উঠেছে। তারপরের পর্যায়ে প্রধানত গানের উপরেই তিনি তাঁর নাট্যোপলব্ধি প্রকাশের জন্য নির্ভর করতে লাগলেন। গানই হলো সংলাপ, ফলে অভিনয়রীতি হলো নৃত্য। শেষ পর্যায়ে সেই সংগীত ও নৃত্যের উপর নির্ভরতার কৈফিয়ৎ দিতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, 'বাক্যের সৃষ্টির উপরে সংশয় জন্মে গেছে।' কিন্তু এই বাক্‌পতি বাক্যের সৃষ্টির উপরে সংশয়ান্বিত হয়ে নৃত্যনাট্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তা যদি হতো তা হলে যবদ্বীপ-বলির মতো যেখানে 'রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে', রবীন্দ্রনাথও বাণীহীন নৃত্যরচনায় নিযুক্ত হতেন। দ্বীপময় ভারতের নাচের বৈশিষ্ট্য হলো "বাণীর দিকটা বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো করে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া।' যবদ্বীপ বলি বা পূর্ব-এশিয়ার সব কয়টি প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে বিরাট যন্ত্রসংগীত অতি আবশ্যক স্থান গ্রহণ করে আছে। সমস্ত নাচের ভিত্তি এই যন্ত্রসংগীত। এখানকার নাচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্যধারার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে শান্তিদেব বলেছেন, 'গুরুদেবের নৃত্যধারায় এই

ধরনের কোন প্রভাব ছিল না। এখানে যন্ত্রসংগীত কোনদিন প্রাধান্য পায় নি বলেই এর উপরে নাচ গড়ে উঠতে পারে নি। নাচ গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ গানের উপর নির্ভর করে।' যেমন দ্বীপময় ভারতের নৃত্যে, তেমনি ভারতবর্ষের কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যে নাটকীয় বক্তব্য প্রকাশ পেত নৃত্যের মুদ্রার সাহায্যে, ঐতিহ্যস্বীকৃত সংকেত, ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমার সাহায্যে। সুরবদ্ধ সংলাপের স্থান তাতে ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনৃত্যধারায় সুরবদ্ধ সংগীতেরই প্রাধান্য। তাই প্রমথনাথ বলেছেন 'জাভার বাণীহীন নৃত্যের সঙ্গে তিনি বাণী যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভায় যাহা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সংগীতসনাথ নৃত্য-নাটিকায় পরিণত হইয়াছে।' জাভার নৃত্য অবশ্য সব সময় বাণীহীন নয়, কিন্তু যেখানে বাণীসম্বলিত সংগীত থাকে সেখানেও এই দেশের নৃত্য, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মতো, সেই বাণীময় সংগীতের অনুগত নয়। 'জাভা ও বলির নৃত্যগীত' গ্রন্থে শান্তিদেবের বিবরণ পাই—'এদের কোন নাচের ভঙ্গিই হুবহু গানের কথা লক্ষ্য করে এক সঙ্গে চলে না।' সুতরাং বাক্যের সৃষ্টিতে সংশয়ান্বিত হয়ে তিনি নৃত্যনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজে বললেও, মেনে নেওয়া যায় না। সে কথা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী সম্বন্ধে খাটে। যদিও প্রতিমাদেবী কখনও কখনও স্বীকার করেন, যেমন চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে, 'প্রথমেই হলো গুরুদেবের সংগীত যার উপর সমস্ত নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত' কিন্তু তথাপি তিনি অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্যের প্রাথমিকতা দাবী করেছেন, 'নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায় (নৃত্য)।' রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে এই কথা সৃষ্টির ও নৃত্যপরি-কল্পনার ইতিহাসের দিক থেকে সত্য হলেও হতে পারে। 'এগুলো হলো নৃত্যনাট্য, নাচের কথা চিন্তা করে লেখা। নাচের দরুন এই নাটকের গানে বাঁধা ছন্দের দোলার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ অংশেই বাঁধা ছন্দে গানগুলিকে গাইতে হয়। সাধারণ উত্তর-প্রত্যুত্তরের অংশগুলিও এইরূপ বাঁধাছন্দের বাঁধনে পড়ে গেছে। এর মধ্যেও তিনি যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা হলো এই যে, নাটকের পাত্রপাত্রীর সম্পূর্ণ একটি বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, রাগিণী ও তালের গতি তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। বাঁধা ছন্দ হলেও গুরুদেব ছন্দের গতি ভাবের অনুকূল করার চেষ্টা করেছেন।' উদ্ধৃত অংশটির প্রথম দিকে যদিও শান্তিদেব বলার চেষ্টা করেছেন নাচের প্রাথমিক শর্তের কথা চিন্তা করে গানগুলি, কিন্তু শেষাংশে তিনি স্বীকার-

করেছেন 'নৃত্যের ছন্দের গতি ভাবের অনুকূল' করতে হয়েছে, এবং ভাব যেহেতু প্রধানত কথায় বিধৃত হয়, সেই কারণে নৃত্যের ছন্দের গতিকে কথার অনুকূল হতে হয়েছে। প্রতিমাদেবী নৃত্যনাট্যগুলির প্রথম নৃত্যপরিকল্পনায় নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বলে যেহেতু সেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন তাই তাঁর চোখে নৃত্যনাট্যগুলিতে নৃত্যের প্রাধান্য বেশি করে ধরা পড়েছে। কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলির সম্পূর্ণ বর্তমানে রূপের দিকে তাকালে নৃত্যের প্রাথমিকতার এই দাবী স্বীকার করা যায় না। এ কথা ঠিক যে ভাষা ও সুরের সঙ্গে নৃত্যের মাত্রা যুক্ত হলে নাটক অন্যে স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত যেমন কথা-নির্ভর, রবীন্দ্রনৃত্যও তেমনি। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলি কথানির্ভর বলেই নৃত্যাভিনয়হীন গীতিনাট্য হিসাবেও সেগুলিকে উপভোগ করা যায়। যাকে অর্থবান কথায় পুরাপুরি ধরা যায় না, রূপবান চিত্রকলায় যা পুরাপুরি বাঁধা পড়ে না, নৃত্যনাট্যে তাই প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য অর্থবান ও সুরপ্রাণ কথার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সংগীতই মূল ভিত্তি বলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নৃত্যপরিকল্পনায় নানা জাতীয় নাচ, মণিপুরী কথাকলি কথক ক্যাণ্ডীয় নাচের সংমিশ্রণ করা যায় যতক্ষণ নৃত্যনাট্যের কথা ও সুরের যে ভাবরস তার প্রকাশ কোথাও বাধাগ্রস্ত না হয়। কথার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব প্রধানত বিধৃত বলে রবীন্দ্রসংগীত যেমন রাগরাগিণীর মিশ্রণ, তার সঙ্গে লোকসংগীত, দক্ষিণদেশীয়, এমন কি পাশ্চাত্য সংগীতের সমন্বয় ঘটিয়েছে, তেমনি কথায়-বিধৃত ভাবরস মূল ভিত্তি বলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়সূত্র গড়ে ওঠে। নৃত্যই প্রাথমিক হলে বিচিত্র নৃত্যপদ্ধতির সমন্বয় ঘটাতে গেলে তাদের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকত। শান্তিদেবও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, 'তিনি তাঁর রচনাকে মুখ্য বলে ধরেছিলেন বলেই নাচের অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারা এত সহজে স্থান করে নিতে পেরেছে।' রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য তাঁর গীতাভিনয়েরই অঙ্গ। আগে সংগীত, সেই সংগীতেরই অনুযাত্র নৃত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, নরনারীর ভাবপ্রকাশের পরম অভিব্যক্তি সংগীত, সেই সংগীত আবার ভাষারই আকুলতা; নৃত্য সেই সংগীতকে নর্তকের দেহরেখায় রূপায়িত করেছে। সুরময় কথার এই প্রাধান্য, জাভার নৃত্যনাট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের প্রধান পার্থক্য।

জাভাযাত্রার অভিজ্ঞতার সঙ্গে নৃত্যনাট্যগুলির সম্পর্কের বিষয়ে আরো একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ ও শেষ যুগের গানের

পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে সকল ব্যাখ্যাতাই বলেছেন, প্রথম যুগের রবীন্দ্র সংগীত ইমোশনাল এবং দ্বিতীয় যুগের ঈসথেটিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কথাই বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, প্রথম যুগে তিনি গান লিখেছিলেন ভাব বাৎলাবার জন্য, দ্বিতীয় যুগে গান লিখেছিলেন রূপ ফোটাবার জন্য। জাভায় যে নৃত্যনাট্য তিনি দেখেছিলেন তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যুগের গানের উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য ঘটেছিল ঘটনাচক্রে এবং তার সুদূরপ্রসারী সুফল ফলেছিল। তিনি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের নিকট একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'এদের সংগীতকে বলা যায় স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য।' সমসাময়িককালে গানে তিনি রূপ ফোটাবার কাজে ব্রতী ছিলেন, জাভার নৃত্যনাট্য দেখে তাঁর মনে হলো এ যেন 'রূপনাট্য'। নিজের গানের এই পর্যায়ের ঈসথেটিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে জাভার নৃত্যনাট্যের রূপাত্মক উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য হওয়ায়, সংগীতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রূপময় রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যগুলি রচনায় জাভার নৃত্যনাট্যের প্রভাব এত সহজে এবং সংগতির সঙ্গে কার্যকর হতে পেরেছে। গানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের উদ্দেশ্যের বৈষম্য থাকলে এই গীতময়-রূপময় নৃত্যনাট্যগুলির অবিশ্বাস্য সার্থকতা অর্জিত হত কিনা বলা কঠিন।

জাভার নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে লিখিত তপতী নাটকের যখন অভিনয় হলো তখন বিপাশার ভূমিকায় অভিনয়-কারিণী তার সমস্ত গান নাচের ভঙ্গিতে অভিনয় করে গেয়েছিলেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র ও পুত্রবধূসহ পুনরায় বিদেশযাত্রা করলেন ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে তখন এই বিষয়ে তিনি নূতনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেলেন। ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রতিষ্ঠিত ডার্টিংটন হল বিদ্যালয়ে তাঁরা নৃত্যশিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। এখান থেকে মার্কিন দেশে গেলে কবির সমক্ষে প্রখ্যাত নর্তকী রুথ সেণ্ট ডেনিস কবির কয়েকটি কবিতাকে ভাবনৃত্যে রূপায়িত করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীমতী ঠাকুরের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঝুলন, দুঃসময় ও শিশুতীর্থ কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের পরীক্ষা করেন। নৃত্যাভিনয়ের জন্য অবশ্য শিশুতীর্থ গদ্য কবিতাকে কথিকাকারে পরিবর্তিত করা হয়। এই পরীক্ষার সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহিত হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে শ্রীমতী ঠাকুর কর্তৃক পূজারিণী কবিতার মূক-নৃত্যাভিনয়ের চেষ্টা দেখেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অল্প সময়ে নটীর পূজা নাটকটি লিখে দেন এবং সেই

নাটকে নটী শ্রীমতীর আত্মনিবেদন-নৃত্যটিকে নাটকের চূড়ান্ত ঘটনার মর্যাদা দান করেন। এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন শাপমোচনের যুগে। শাপমোচনেই প্রথম চেষ্টা হলো 'নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে।' 'এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরণ করে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূক-অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। সব জায়গায় প্রকৃত নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি রক্ষা করতে না পারলেও সংগীত ও মূক অভিনয় মিলিয়ে জিনিসটি মনোরম হয়েছিল' (নৃত্য)। অর্থাৎ শাপমোচন দাঁড়িয়ে আছে আবৃত্তির সঙ্গে বা বিচ্ছিন্ন গানের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ও প্রকৃত নৃত্যনাট্যের মাঝখানে। ইতিমধ্যে প্রতিমা দেবী ডার্টিংটন হল বিদ্যালয়ের নৃত্যপরিচালকের ব্যালে নৃত্য পরিচালনা, প্রতিদিনের কাজ ও ব্যালে রচনার করণকৌশল অনুশীলন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই বিষয়ে প্রতিমাদেবীর সাক্ষ্য নৃত্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যায়। 'ডেভনশায়ার ডার্টিংটন স্কুলে জার্মেনির সুপ্রসিদ্ধ নর্তক লাবাসের শিষ্য মিস্টার ইয়স্ একটি নৃত্যশালা খুলেছিলেন। তখন একটি নূতন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনার কাজ তাঁর স্টুডিয়োতে আরম্ভ হয়েছিল। মিস্টার ইয়সের উদারতাগুণে তার কার্যপ্রণালী দেখবার সুযোগ পেলুম। ···ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডনাচে মিলে ক্রমে ক্রমে যে-করে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা পরিণত হতে পারে তারই নূতন পদ্ধতি চোখে পড়তে লাগল। তারপরে যখন দেশে ফিরে শুনলুম দিল্লীতে শাপমোচন অভিনয় হবার কথা হচ্ছে তখন ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় একটি নূতন নৃত্যনাট্যের সংগঠনের কথা মনে এল। ···স্থির হলো, আখ্যানের জন্য নেওয়া হবে চিত্রাঙ্গদার কবিতা।' আমরা নৃত্যনাট্যের যুগে এসে পড়লাম। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে ১৯৩৩ সালের জুন মাসে দার্জিলিঙে বিদায়অভিশাপ নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী ঠাকুর নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। এই সময় তাসের দেশ নাটকে কথাবার্তা সাধারণভাবে অভিনীত হলেও মধ্যবর্তী গানগুলি নাচে অভিনীত হতো। ইতিমধ্যে উদয়শঙ্করের আবির্ভাব ও গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের ফলে সাধারণ সমাজে নৃত্যের অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এই দীর্ঘ প্রস্তুতির পর নৃত্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করলেন।

নৃত্যনাট্যগুলির রূপান্তরের আলোচনায় প্রধান অসুবিধা সুরের উপকরণ। ভাবপ্রকাশের জন্য সৃষ্টির মুহূর্তে প্রথম কী এসেছে—নৃত্যের ভঙ্গিমা, না সুরের লহরী, না উপযুক্ত কথা তা বলা কঠিন। তবে সৃষ্ট যে নৃত্যনাট্য আমরা পাই

তাতে নৃত্যপরিকল্পক ভেদে নৃত্যপরিকল্পনার পার্থক্য হতে পারে, নর্তক-নর্তকী যে জাতীয় নাচে পারদর্শী সে রীতির নৃত্যপদ্ধতি নৃত্যনাট্যে গৃহীত হতে পারে অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৃত্যপরিকল্পনার তারতম্য হতে পারে। কিন্তু এই নৃত্যনাট্যগুলির কথা ও সুর অপরিবর্তনীয়। কথার মধ্যেই ভাবের প্রধান প্রকাশ, সুর সেই কথার অনুযাত্র হিসাবে কথায় নিহিত ভাবকে প্রকাশিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু তাই বলে সুর সম্পূর্ণ কথার অধীন নয়; পূর্বরূপ থেকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে দেখি অনেক সময় সুরের প্রেরণায় ও প্রয়োজনে পূর্বরূপের বাণীর পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং সুরের আলোচনা ব্যতীত নৃত্যনাট্যগুলির রূপান্তরের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাল্মীকি-প্রতিভা সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।" মুদ্রিত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে এই সুরের অভাব অনুভূত হয় এবং সুরের মূল্যবান উপকরণের অনুপস্থিতিতে এই জাতীয় রচনার মূল্য বিচার প্রায় অসম্ভব হয়। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছিলেন, 'এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে।' কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। পরিশোধের ভূমিকায় একই জাতীয় মন্তব্য পাই—'ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।' এই যে অসুবিধা, স্বরলিপির জ্ঞান থাকলেও তা পুরোপুরি দূর হয় না। কারণ, শান্তিদেবের বিবৃতি থেকে জানা যায়,—'এ সব নাটকের গানগুলি বিভিন্ন স্বরলিপিকার বিভিন্ন কালে লিখে গেছেন, পুস্তকাকারে ছাপাও হয়েছে। কিন্তু অভিনয়কালে কোনদিনই তার সব গান স্বরলিপির নিয়মে গাওয়া হয় নি। বহু গান অভিনয়ের মতো করেই গাইতে হয়েছে।' স্বরলিপি অনুসরণে গান গাইলে অভিনয় কখনও সাফল্যমণ্ডিত হবে না, শান্তিদেবের এই উক্তি অতিশয়োক্তি হলেও, মূল কথাটা এই যে, অভিনয়ের ভাব পরিস্ফুটনের জন্য স্বরলিপির নির্দেশ লঙ্ঘন অমার্জনীয় মনে করা হতো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাত্র স্বরলিপিতে বদ্ধ সুরের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও কোন্ সুরগত কারণে কোথায় কোন্ বাণীর রূপান্তর হয়েছে সে কথা সব সময় ধরা যাবে না, তার জন্য প্রয়োজন নৃত্যনাট্য-গুলির উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়।

গীতাঞ্জলির কোন কোন কবিতার ছন্দ নির্ণয়ে অসুবিধা বোধ করে

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে রবীন্দ্রনাথ যে জবাব দেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে। অতএব যে-পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।' নৃত্যনাট্যগুলিতে ছন্দরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গানের সুরের উপরে। গানের সুর ব্যতিরেকে যে অপরিহার্য শ্রীহীন বৈধব্য তা সত্ত্বেও নৃত্যনাট্যের কথা পাঠ করলে মুক্তক ছন্দের অনুভূতি লাভ করা যায়। অবশ্য এই ছন্দোহীনতার মধ্যে যে মুক্তক ছন্দের আভাস তার জন্য দায়ী আমাদের মনে বারংবার গানগুলি শোনার ফলে যে সুরের স্মৃতি থাকে সেই স্মৃতি। গানের স্মৃতি যেমন গীতাঞ্জলির ঐ জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দ আবিষ্কারে সাহায্য করে, তেমনি গানের সুরের স্মৃতি নৃত্যনাট্যগুলির সুরসঙ্গহীন পঙ্গুতার মধ্যে মুক্তক ছন্দের স্থিতিস্থাপক বন্ধের আভাস দেয়। এই সমস্ত কারণে সুরজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত নৃত্যনাট্যগুলির রূপান্তর-আলোচনায় সুবিচার করা সম্ভব নয়।

## বারো

## নৃত্যনাট্যে রূপান্তর

### (ক) চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য রচনার চল্লিশ বৎসরেরও অধিককালের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ তাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করলেন। ডার্টিংটন হলে ব্যালে-নৃত্যানুশীলনের পরে কী ভাবে চিত্রাঙ্গদার উপাখ্যান অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা হয় সে কথা প্রতিমাদেবীর নৃত্য গ্রন্থ থেকে পূর্বেই বলেছি। চিত্রাঙ্গদা নির্বাচনের বিশেষ কারণও তিনি বলেছেন, 'কেননা, এই কবিতার সাংগীতিক আবেগ নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী।…প্রথমেই হল, গুরুদেবের সংগীত যার উপর সমস্ত নৃত্যনাট্য প্রতিষ্ঠিত। চিত্রাঙ্গদার এই নূতন রূপ তারই সংগীতকে অবলম্বন করে বিকশিত। কবিতার চিত্রাঙ্গদা সংগীতের মধ্য দিয়ে বেশ পরিবর্তন করেছে মাত্র…।' কিন্তু এই রূপান্তর শুধু বেশপরিবর্তন নয়, কুরূপা চিত্রাঙ্গদার সুরূপা চিত্রাঙ্গদায় পরিবর্তনের মতোই এই পরিবর্তন যেন

জন্মান্তর। নৃত্যনাট্যের মহড়া শুরু হবার পরে মহড়ায় যোগদান করে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লেখেন, 'সমস্ত জিনিসটা বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ নাটকটি লিরিকালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।' যেখানে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য লিরিকাল, সেখানে নৃত্যনাট্য ড্রামাটিক—এই পরিবর্তন মৌলিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন। 'সুঠাম' হবার প্রয়োজনে মূল রচনার অনেক অসংগতি এবং অপ্রয়োজনীয়তা অপনোদিত হয়েছে নৃত্যনাট্যে। গীতিকবিতা-সুলভ যে ভাববিস্তার নাট্যকাব্যে প্রশ্রয় পেয়েছে, নৃত্যনাট্যে ড্রামাটিক দ্রুততা এবং অব্যর্থতা অর্জন করতে যেয়ে সেই বিস্তার-প্রবণতা পরিত্যক্ত। যেখানে প্রজাবৎসলা চিত্রাঙ্গদার কল্পনা অর্জুন নাট্যকাব্যে দীর্ঘ পরিসরে করেছিল—

> সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার
> বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
> কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
> মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী—
> বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া। (৯)

নৃত্যনাট্য সেখানে সুরের সহযোগে একটি মাত্র বাক্যে সেই কল্পনাকে সহজেই রূপায়িত করে—'শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী'। উপমার প্রতি আদর ধীর-বিস্তার গীতিকবিতা এবং আখ্যানকবিতায় সম্ভব হতে পারে, কিন্তু নাটকে যেখানে ঘটনা এবং আবেগের দ্রুত গতি সেখানে সম্ভব হয় না। সেই কারণে মিশ্র উপমার যে প্রাদুর্ভাব নাটকে দেখা যায়, গীতিকাব্য ও আখ্যানকাব্যে তা দেখা যায় না। বর্ণনামূলক কাব্যে কাহিনীর ঘটনা অতীতে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হয় কিন্তু যে রচনা ড্রামাটিক সেখানে ঘটনাগুলি বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ কালের দিকে ধাবিত হয়। বর্ণনামূলক কাব্যে যা ঘটে গেছে তার রূপায়ণ, নাটকে যা ঘটছে তারই রূপায়ণ করা হয়। নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তুলনা করলে সেই কালগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসন্তের 'মোহিনী মায়ার' কথা যা নাট্যকাব্যে বর্ণিত হয়েছে, নৃত্যনাট্যে তা নৃত্য ও গীতের উচ্ছলতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। শিকারকালে নিজের প্রেমনিবেদনের যে ব্যর্থতার অতীতকাহিনী চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে নিজের মুখে বলছে, নৃত্যনাট্যে সেই প্রত্যাখ্যান দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত। নাট্যকাব্যে যা কিছু অতীতের বিবরণ হিসাবে পেয়েছিলাম, তার আত্মনিবেদনের আগ্রহ, নারীসাজে সজ্জিত হওয়া ('পরিণাম রক্তাম্বর, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কাঞ্চী'), অর্জুনের প্রত্যাখ্যান ('ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে।')

সেই সব এখানে মঞ্চে ঘটনারূপে উপস্থাপিত। তার নারীত্বের আত্মপ্রকাশের যে বিবরণ চিত্রাঙ্গদা দিয়েছিল নাট্যকাব্যে মদনের কাছে এখানে নৃত্যনাট্যে সেই আত্মপ্রকাশ দর্শকের সামনে ঘটলো—'ওরে ঝড় নেমে আয়' এই আত্ম-উদ্দীপনার গানে অতীতকে সে বিসর্জন দিল, 'বঁধু, কোন আলো লাগল চোখে' গানে তার নারীত্বের 'লজ্জিত স্মিতমুখ' প্রকাশ পেল। প্রেমোন্মাদনায় মত্ত অর্জুনের অবস্থার বর্ণনা পূর্বরূপে পরোক্ষে পেয়েছিলাম চিত্রাঙ্গদার ভাষণে—

সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো······উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া ···(৩)

নৃত্যনাট্যে অর্জুনের সেই অবস্থা দেখি তার নৃত্যে, সেই অবস্থা জানি প্রত্যক্ষভাবে অর্জুনের নিজের মুখের কথায়—

এ কী তৃষ্ণা এ কী দাহ।
এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে
ঘেরিছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া। (৩)

নাট্যকাব্যের ষষ্ঠ দৃশ্যে যা ছিল অর্জুনের ভ্রাতৃবৃন্দসহ অতীত মৃগয়ার স্মৃতিরোমন্থন তা এখানে চিত্রাঙ্গদার বর্তমান শিকারের আয়োজনে রূপান্তরিত।

নাট্যকাব্য
···অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া······
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয় ; ঝর ঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেন পঙ্ক পরে, দিয়ে যেত
আপন গৃহের সন্ধান। (৬)

নৃত্যনাট্য

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর কলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে পায় না ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক 'পরে
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান। (১)

এই তুলনামূলক দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদাকে লিরিকাল নয় ড্রামাটিক বলেছিলেন। গঠনের মধ্যে এই যে ড্রামাটিক গুণ এনেছেন, সংগীতের স্থর ও লয়ে, শিক্ষিত অঙ্গের সঞ্চালনে ভাব মূর্তি লাভ করায় সেই গুণ আরো প্রগাঢ়ভাবে নাটকীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যকাব্যের এগারোটি দৃশ্য সংক্ষিপ্তি ও বাহুল্যবর্জিত দ্রুততা অর্জনের ফলে নৃত্যনাট্যে ছয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

নাট্যকাব্যে স্বরূপা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন আগে দেখেছে, নিজের মধ্যে রূপলাবণ্যের এই অবিশ্বাস্য আবির্ভাব দেখে চিত্রাঙ্গদার বিস্ময়ের বর্ণনা পাই পরে। কিন্তু নৃত্যনাট্যে কালক্রম বিপরীত। নাট্যকাব্যের অনুরূপ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে নিজেকে নিয়ে বিস্ময়মুগ্ধতা প্রকাশ করেছে, কথার মধ্যে যে সামান্য পরিবর্তন পাই তা ঘটেছে নৃত্যের প্রয়োজনে গানের স্থরে বাঁধা ছন্দ ব্যবহারের দায়ে। 'এ কে এল মোর দেহে পূর্ব-ইতিহাসহারা', চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে, 'আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল'; নাট্যকাব্যে যেখানে সে বলে—

মীনকেতু,
কোন মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত। (৩)

সেখানে নৃত্যনাট্যে নিম্নোদ্ধৃত রূপান্তর পাই—

মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি।

এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত। ক্ষণিক যৌবন-বন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে। (৩)

নৃত্যনাট্যের এই অংশটি সুরহীন আবৃত্তির জন্য লিখিত এবং আবৃত্তির সঙ্গে এইস্থানে নৃত্যে অভিনয় হয়। 'কী অভিসম্পাত!' কথায় যে আবৃত্তিকালে ঝোঁক পড়ে, নর্তকীর পদক্ষেপের আঘাত সেই ঝোঁকের বেদনা ও উন্মাদনাকে অপরূপ মাধুর্য-যাতনা দেয়।

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপ হুতাশনে
ঘিরেছে আমারে, দগ্ধ করে
মারি। (৩)

এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে নৃত্যনাট্যে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' গান ও তার অনুযাত্র নৃত্যের চরম উন্মাদনায়। নাট্যকাব্যে অর্জুন সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে বিস্মিত হয়ে নিজেকে বলেছিল, 'কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য কিংবা মায়া?' সেই উচ্চারিত বিস্ময় নৃত্যনাট্যে সুর ও নৃত্যের দাবিতে হয়েছে—

কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া। (৩)

এই ভাষা এবং সুর শোনা মাত্র আমাদের মনে পড়ে যায় মায়ার খেলার কথা—

একি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া। (৭)

সুর ও নৃত্যের প্রয়োজনে বাগ্‌বিন্যাসের রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

নাট্যকাব্য

কুৎসিত কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার—এমন নিবিড়কৃষ্ণ তারা···(৯)

নৃত্যনাট্য

ছি ছি কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার
হেন উজ্জ্বল কজ্জল আঁখিতারা। (৪)

সুরের স্মৃতি মনে রেখে মুক্তক ছন্দের কবিতার মতো নৃত্যনাট্যের উদ্ধৃতি অংশটি পাঠ করলে 'ছি ছি' অব্যয়ের ধিক্কারের মধ্যে, 'উজ্জ্বল কজ্জল' এই নবাগত শব্দদ্বয়ের যুক্তাক্ষরের মধ্যে সংগীতের দ্রুত লয়, নর্তকীর নূপুরভূষিত পায়ের

তালের আঘাত-শব্দ যেন শুনতে পাব। তখই বোঝা যাবে নৃত্যের প্রয়োজনে, এবং নৃত্যের উপযুক্ত সংগীতের সুরের দাবীতে কথার এই পরিবর্তন। দুই রূপে চিত্রাঙ্গদার সর্বশেষ উক্তিটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

নাট্যকাব্য

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।......
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে **মাথায়,** সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে···যদি **অনুমতি** কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়···
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা
রাজেন্দ্রনন্দিনী। (১১)

নৃত্যনাট্য

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে **ঊর্ধ্বে** সে নহি নহি
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে **সম্পদে**.
**সম্মতি** দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী। (৬)

নাট্যকাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুর যোজনা করায় কথার পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছে নৃত্যনাট্যে—সুরের ও নৃত্যের তালের প্রয়োজনে বারংবার ব্যবহৃত 'নহি'-র সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে ; 'নহি নহি'-র পৌনঃপুন্য ও রাখা-ধাতুর বারংবার ব্যবহারের ফলে মূলের মিলের অভাব নৃত্যনাট্যের ভাষান্তরে অনুভূত হয় না।

আর লক্ষণীয় সুরের প্রয়োজনে যুক্তাক্ষর সমন্বিত নূতন শব্দের আগমন অথবা মূলের অযুক্তাক্ষর শব্দের পরিবর্তে সমার্থক যুক্তাক্ষর-সমন্বিত শব্দের ব্যবহার। সুর যেমন যুগ্মধ্বনিকে শোষণ করেছে, তেমনি কথার যুগ্মধ্বনি সুরকে একপ্রকার মহিমা দিয়েছে।

এই গঠনগত ও ভাষাগত রূপান্তরের ফলে নাট্যকাব্যে নায়িকার যে অন্তর্চিন্তা ও মানসিক অভিক্ষেপ ছিল তা আরো চমৎকার অভিব্যক্তি পেয়েছে নৃত্যনাট্যে। চিত্রাঙ্গদার দৈহিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুল মানসিক রূপান্তর তার পূর্ণ প্রকাশ যেন নাট্যকাব্যে হয় নি, নৃত্যনাট্যে সেই মনোভাব পরিবর্তনের পূর্ণতর প্রকাশ হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নাট্যকাব্যে যে কামের তাপ ছিল, পরিণত বার্ধক্যে রূপান্তর সাধনের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক নৃত্যনাট্যে কামের সেই উত্তাপ অনুপস্থিত। রভসলালসায় অর্জুনের দৃষ্টি যখন দশ অঙ্গুলির মতো চিত্রাঙ্গদার নিদ্রালস তনু স্পর্শ করেছিল, যখন দুই বাহু চিত্রাঙ্গদা বাড়িয়ে দিয়েছিল মিথ্যা শরমসংকোচ ত্যাগ করে, অসহ্য পুলকে যখন স্বর্গমর্ত্য দেশকাল সুখদুঃখ জীবনমরণ বিস্মৃত হয়েছিল তখনকার বর্ণনায় যে কামের তীব্র তাপ তা নৃত্যনাট্যে নেই। অতীত ঘটনার স্মৃতিরোমন্থনকালে যে কথা বলা যায়, প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে তার রূপায়ণ করতে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বলে বোধহয় এই কামতপ্ত অবস্থার উপস্থাপনা করা হয় নি।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ সুঠাম দ্রুততা তথা ড্রামাটিক গুণের সন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ দিয়েছেন তা পরীক্ষামূলক। ফলে নৃত্যনাট্যের অনেক সমস্যার সমাধান তিনি করে উঠতে পারেন নি। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের যে পরীক্ষা করেছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি। সেই পরীক্ষানিরীক্ষার কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেও। চিত্রাঙ্গদায় সমস্ত সংলাপ, পাত্রপাত্রীর ভাবপ্রকাশের বাণী এখনো সুরের দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, কিছু কিছু অংশ রয়ে গেছে যেখানে সুরহীন আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শান্তিদেব বলেন, 'আবৃত্তির ছন্দ ও গানের ছন্দ যে এক নিয়মে চলে না তা সকলেই জানেন, কিন্তু আবৃত্তির ছন্দে অভিনয় করা যে ভালো নাচিয়েদের পক্ষে সম্ভব এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।' গানের মতোই কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নাচা যায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সুরময় গানের সঙ্গে নাচ হতে

হতে হঠাৎ সুরহীন বাণীর সঙ্গে নাচ হলে, সুরস্রোতের পর সুরাভাবে যেন একটি স্তর-পরিবর্তনের অনুভূতি হয়। এই সুরহীন সংলাপগুলির কথা প্রতিমাদেবীও উল্লেখ করেছেন, 'চিত্রাঙ্গদার আর একটি বিশেষ জিনিস হলো ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকচিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হলো তাদের কাজ; এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা।' কবিতাগুলির সমর্থনে প্রতিমাদেবীর এই বক্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, প্রথমত, এই কবিতাগুলির ছন্দ যেহেতু দেহের নৃত্য-লীলাকে বাঁচিয়ে রাখে সেজন্য দর্শকচিত্ত গান থেকে বিশ্রাম পেলেও নাচ থেকে বিশ্রাম পায় না; দ্বিতীয়ত, দর্শকচিত্তকে গান থেকে বিশ্রাম দেবার জন্য, মূল ঘটনার সূত্র ধরাবার জন্য এবং পরবর্তী নৃত্যের ভূমিকা প্রস্তুত করার জন্য যখন এই জাতীয় আবৃত্তির প্রয়োজন চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে দেখা যায় না, তখন বোঝা যায় এই কবিতাগুলির কোনো অনিবার্য শিল্পগত প্রয়োজন ছিল না। একদিকে কবিতা বা নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়, ও অন্যদিকে শ্যামা-চণ্ডালিকার চূড়ান্ত সার্থকতার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা দণ্ডায়মান বলে পূর্ববর্তী পর্যায়ের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের পরীক্ষার ইতিহাস এই সুরহীন আবৃত্তিগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। এই অংশগুলি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঈপ্সিত নাট্যীয় দ্রুততা আরো একটি কারণে ব্যাহত হয়েছে। এই ব্যাঘাতের নেপথ্যকারণ শান্তিদেবের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে গান জুড়েছেন। সাজবদলের জন্য সময় দরকার, তখনও গান বসিয়েছেন। তাছাড়া চিত্রাঙ্গদায় এমন কতকগুলি গানের সঙ্গে নাচ আছে, যেগুলি বহু পূর্ব থেকেই শান্তিনিকেতনে ভালো নাচ বলে পরিচিত ছিল। যেমন 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' রূপান্তরিত হয়ে চিত্রাঙ্গদায় হয়েছে 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'। কেবলমাত্র ভালো নাচ বলে চিত্রাঙ্গদায় যখন সেগুলি রাখার প্রস্তাব হয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেন নি, শুধু ভাবসাম্যের প্রয়োজনে যেখানে দরকার কথা বদলে দিয়েছেন। কখনও কখনও কথার বদল না করে গানটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মুদ্রিত পুস্তকে গানের মাথায় সে কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদায় এই জাতীয় কয়েকটি গান আছে।

চণ্ডালিকা ও শ্যামায় এই জাতীয় বাহ্যিক প্রয়োজন নৃত্যনাট্যগুলির নাট্যোদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। এই বাহ্যিক প্রয়োজনের বশে এবং নৃত্যনাট্যের পরীক্ষায় এখনো সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ না করায় দেখি চিত্রাঙ্গদায় সুরময় সংগীত-সংলাপের তুলনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গান, যেগুলি নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া যায়, এমন গানের সংখ্যা বেশী। এতো বেশী যে, মনে হয় গানের সুরে নাটকীয় সংলাপ রচনা যে সম্ভব এই কথা তিনি যে বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার যুগে জেনে গিয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা যেন চিত্রাঙ্গদায় ব্যবহার করতে রবীন্দ্রনাথ ভুলে গেছেন। চিত্রাঙ্গদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের সংখ্যা এত বেশী যে, মায়ার খেলা গীতিনাট্য সম্বন্ধে যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—নাট্যের সূত্রে গানের মালা—সেই কথা চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধেও অনেকাংশে খাটে। ফলে মায়ার খেলায় যেমন নাট্যগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ঐ পরিমাণে না হলেও চিত্রাঙ্গদাতেও নাট্যগুণ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## (খ) চণ্ডালিকা।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশ, যেখানে অস্পৃশ্যা প্রকৃতি ফুলওয়ালি, দইওয়ালা ও চুড়িবিক্রেতার দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তার কোন বীজ চণ্ডালিকার গদ্যনাট্যরূপে ছিল না। এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছরের অধিককালের ব্যবধানে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক থেকে রূপান্তরিত করে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের তৃতীয় দৃশ্যে রঘুর দুহিতা প্রবেশ করলে প্রথম পথিক পান্থজনকে সাবধান করে দিয়েছে—

পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা। (৩)

সে বলেছে, 'ছুঁসনে ছুঁসনে মোরে—', দ্বিতীয় পথিক বলেছে, 'সরে যা অশুচি।' জনৈকা বৃদ্ধা তাকে অস্পৃশ্যা না জেনে তাকে করুণা করলে পথিকগণ বৃদ্ধাকে বলেছে—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান নাকি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে! (৩)

বৃদ্ধাও তখন 'ছি ছি ছি কি ঘৃণা' বলে প্রস্থান করেছে। চণ্ডালিকা

নৃত্যনাট্যে এরই রূপান্তর পাই যখন ফুলওয়ালির দল তাকে ঘৃণা করে চলে যায়, যখন মেয়ের দল দইওয়ালা চুড়িওয়ালাকে সাবধান করে বলে—

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানো না কি। (১)

এই নিকট-সাদৃশ্যের ফলেও যদি একটি অপরটির রূপান্তর একথা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে স্মরণ করানো যেতে পারে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসীর উপরে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, চণ্ডালিকায় আনন্দকে যে মেয়ে ভালোবেসেছে তারও নাম প্রকৃতি। সন্ন্যাসীর কাছে সসংকোচে রঘুর দুহিতা নিজের পরিচয় দিয়েছিল 'অনার্যা অশুচি আমি' বলে এবং সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল অনার্যা অশুচিই সংসারের ধূলি শুচি করেছে; চণ্ডালিকায় প্রকৃতি পিপাসার্ত আনন্দকে বলেছিল 'আমি চণ্ডালের কন্যা, মোর কূপের বারি অশুচি', এবং আনন্দ সেই জল তীর্থবারি বলে পান করেছিল। কোন কোন বাক্যাংশগত সাদৃশ্যও মনে করিয়ে দেয় চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য রচনাকালে কবির মনে প্রকৃতির প্রতিশোধের কথা বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-সাধনা যখন শুষ্ক তখন তার আন্তরিক অবস্থা বাহিরে প্রতিফলিত।

মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা। (২)

এই অবস্থায় রঘুর বালিকার সঙ্গে পথপার্শ্বে দেখা হওয়ায় সন্ন্যাসীর শূন্য জীবন পূর্ণ হয়েছিল। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির জীবনের শুষ্কতা বিম্বিত হয়েছে দগ্ধ তপ্ত বহিঃপৃথিবীতে।

সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলাম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে…(২)

এমন সময় 'সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার' এবং তার 'দগ্ধ কাননের' জীবন তাই বাঁচবার অর্থ খুঁজে পেল। এই সব কারণে বলা যায় চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশ প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের ভিত্তিতে মোটের উপর লিখিত।

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য প্রকাশিত হয়। নৃত্যনাট্যে

তাকে রূপান্তরিত করা হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ জলপাত্র বলে একটি কবিতা লেখেন, বর্তমানে ঐ কবিতাটি পরিশেষ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটিতেও চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় প্রকৃতি মাকে বলেছে কি করে আনন্দের আগমনে ও আচরণে তার জীবনধারা পরিবর্তিত হলো, তার অস্পৃশ্যতার গ্লানি ঘুচে গেল সেই অতীতকাহিনী। নৃত্যনাট্যে সেই দৃশ্য নায়িকার উক্তির মাধ্যমে পরোক্ষবর্ণিত না হয়ে, রঙ্গমঞ্চে পৃথকভাবে উপস্থিত হয়েছে। জলপাত্র কবিতাটির বিষয়বস্তুও সেই একই ঘটনা। 'মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে তীব্র দ্বিপ্রহরে' অন্ত্যজ রমণী আসছিল জল নিয়ে, প্রভু তৃষ্ণার জল চাইতে সে পরিচয় দিয়েছে 'হীন নারী' বলে এবং প্রণাম করে বলেছে 'অপরাধী করিয়ো না মোরে।' তখন 'জলভরা মেঘস্বরে' সেই প্রভু শতদল পঙ্কজের যেমন জাতি নেই, তেমনি তারও জাতি নেই, 'পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা' সেই মতো সেও পুণ্যনারী বলে আশীর্বাদ করে গেল। তারপর থেকে সেই ভাগ্যবতী রমণী জলপাত্র চিত্রিত করে প্রভুকে সৌন্দর্যের নিবেদন দেবার জন্য। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী বলেছিল অশুচিই সংসারের ধূলিকে শুচি করেছে, জলপাত্র কবিতায় প্রভু বলেছে মৃত্তিকার বসুন্ধরার মতোই এই অস্পৃশ্যা রমণী পুণ্যবতী, 'সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে', গদ্যনাট্যে আনন্দ বলেছিল, এবং নৃত্যনাট্যে আনন্দ প্রকৃতিকে সহসা দিয়েছিল মানুষের তৃষ্ণা মেটানো সম্মান। বোঝা যায়, জলপাত্র রচনার সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মন চণ্ডালিকার বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিল, সেই ভাবনার চিহ্ন রয়ে গেছে এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে।

শ্রীমতী ঠাকুর ও নন্দিতাদেবীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এক সময় গদ্যনাট্য চণ্ডালিকাকে নৃত্যে ও কথায় অভিনয় করাবেন মনস্থ করেন। ভেবেছিলেন গদ্যসংলাপের অংশগুলি তিনি পাঠ করবেন এবং সংগীত অংশগুলি ঐ দুইজন নৃত্যে অভিনয় করবেন। পূজারিণীর মূকাভিনয়ের পরিকল্পনা দেখে তিনি যখন নটীর পূজা লেখেন এবং নটীর পূজায় যখন গানের অংশগুলি নৃত্যে অভিনীত হয় তখন সেই অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেইভাবে নাটকটির অভিনয় হয় নি। গদ্যনাট্য রচনার মাত্র পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করলেন। চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের নৃত্যনাট্যে রূপান্তর দীর্ঘকালের ব্যবধানে করা হয়েছিল, সেই কারণে তার মধ্যে ভাষাগত ভাবগত ও চরিত্রগত যে বিপুল

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, চণ্ডালিকার রূপান্তরে তা দেখা যায় না। প্রথমত চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যটি পরিণত বয়সের রচনা বলে এবং দুই রূপের মধ্যে ব্যবধান সামান্য কালের বলে চণ্ডালিকার দুই রূপে ভাবভাষা ও চরিত্রগত মৌলিক পার্থক্য নেই।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সঙ্গে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথ যে চণ্ডালিকায় নৃত্যনাট্য রচনার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আরো এক পদক্ষেপ এগিয়েছেন তা বোঝা যাবে। চিত্রাঙ্গদায় সুরহীন আবৃত্তির সঙ্গে নাচ থাকায় যে স্তরচ্যুতির, দ্বিধাগ্রস্ততার দুর্বলতা ছিল, চণ্ডালিকায় সেই দুর্বলতা নেই, কারণ এখানে সুরহীন আবৃত্তি সহযোগে নাচ অনুপস্থিত। সমস্ত সংলাপই এখানে সুরময় গান, সমস্তই নৃত্যই এখানে সুরময় সংলাপের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। তা ছাড়া চিত্রাঙ্গদায় উত্তর-প্রত্যুত্তরে-দ্রুত সংলাপের তুলনায় অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের যে আধিক্য ছিল নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় তা নেই। এখানে অখণ্ড গানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুরময় সংলাপের বিন্যাসের ভিত্তিতে নৃত্যনাট্যটি গড়ে উঠেছে। চিত্রাঙ্গদায় যেমন পূর্বের প্রচলিত নৃত্যগুলি যোগের প্রয়োজনে ও নৃত্যনাট্যটিকে সালংকারা করার প্রয়োজনে গানের পর গান, নাচের পর নাচ যুক্ত হয়েছিল, অনেকে চণ্ডালিকাকেও তেমনি নৃত্যে গানে ঐশ্বর্যময় করার প্রস্তাব করেছিলেন। সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জানিয়েছিলেন, 'বাহুল্য নাচগান বর্জন করা দরকার বোধ হলো। সেগুলি স্বতন্ত্র আকারে যতই ভালো হোক, সমগ্রভাবে বাধাজনক।' চণ্ডালিকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকি-প্রতিভা-কালমৃগয়ার যুগে গানের মধ্য দিয়ে যেমন পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তর সাজিয়েছিলেন, তেমনি গানের সুরের মধ্যে কথোপকথনকে রূপ দিলেন। চিত্রাঙ্গদা ছিল এক দিক থেকে নাট্যের সূত্রে নাচগানের মালা, চণ্ডালিকা হলো নাচগানের সূত্রে নাট্যের মালা। ফলে যে সুঠাম দ্রুততা তথা নাটকীয়তা রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শ পালনে তিনি সফল হলেন চণ্ডালিকায়। কথোপকথনের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুর যোজনা করা হলো এবং সেই ভাব ও সুরের সঙ্গে সাম্য রেখে নৃত্য পরিকল্পিত হলো, তাই 'চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে।... নানা প্রকার সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে।...বিচিত্র সুরসমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সরল ও জোরালো হয়ে উঠেছে,

তাল ও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে।' (নৃত্য)।

চিত্রাঙ্গদার তুলনায় নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় অগ্রগতি ঘটেছে আরো এক দিক থেকে। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যরূপান্তর কালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবদ্ধ নাট্যকাব্যে সুর যোজনা করেছিলেন এবং সুরযোজনার প্রয়োজনে তার ভাষাবিন্যাসকে কিছু পরিবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসী রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডালিকা গদ্য-নাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে গদ্যে সুর দিতে হয়েছে—এ এক অসমসাহসী পদক্ষেপ। গদ্যকেও সুরের সাহায্যে গানে পরিণত করা যায় এই সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আগে থেকে চিন্তা করছিলেন। 'সুরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধনমুক্তিতে কবির পরীক্ষা ফুরায় নাই,' এই মন্তব্য করে গীতবিতানের সম্পাদক মহাশয় দেখিয়েছেন অন্তর্লীন অনুপ্রাসের মাধুর্য থাকায় অনেক গানে তিনি যে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করেছেন তা বোঝা যায় না। 'বেদনা কী ভাষায় রে' বা 'বাজে করুণ সুরে', যে গান হিন্দি বা অন্য প্রাদেশিক গানের সুরে রচিত সেগুলিতে শুধু নয়, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' জাতীয় গানে তিনি মধ্যানুপ্রাসের জোরে গানের প্রচলিত অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করেছেন। শুধু অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন নয়, বিশুদ্ধ গদ্যে সুরযোজনার দ্বারা তাকে গানে রূপান্তরের কথাও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু কাল পূর্ব থেকে চিন্তা যে করছিলেন তারও প্রমাণ আছে। চণ্ডালিকার আট বছর পূর্বে পথে ও পথের প্রান্তের ৩৯ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখেছেন, 'গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনও কখনও গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ।' গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায় শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা-অংশগুলিতেও সুর দেওয়া হয়েছিল।

রাজা॥ অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।

রাজা॥ একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে।

রাণী॥ তোমার একী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো, উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যে সুরযোজনার দ্বারা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরে সাফল্যলাভের পর দেখি রবীন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে গদ্যে সুর দিয়ে তাকে গানের মর্যাদা দিচ্ছেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে রচিত 'আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে' এইরূপ একটি গান। ভাবীকালের অপেক্ষায় না থেকে সংগীত কী ভাবে 'বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয়' করে রূপ নিতে পারে তাই রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে দেখিয়ে দিলেন। বিস্ময় এই যে, লিপিকাকে গানে পরিণত করলে যা হতো রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকায় তার চেয়েও এক পদক্ষেপ এগিয়ে গেলেন। অথচ গান রচনায় সার্থকতার পরেই সংলাপকে গানে পরিণত করার কাজে হাত দেওয়া যায়; গদ্যগান লেখার চর্চার পর তাই গদ্যগান-সংলাপ রচনায় হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিপিকায় সুর দিয়ে তাকে গদ্যগানে রূপান্তরিত না করেই, অথচ গদ্যগান রচনার উল্লেখযোগ্য চর্চা না করেই একেবারে গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় সুর দিলেন, ফলে গদ্যগান শুধু হলো না, তাকে সংলাপের বাহন হতে হলো। গদ্যে সুর যোগ করে গীতধর্ম ও নাট্যধর্ম একই সঙ্গে আনলেন, এ এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব।

গদ্যকে সুরময় সংলাপ-গানে পরিণত করতে যেয়ে সুরের প্রয়োজনে কথার বিন্যাস পরিবর্তন করতে হয়েছে। যদিও কথার ভিত্তিই প্রাথমিক তথাপি কথার সঙ্গে সুরের যোজনা হওয়ায় সুর-প্রভাবে মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষাগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুরের প্রয়োজনে যখন মূল রচনার শব্দগত পরিবর্তন করতে হয়েছে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশজ বা লোক প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে এসেছে তদ্ভব বা তৎসম শব্দ সুরের সঙ্গে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে— 'পুড়ে'-র পরিবর্তে 'জ্বলনে', 'মিথ্যে'-র পরিবর্তে 'মিথ্যা', 'নিন্দে' স্থানে 'নিন্দা' এবং 'আয়না' 'ঝড়' এবং 'বুক'-এর পরিবর্তে 'দর্পণ' 'ঝঞ্ঝা' 'বক্ষ'। গদ্যনাট্যে যে তীব্র অনুভূতি ও আবেগ-প্রাবল্য গদ্যভাষায় নিতান্ত আকুল হয়ে উঠতে পারে নি, নৃত্যনাট্যে সেই আবেগ-ব্যাকুলতা শুধু নৃত্যভঙ্গিমায় ব্যাকুল হয়ে

ওঠে নি, সুরগত প্রয়োজনে সেই তীব্রানুভূতি ও আবেগ কথাগুলির পৌনঃ-পুন্যের সাহায্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই পৌনঃপুন্য একদিকে গানের ধুয়ার কাজ করেছে, নৃত্যভঙ্গিমা গান ও কথার সাহায্যে অনুভূতির মর্মান্তিকতাকে অন্যদিকে প্রকাশ করেছে। গদ্যনাট্যে মা বলেছেন, 'প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।' নৃত্যনাট্যে সেই নিবেদন আকুল হয়ে উঠেছে—'তোমারে করিব অসম্মান, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।' 'আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না', প্রকৃতির এই উক্তি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়ে হয়, 'আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ' এবং এই কথাগুলিই সংলাপ-গানের শেষে আরো তীব্র হয়ে ফিরে আসে 'আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ—না না না।' গদ্যনাট্যের কথাগুলি সুরের টানে সংহতি বেগ ও ঐক্য লাভ করেছে, সঙ্গে কবিতার ধর্ম ও সুরের সংক্রমণে গদ্যের ভাষা চলে গেছে আরো কিছু দূর অর্থের বন্ধন থেকে গভীর গূঢ় ব্যঞ্জনার দিকে।

কোথায়ও কোথায়ও গদ্যনাট্যের দুইটি স্বতন্ত্র সংলাপকে একত্র করে সুর সংযোজনার দ্বারা কিঞ্চিৎ ভাষাগত পরিবর্তন করে ভাবসাদৃশ্যের জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন সংলাপে পরিণত করেছেন—যেমন প্রকৃতির একটি উক্তির ক্ষেত্রে দেখি।

গদ্যনাট্য

(১) তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশী।...(১)

(২) ছি ছি মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের—পাপ সে পাপ। রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে, আমি নই চণ্ডাল। (১)

নৃত্যনাট্য

শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা বলে কি জাত ঘুচিবে তার
অশুচি হবে কি তার জল।

তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের
সে যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী। (২)

গদ্যসংলাপ গদ্যগানে রূপান্তরিত হতে যেয়ে কী জাতীয় ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে তার কয়েকটি নিদর্শন দিই।

গদ্যনাট্য

তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই—পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন। (১)

নৃত্যনাট্য

পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র—
পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে
পারে না, পারবে না। (১)

গদ্যনাট্য

এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহু দূর যা লক্ষ যোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দুহাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে, তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে। (২)

নৃত্যনাট্য

মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।

যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে। (৩)

গদ্যনাট্যের মোট চারটি গান নৃত্যনাট্যে গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে একটি 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' আনন্দ আগমনের পূর্বে প্রকৃতির জীবনের ব্যর্থতাকে রূপায়িত করেছে, 'ফুল বলে, ধন্য আমি' গানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মর্ম বা থীম প্রকাশিত হয়েছে। গদ্যনাট্যে প্রকৃতির গান 'যায় যদি যাক সাগরতীরে' আকর্ষণমন্ত্রে মায়ের শিষ্যাদের নৃত্যের গান হিসাবে নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করা হয়েছে। গদ্যনাট্যে প্রকৃতির গান 'যে আমারে দিয়েছে ডাক' নৃত্যনাট্যে পূর্ণতর রূপ লাভ করেছে। কিন্তু গদ্যনাট্যের মোট এগারোটি গান নৃত্যনাট্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। নৃত্যনাট্যে সমস্ত সংলাপই গান বলে অপ্রয়োজনীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ গান এখানে বর্জিত হয়েছে। এই গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে যতই ভালো হোক এবং গদ্যনাট্যে এই গানগুলির যে স্থানই থাক, নৃত্যনাট্যে যেখানে সমস্ত সংলাপই গান সেখানে এই অখণ্ড গানগুলি 'সমগ্রভাবে বাধাজনক' হয়ে উঠত। রাজার ছেলেকে মন্ত্র করে আনার দুঃসাহস একদিন প্রকৃতির মা দেখিয়েছিল, গদ্যনাট্যের সেই কাহিনীর আভাস নৃত্যনাট্যে নেই। পরিবর্তে নৃত্যনাট্যের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ ও তার সঙ্গে প্রকৃতির মায়ের কথোপকথন সম্পূর্ণ নূতন রচনা। গদ্যনাট্যে জেনেছিলাম প্রকৃতি অস্পৃশ্যা কিন্তু প্রত্যক্ষ করি নি। প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিত্তিতে নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্য নূতন করে লিখিত হওয়ায়, দর্শকের সম্মুখে ফুলওয়ালি, দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালা প্রকৃতিকে 'চণ্ডালিনীর ঝি' বলে অবজ্ঞা করায় আমরা তার মর্মবেদনা ও তার চিরজীবনের ধিক্কারকে অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করি। গদ্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে 'বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না' অথচ মেয়ের কাজ শেষ হলো না বলে মায়ের তিরস্কারের পর প্রকৃতি মাকে বলেছিল আনন্দর জল প্রার্থনার কথা। আনন্দকে সেখানে পেয়েছিলাম আমরা প্রকৃতির বিবরণে। গদ্যনাট্যে জলপ্রার্থী আনন্দকে প্রত্যক্ষভাবে আমরা প্রথম দৃশ্যে পাই না, দ্বিতীয় দৃশ্যে নাটকের শেষে সে প্রবেশ করে বটে কিন্তু তার মুখে মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া কোনো কথা নেই। শ্রীমতী ঠাকুর ও নন্দিতা দেবীর দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে স্থির করায় গদ্যনাট্যে দুইটি মাত্র চরিত্র আছে, নারীচরিত্র। পুরুষ ও মেয়ের একত্র

নাচ তখনো মেনে নেয় নি সমাজ প্রসন্নভাবে। নৃত্যনাট্যের যুগে এই সামাজিক অনুদারতা দূর হওয়ায়, শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী দুইদলের মধ্যে নৃত্যানুশীলন হতে থাকায় পরিবর্তিত রূপে শুধু আনন্দ নয়, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা ও রাজবাড়ির অনুচরের চরিত্র যুক্ত হয়েছে। আনন্দের প্রবেশ ও সংলাপ প্রত্যক্ষভাবে এখন উপস্থাপিত হওয়ায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াও আমরা এখন স্বচক্ষে দেখি, প্রকৃতির মুখ থেকে তার বিবরণ মাত্র শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হয় না। ফলে, দেবতা এতদিন যাকে আঁধারে রেখেছিল তার 'জন্মজন্মান্তরের কালি' ধুয়ে যাওয়ার ঘটনা অনেক বেশী নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ির অনুচর রাণীমা-র পালিয়ে-যাওয়া পোষা পাখি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রকৃতির মাকে মন্ত্র পড়তে বলেছিল—অনুচর ও মা-র এই কথোপকথন থেকে প্রকৃতির মনে পড়ে যায়, মা তো মন্ত্র পড়ে আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে পারে। মায়ের মন্ত্র-শক্তির কথা প্রকৃতিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে অনুচরের আবির্ভাব। সেই দিক থেকে এই নূতন অংশের যোগ সার্থক হয়েছে। চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য শেষ হয়েছিল মন্ত্রসিদ্ধ মা আনন্দকে আকর্ষণমন্ত্রে টেনে আনার পর পাপার্ত মায়ের মৃত্যুতে—'আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই—তোমার ক্ষমার তীরে এসে।' ক্ষমার তীরে আসা এবং পাপের ফলে মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল, তাই নৃত্যনাট্যে মায়ের মৃত্যু নেই। ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে প্রকৃতি যেন মায়ের হয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে 'মাটিতে টেনেছি তোমারে' এই পাপের জন্য। বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণামন্ত্রের অনুগামী আনন্দ যখন 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী' বলে আশীর্বাদ করেছে তখন সে একা প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করে নি। রূপান্তরিত চণ্ডালিকায় প্রকৃতির মা আনন্দের ক্ষমায় উদ্ধার পেয়ে বুদ্ধবন্দনামন্ত্রে কণ্ঠযোগ করেছে।

## (গ) পরিশোধ : শ্যামা

পরিশোধ নাট্যগীতির মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে।' শ্যামা নৃত্যনাট্য এই রূপান্তরিত পরিশোধেরই 'বহুশঃ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ বলা যায়'। শ্যামা সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, 'শ্যামা অনেকবারই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছেও বহুবার। দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় উত্তীয়ের অবতারণা

ও ঘাতকহস্তে তাহার হত্যা নূতন সংযোজন।' এই রূপান্তর-সূত্রটি বিচার করতে গেলে প্রথমে পরিশোধ কবিতা যে কথা ও কাহিনী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছেন সেই কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'একদিন এল যখন আর-একটি ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্য-ভূগোলে আর-একটি দ্বীপ তৈরী হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনও কখনও কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।' কথা ও কাহিনীর কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে যে নাট্যবীজ ছিল তাই সমৃদ্ধতর হয়ে বড়ো আকারে নাট্যরূপ নেওয়ার কথা যখন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তখন নিশ্চয়ই পূজারিনীর নটীর পূজায়, পরিশোধ কবিতার পরিশোধ-শ্যামা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের কথা মনে রেখে বলেছেন। এই ন্যারেটিভ-কবিতাগুলির চরিত্রবিচার করতে যেয়ে ঐ সূচনার শেষে তিনি বলেছেন, 'এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।' এই গ্রন্থের কথা অংশের কবিতাগুলি যার মধ্যে পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চিত্রশালা', বলেছেন 'তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।' এই মন্তব্যগুলি পরিশোধ কবিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। চিত্র বা দৃশ্য পাই নৌকার গমনপথের দুধারে গ্রাম-দৃশ্যে, আসন্ন সন্ধ্যা ও অরণ্যের দৃশ্যে, ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে আছে কাহিনীরস, শ্যামা ও বজ্রসেনের সংলাপের মধ্যে আছে নাটকীয়তা। সাহিত্যের অন্য শাখায় যেখানে ঘটনা বর্ণিত হয়, সেখানে নাটকে ঘটনা দর্শক-শ্রোতার সামনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়—এই প্রত্যক্ষতা নাটক ও চিত্রের সাধারণ ধর্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। এই দৃশ্যময়তা চিত্রময়তা প্রত্যক্ষতা যদি নাটকের গুণ হয় তাহলে সেই গুণ কথা ও কাহিনীর কথা অংশের কবিতাগুলিতে—বিশেষ করে পরিশোধে—বর্তমান। নাটকের প্লটের বীজ রয়েছে কবিতাটির ঘটনাবস্তুতে, নাটকীয়তার আভাস এত দূর পর্যন্ত শ্যামা ও বজ্রসেনের কথোপ-কথনে আছে যে অনতিদীর্ঘ কবিতাটি সমৃদ্ধতর নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হওয়ার সময়, সুরের প্রয়োজনে কথার বিন্যাসগত পরিবর্তন বাদ দিলে, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় সেই সংলাপ হুবহু গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই পরিশোধ

কবিতাকে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

পরিশোধ কবিতার সঙ্গে পরিশোধ নৃত্যনাট্যের যোগ নিবিড়। পরিশোধ কবিতায় নিষ্কারণে বন্দী বজ্রসেনকে মুগ্ধ শ্যামা কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল। কী সম্পদে শ্যামা তাকে মুক্ত করেছে প্রণয়িনীর কাছে বারবার বজ্রসেন জানতে চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিরুপায় শ্যামা প্রেমোন্মত্ততায় তার যে অপরিসীম পাপ সেই পাপকাহিনী বলতে বাধ্য হয়েছে।

বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজ-স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

পরিশোধ নৃত্যনাট্যেও শ্যামার মুখ দিয়ে প্রায় একই ভাষায় উত্তীয়ের আত্মবলিদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিশোধ কবিতা ও নৃত্যনাট্য এই দুইরূপের কোনটিতেই উত্তীয় চরিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে পাই না। শ্যামা নৃত্যনাট্যে একই ভাষায় বজ্রসেনকে নায়িকা তার লজ্জাকাহিনী বলেছে বটে, কিন্তু এই সর্বশেষ রূপে উত্তীয় অনুপস্থিত নয়। শ্যামা যখন আহ্বান করেছে—

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো—
আছ কি বীর কোনো
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে। (২)

তখন উত্তীয় সাড়া দিয়েছে, 'ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে—শুধু তোমারে জানি তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী'। উত্তীয়ের গোপন ব্যথার নীরবরাত্রির অবসান হয়েছে যখন প্রহরীকে যেয়ে সে বলেছে 'বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র—আমি একা অপরাধী।' উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্যও পূর্বরূপে ছিল না। উত্তীয়-কাহিনী যোগের ফলে উত্তীয়-চরিত্র, যার কথা আমরা এতদিন শুনেছিলাম মাত্র, তাকে প্রত্যক্ষ পেলাম, তার মহিমা পরিস্ফুট তার আচরণে, শ্যামার প্রতি ভালোবাসায় করুণায় এবং শ্যামার জন্য আত্মনিবেদনে। নায়ক-নায়িকার সঙ্গে এই তৃতীয় কোণ যুক্ত হওয়ায় নাটকীয়তা এই শেষ রূপান্তরে

বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। শ্যামা ও বজ্রসেনের মধ্যে যার মৃতদেহ চিরদিনের জন্য শায়িত হয়ে তাদের মধ্যে চির-ব্যবধান রচনা করল, পরিশোধ কবিতা যেহেতু কাহিনী-কাব্য তাই সেখানে তার অনুপস্থিতি ততটা ক্ষতিকারক না হলেও, পরিশোধ নৃত্যনাট্যে তার অনুপস্থিতি অবশ্যই ক্ষতিকারক হয়েছিল। সেই ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ শ্যামায় মোচন করেছেন। উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্য যোগের সঙ্গে ঘটেছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। হত্যার পূর্বাহ্ণে শ্যামা তার ছলনা তার মিথ্যাচার অপসারিত করে 'দোষী ও যে নয় নয়' এই কথা বলতে বলতে কারাগারে প্রবেশ করেছে। যদিও তার প্রবেশে প্রহরী নিরস্ত হয় নি, কিন্তু বোঝা যায় বজ্রসেনের তিরস্কারের পূর্বেও শ্যামা বিবেক-দংশনে পাপের ভারে জর্জরিত হয়েছিল। উদ্ধারের প্রণালী বজ্রসেন জানতে চাইলেই শ্যামা বাধা দিয়ে বলেছে 'নহে নহে নহে। সে কথা এখনও নহে।' সে ভেবেছিল প্রেমে দুজনের যেদিন সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাবে সেদিন এ পাপকাহিনী বললে বজ্রসেন তাকে ক্ষমা করতে পারবে। বজ্রসেন কোথাও ক্ষমা করে নি, কবিতায় না, নৃত্যনাট্যে না। পরিশোধ কবিতায় বজ্রসেন শ্যামাকে প্রত্যাখ্যান করে

হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি ; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে, ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশিকৃত করি
তারি পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।

এই অবস্থায় শ্যামা পুনরায় এলে বজ্রসেন পুনরায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন ফেলে দিয়েছে নূপুর, ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে নীলাম্বর। পরিশোধ ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে নীলাম্বরবস্ত্রের কথা নেই, কিন্তু নূপুর কুড়িয়ে নিয়ে আত্মগত চিন্তার কথা আছে। এখানেও শ্যামা পুনরায় প্রবেশ করলে পুনরায় সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু শ্যামার পুনঃপ্রবেশের পূর্বে নূপুর কুড়িয়ে নেবার নির্দেশবাক্য আছে, পরে নূপুর ফেলে দেবার কোন নির্দেশ নেই।

পরিশোধ নৃত্যনাট্যে চারটে দৃশ্য, শ্যামাতেও তাই। কিন্তু দৃশ্যসংখ্যা সমান হলেও এই রূপান্তরকালে শুধু যে পুনর্বিন্যাস হয়েছে তাই নয়, বহু নূতন অংশ

যুক্ত হয়েছে, কিছু পুরাতন অংশ বর্জিত হয়েছে। ফলে পরিশোধের তুলনায় আয়তনে শ্যামা দুই গুণ বেড়েছে। পরিশোধের প্রথমে পথপার্শ্বে শ্যামার যে নাম-না-জানা অতিথির জন্য অপেক্ষার গান, তাকে বর্জন করে শ্যামায় প্রথমেই আমরা নাটকীয় ঘটনায় প্রবেশ করেছি—নাটক আরম্ভ হয়েছে বন্ধু ও বজ্রসেনের মধ্যে ইন্দ্রমণির হার সম্বন্ধে কথোপকথন সংগীত দিয়ে। ইন্দ্রমণির হারের উপাখ্যানটিও নূতন রচনা—পরিশোধ কবিতায় বা নৃত্যনাট্যে এর কোন পূর্বাভাস ছিল না। বস্তুতপক্ষে বন্ধু ও বজ্রসেন এবং কোটাল ও বজ্রসেনের সংলাপ-গান-সম্বলিত শ্যামার প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণ নূতন রচনা। পরিশোধের প্রথম দৃশ্যে শ্যামার অপেক্ষার গানের পর প্রহরী ও বজ্রসেন প্রবেশ করেছিল এবং সেই সময় বজ্রসেনকে দেখে শ্যামা মুগ্ধ হয়েছিল। শ্যামায় সেই দৃশ্যটি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে 'ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর' বলে বজ্রসেনের পিছনে পিছনে কোটালের ছুটে আসা থেকে বন্দী বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান পর্যন্ত সংলাপ পরিশোধ থেকে শ্যামায় অবিকৃত ভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে উত্তীয়ের সংবাদ আমরা পাই—যে উত্তীয় 'বহিয়া বিফল বাসনা' ফিরে ফিরে আসে, যে উত্তীয় 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী গহন স্বপনসঞ্চারিণী'কে ধরার পণ করেছে এবং যে উত্তীয়কে সখীরা বলেছে 'হে প্রেমিক তাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি ফলিবে চরম ফলে।' উত্তীয়ের প্রস্থানের পর শ্যামার প্রবেশ এবং এই সময় শ্যামার প্রতি সখীর যে উক্তি তাতে সখী একদিকে বহমান সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং অন্যদিকে উত্তীয়ের প্রতি বিমুখ ব্যবহারের জন্য শ্যামাকে প্রকারান্তরে তিরস্কার করেছে, বলেছে 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' এবং বলেছে, যে মানুষ আসে তাকে যেন দুঃখের পণে চিনে নেয়। শ্যামা জানিয়েছে সেই দুর্লভ ধন সেই মনের মানুষের দেখা সে এখনও পায় নি। তারপর কোটাল-বজ্রসেন, শ্যামা, সখী ও কোটালের সংলাপ পরিশোধ নৃত্যনাট্য থেকে পূর্বেই বলেছি অবিকৃত ভাবে গৃহীত হয়েছে। পরিশোধে শ্যামা প্রহরীর নিকট দুই দিন সময় চেয়ে নেওয়ার পর বজ্রসেন বলেছিল—

অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু একী সহসা
কোন অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা হাসি। (১)

এবং তারপরেই দৃশ্যাবসান হয়েছিল। শ্যামাতে বজ্রসেনের এই উক্তিটি গৃহীত হয় নি এবং যুক্ত হয়েছে দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি নূতন অংশ। শ্যামা বজ্রসেনকে মুক্ত করার জন্য কোন বীরকে আহ্বান করলে উত্তীয় এসেছে, আত্মনিবেদন

করতে চেয়েছে শ্যামার প্রয়োজনে। জীবনে শ্যামাকে পায় নি, তাই মরণে শ্যামাকে সে পেতে চায় এই আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। সে বলেছে,

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে। (২)

নাটকীয় বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে শ্যামার প্রতি যেন অভিশাপ রচিত হলো। মৃত্যুর ফলে উত্তীয় বজ্রসেনের সঙ্গে সমকক্ষের মতো শ্যামার বক্ষে চিরদিনের জন্য শুধু বাঁধা হয়ে গেল না, সে শ্যামা-বজ্রসেনের মিলনপথে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করল। এর পরে শ্যামা-উত্তীয়ের সংলাপে উত্তীয়ের মহিমা যেমন দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি শ্যামা যেন এই প্রথম উত্তীয়ের সেই মহিমা উপলব্ধি করেছে। উত্তীয় বজ্রসেনের মিথ্যা অপরাধের বোঝা নিজ স্কন্ধে তুলে নিলে কোটাল তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে—আর্তনাদ করেছে সখী 'বুক যে ফেটে যায় হায় হায় রে।' তারপর কারাগারে উত্তীয়-হত্যার দৃশ্য এবং হত্যার পূর্বাহ্ণে বিবেকদষ্ট অনুতপ্ত শ্যামার বাধাদানের বৃথা চেষ্টা। কারাগারে শ্যামা ও বজ্রসেনের কথোপকথন ছিল পরিশোধের দ্বিতীয় দৃশ্যে, শ্যামায় তৃতীয় দৃশ্যে। শ্যামাকে দেখে বজ্রসেন বলেছে 'এ কী আনন্দ!' শ্যামায় বলেছে 'আহা, এ কী আনন্দ!' এই উক্তির পূর্বে শ্যামা প্রথমে নিজের মনের অজানিত আশঙ্কাকে ভাষা দিয়েছে এবং পরে বিদেশীকে সম্ভাষণ জানিয়েছে। কিন্তু পরিশোধ নৃত্যনাট্যে এই দৃশ্যের শেষে শ্যামার গান 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে এবং পরিবর্তে সখীর সংগীত-মন্তব্য যুক্ত হয়েছে। পরিশোধ নৃত্যনাট্যের তৃতীয়-চতুর্থ দৃশ্য একত্রিত হয়ে শ্যামার দীর্ঘ চতুর্থ দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর আছে। পুর-সুন্দরী শ্যামা যে বজ্রসেনের সঙ্গে পালিয়েছে তার জন্যে কোটালের শোচনা নূতন উপাদান, নূতন রচনা সখীগণ ও প্রহরীর কথোপকথন। পরিশোধের তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে শ্যামার গান 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' শ্যামা নৃত্যনাট্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। বজ্রসেন জানতে চেয়েছে কী উপায়ে তাকে মুক্ত করা হয়েছে, শ্যামা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেছে এবং পরে বলতে বাধ্য হয়েছে, স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ বজ্রসেন শ্যামাকে করেছে আঘাত—এই পর্যন্ত সমস্ত সংগীত-সংলাপ পরিশোধ থেকে শ্যামায় অবিকৃতভাবে গৃহীত, শুধু সহচরীর পরামর্শ

'নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস' নূতন যোজনা। যখন শ্যামা বলেছে 'ছাড়িব না' তখন বজ্রসেনের অভিনয় সম্বন্ধে পরিশোধে নির্দেশবাক্য ছিল 'শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা', শ্যামাতে সেই নির্দেশবাক্য পরিবর্তিত হয়েছে 'শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন'। এই ঘটনার পর দুই ক্ষেত্রেই নেপথ্যে মন্তব্য হয়েছে 'হায়! একী সমাপন!' এখানেই পরিশোধের তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত হলো। কিন্তু এই সঙ্গে পরিশোধের চতুর্থ দৃশ্য যুক্ত হয়ে শ্যামার চতুর্থ দৃশ্য রচিত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই পল্লীরমণীর গান, যদিও গানের ভাষা স্বতন্ত্র। এই গানের পর পরিশোধে বজ্রসেনের মুখে 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু,' এই বিনতি সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানের পর মরণলোক থেকে নূতন প্রাণ নিয়ে আসার জন্য বজ্রসেন প্রিয়াকে আহ্বান করেছে এবং প্রিয়ার পরিত্যক্ত নূপুর পেয়ে নীরব ক্রন্দন এবং মধুর স্মরণের মিশ্রানুভূতিতে মগ্ন হয়েছে। শ্যামা এলে পুনরায় সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্যামা প্রণাম করে বিদায় নিলে 'ধিক ধিক ওরে মুগ্ধ' বলে বজ্রসেন নিজের প্রণয়কাতর হৃদয়কে বিবেকতাড়নায় তিরস্কৃত করেছে। নেপথ্যে মন্তব্যসংগীত ভেসে এসেছে 'কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে, যাও চিরবিরহের সাধনায়।' কিন্তু পাপীজনশরণ প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার গান সংগতিহীন ভাবে পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং শেষের নেপথ্য মন্তব্য-সংগীত নিতান্ত আরোপিত এবং সদুপদেশমূলক হওয়ায় পরিশোধ নৃত্যনাট্যে নাট্যরস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শ্যামাতে পরিণতির পুনর্বিন্যাসের ফলে নাটকীয়তার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 'এসো এসো, এসো প্রিয়ে, মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে' এই গানের পর শ্যামার নূপুর নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করেছে বজ্রসেন। পরিশোধের চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমে পল্লীরমণীর গান এর পরে নেপথ্যগান হিসাবে যুক্ত হয়েছে—ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব কেন মিটল না এই ক্ষোভ সেই নেপথ্যগানে প্রকাশ পেয়েছে। পল্লীরমণীর কণ্ঠে এই গান অসংগত ছিল, শ্যামায় পল্লীরমণীর কণ্ঠে সংগত নবরচিত গান ব্যবহার করে এই গানটিকে নেপথ্য মন্তব্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পরে যখন পুনরায় একই ভাষায় 'এসো এসো, এসো প্রিয়ে' বলে অন্তরবেদনায় আহ্বান জানিয়েছে বজ্রসেন, তখন ক্ষমাপ্রার্থিনী শ্যামা ফিরে এসেছে। কিন্তু পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে বজ্রসেন। শ্যামা চলে গেলে তখন বজ্রসেন পাপীজনশরণ প্রভুর কাছে তার বেদনা নিবেদন করেছে, ক্ষমা করতে না পারার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। এই গান পরিশোধে অস্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় তার তাৎপর্য সর্বাংশে পরিস্ফুট

হয় নি, কিন্তু শ্যামায় এই গানটি পরম গভীরতায় নাটকের উপর উপযুক্ত সমাপ্তির যোগ্য যবনিকা টেনে দিয়েছে। পরিণামে পরিশোধের মতো কোন নেপথ্যসংগীত 'গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে' এই জাতীয় উপদেশ বর্ষণ করে নাট্যসংগতিকে নষ্ট করেনি, শিল্পগুণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি।

মালিনী নাটকে গ্রীকনাট্যকলার প্রতিরূপ কোন কোন পাশ্চাত্য রসজ্ঞ লক্ষ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যদিও মনে হয়েছিল গ্রীকনাট্যসুলভ দেশকালে অবিচ্ছিন্নতা মালিনীতে আছে, তবু তিনি স্বীকার করেছিলেন গ্রীকনাট্যকলা তাঁর অভিজ্ঞতার বাহিরে। বস্তুত যে নিয়তি গ্রীকনাট্যের নরনারীর ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে তাদের জীবনপরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করে মালিনী নাটকে সেই নিয়তির কোন সর্বত্রব্যাপী ছায়া আমরা লক্ষ্য করি না। বরং শ্যামা নৃত্যনাট্যের মধ্যে ঠিক গ্রীক নিয়তিধারণা না হলেও নিয়তির একটি গূঢ় উপস্থিতি লক্ষ্য করি। উত্তীয়ের আত্মত্যাগকে শ্যামা যে নির্বিবেকে মেনে নিল সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে নিয়তির অভিশাপ লাগল এবং শেষ পর্যন্ত প্রণয়ীযুগল নিয়তিতাড়িতের মতো ছুটে ব্যর্থ পরিণামকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো। বজ্রসেন ও শ্যামা যখন 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে' গানের মধ্যে প্রেমতরঙ্গে মগ্ন তখন সখী নিয়তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—

অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি, (৩)

বলেছে, নিয়তি বা অদৃষ্ট নামক নির্মম ব্যাধ এই প্রণয়ীযুগলের জন্য মরণের ফাঁসি রচনা করছে। নিয়তির যে মৌলিক লক্ষণ নাটকে নিহিত থাকে নাটকের ট্র্যাজিক আয়রনির মধ্যে, তার কথাও সখীর এই কোরাস-উক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাই। সখী বলেছে, এই প্রেমমগ্নতার

রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি হা হা। (৩)

যে ট্র্যাজিক আয়রনির মধ্যে নাটকে নিয়তির প্রকাশ হয়, সেই আয়রনিই 'বিধাতার দারুণ বিদ্রূপ বজ্র'।

শ্যামা নৃত্যনাট্যে যে ট্র্যাজিক অমোঘতা, সরল বাহুল্যবর্জিত অনিবার্য ট্র্যাজিক লক্ষ্যাভিমুখী যে গতি আছে তা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নাটকে নেই। নিয়তি-তাড়িত প্রণয়ীযুগল অবশ্যম্ভাবী শূন্যতার সম্মুখীন হয়েছে পরিণামে এবং শূন্যতার মধ্যে কোন বৃথা সান্ত্বনা অনুসন্ধান না করে, তাকে

অবিচলিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই নৃত্যনাট্যেই যেহেতু রবীন্দ্রনাথ গ্রীকনাট্যের মৌলিক উপলব্ধির সর্বাধিক নিকটে এসেছিলেন, বোধহয় সেই জন্যেই গ্রীকনাট্যকলার সঙ্গেও এখানে তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাধর্ম্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ট্র্যাজিকধারণার এই সাদৃশ্যবশতই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক গ্রীক নাটকে কোরাস নামক যে 'collective protagonist', যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থেকে ঘটনাচক্র ও পাত্রপাত্রীর ভাগ্য থেকে নির্লিপ্ত হয়ে নিয়তির অমোঘগতি সম্বন্ধে মন্তব্য করে, ঘটনাচক্র ও পাত্রপাত্রীর প্রতিক্রিয়াকে দর্শকের কাছে ব্যাখ্যা করে এবং দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ভাষা দেয়, তার প্রতিরূপ পাই শ্যামা নৃত্যনাট্যে। পরিশোধ নাট্যগীতিতেই এই কোরাসের প্রতিরূপের আভাস এসেছিল নেপথ্য-সংগীতে। কিন্তু গ্রীকনাট্যে কোরাস থাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত, কিন্তু পরিশোধে কোরাসসুলভ মন্তব্যগুলি নেপথ্যগানে পাই। নেপথ্যে থাকায় এই মন্তব্যগুলি কোরাসজাতীয় কোন যৌথকুশীলবের নির্লিপ্ত মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, মনে হয় নাট্যকার নিজেই এই সংগীতমন্তব্যগুলির মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। পুনঃপুনঃ এই জাতীয় নেপথ্যসংগীতে নাট্যকারের মতামত নাটকে অনুস্যূত না হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে বলে সেগুলি নাট্যরস ও নাট্যগতিকে বাধা দেয়। পরিশোধে নেপথ্যসংগীতের মাধ্যমে যে দুইটি মন্তব্য আছে তার মধ্যে নাট্যশেষের মন্তব্য— 'কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে, যাও চিরবিরহের সাধনায়' ইত্যাদি পংক্তিগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ কোন কোরাসের কণ্ঠস্বর নয়, এ স্বয়ং নাট্যকারের কণ্ঠস্বর। গ্রীকনাট্যকলায় কোরাসের মধ্যে যে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর থাকে না তা নয়, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরকে সেখানে নাট্যকার স্বীয় ব্যক্তিত্ব-মুক্ত একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেন। নাট্যকারের এই নৈর্ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য পরিশোধের মন্তব্যগুলিতে নেই, শ্যামার মন্তব্যগুলিতে আছে। গ্রীকনাটকে কোরাস রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকে, শ্যামাতেও যে সখীর মুখে কোরাসসুলভ সংগীতমন্তব্যগুলি বসানো হয়েছে সে আর নেপথ্যে নেই, সে এখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। নেপথ্য থেকে রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষতায় আসার ফলে, সখীচরিত্রের মুখ দিয়ে এই ভূয়োদর্শী মন্তব্যগুলি উচ্চারিত হওয়ায় সেগুলি অনেকাংশে নাট্যকারের মন্তব্য হলেও প্রকটরূপে নাট্যকারের মন্তব্য থাকে নি, চরিত্রের মুখ দিয়ে বিশেষ পরিবেশে উচ্চারিত হওয়ায় নাট্যকারের মন্তব্য এখানে শিল্পসংগত নৈরাত্মসিদ্ধি ও দূরত্ব অর্জন করেছে। ফলে নাট্যরস ও নাট্যগতিও বাধাগ্রস্ত হয় নি। এই কোরাস জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে একটির

ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করেছি। এখানে আরো দুই-একটির কথা উল্লেখ করি। প্রহরীকর্তৃক উত্তীয়কে হত্যার পর সখীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিলরে প্রলয়রাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজাল বাঁশি। (২)

চতুর্থ দৃশ্যে পলাতক প্রণয়ী-যুগলের মঞ্চে প্রবেশের পূর্বাহ্ণে সখীর মন্তব্য-গান পাই

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গ দোলায়
মিলনতরীখানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে। (৪)

কিন্তু শ্যামা 'ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না' বললে বজ্রসেন যখন তাকে আঘাত করেছিল তখন পরিশোধ নাট্যগীতিতে 'হায়! এ কী সমাপন!' গান নেপথ্যে গীত হয়েছিল, শ্যামাতেও রবীন্দ্রনাথ এই গানটিকে রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষতায় কোন পাত্রপাত্রীর মুখে বসান নি, এখানেও এটি নেপথ্যসংগীত রয়ে গেছে। সম্ভবত প্রেমিক-প্রেমিকার এই বেদনারক্তিম নিভৃত আলাপনের মাঝখানে কোন সখীচরিত্রকে উপস্থিত করার বাস্তব অসংগতির কথা চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ এখানে সঙ্গীতমন্তব্যটি নেপথ্যে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু যখন এই গান হয় তখন তাকে নাট্যকারের মন্তব্য বলে নয়, সখীর বলেই মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্গদার তুলনায় আমরা চণ্ডালিকায় দেখেছি আঙ্গিকগত অগ্রগতি কিন্তু চণ্ডালিকার তুলনায় শ্যামায় কোনো আঙ্গিকগত অগ্রগতি নেই। এখানে অগ্রগতি প্রধানত ধারণা ও উপলব্ধিগত। যে ট্র্যাজিক ধারণা শ্যামা নৃত্যনাট্যে মূর্ত হয়েছে তারই প্রয়োজনে কোরাসজাতীয় মন্তব্য-গান শ্যামায় যুক্ত হয়েছে, সুতরাং কোরাস-ব্যবহারের এই আঙ্গিকগত পরীক্ষার কারণও শেষ পর্যন্ত নিহিত আছে এই ট্র্যাজিক ধারণা ও উপলব্ধির মধ্যে। চণ্ডালিকার মধ্যে নিয়তি বা বিধাতার 'বিদ্রূপবজ্র' নেই, প্রকৃতির যে যন্ত্রণা যে বেদনা তাও শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির নগ্নতায় সমাপ্ত হয় নি, তার জীবনের অন্ধকারের উপরে পড়েছে 'তব চরণ জ্যোতির্ময়', এখানে 'দীপ্ত সমুজ্জ্বল, শুভ্র সুনির্মল সুদূর স্বর্গের আলো'। একটি অধ্যাত্ম পরিবেশ, পূজার পরিমণ্ডল চণ্ডালিকার ট্র্যাজিক সম্ভাবনাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয় নি। আকর্ষণমন্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রকৃতি আনন্দের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছে,

অপরপক্ষে বজ্রসেন ক্ষমাভিক্ষা করেছে বিধাতার কাছে তার ক্ষমাহীনতার জন্য। চণ্ডালিকার শেষে পুণ্যালোকের প্রভা, আনন্দ ক্ষমা করে বলেছে 'কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী', বুদ্ধবন্দনা-মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে যবনিকাপাত হয়েছে। কিন্তু বজ্রসেন ক্ষমা করতে পারেনি শ্যামাকে, আর সে অনুমান করেছে—

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না,
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু। (৪)

ঈশ্বরের পক্ষে যা সম্ভব, মানুষ বজ্রসেনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিজমের পরিভাষায় থাকে 'human predicament' বলা হয়, শ্যামা নৃত্যনাট্যে মানুষের সেই অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজিক পরিমণ্ডলের পরিচয় পাই। এখানে কোন আধ্যাত্মিক প্রভা এসে মানব-অস্তিত্বের মালিন্যকে ধৌত করে নি—পাপপুণ্য, 'ভালো ও মন্দ' নিয়ে মানুষের যে নিয়তিতাড়িত বিবেকনিয়ন্ত্রিত অমোঘ ট্র্যাজিক ভাগ্য তাই শ্যামায় রূপায়িত হয়েছে। মর্ত্যের ক্লেদ ও করুণা, জ্যোতি ও যন্ত্রণা শ্যামায় বর্তমান, কিন্তু চণ্ডালিকায় নাট্যকার প্রকৃতিকে নিয়ে গিয়েছেন অতিপ্রাকৃতে 'অন্ধকারের ঊর্ধ্বে', 'পুণ্যলোকে'। সুতরাং চণ্ডালিকার তুলনায় শ্যামায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিকগত অগ্রগতি না হলেও, জীবনোপলব্ধি সম্বন্ধে অন্ধকারপূর্ণ মহিমাময় এমন ধারণা এখানে এসেছে যা ইতিপূর্বে ছিল না, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন তীব্র নাট্যগুণান্বিত চিত্রের সঙ্গে মাত্র এই উপলব্ধির তুলনা চলে।

এই রূপান্তর বিবরণ সমাপ্ত করবার পূর্বে পরিশোধ কবিতায় বজ্রসেন ও শ্যামার যে সামান্য পরিমাণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ ছিল তাকে সুরের প্রয়োজনে কীভাবে পরিশোধ নাট্যগীতি ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করেছিলেন তা দেখাচ্ছি। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্যত্র পরিশোধ কবিতার সংলাপ পরিশোধ নাট্যগীতিতে যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই রূপান্তরকে অবিকৃতভাবে শ্যামা নৃত্যনাট্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশোধ কবিতা—

আহা মরি মরি!
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নত দর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী
বল গে নগরপালে মোর নাম করি,

শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি !

পরিশোধ নাট্যগীতিতে কথার বিন্যাস অপরিবর্তিত আছে, শুধু সপ্তম চরণে 'এ ক্ষুদ্র আলয়ে' হয়েছে 'আমার আলয়ে'। শ্যামা নৃত্যনাট্যে পংক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস ব্যতীত পরিশোধ নাট্যগীতির এই সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। ব্যতিক্রম—'শীঘ্র যা লো সহচরী' আগ্রহের আতিশয্য প্রকাশের প্রয়োজনে হয়েছে—'শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো যা লো—।'

পরিশোধ কবিতা—

এ কি লীলা, হে সুন্দরী, এ কি তব লীলা !
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছে অপমান।

পরিশোধ নাট্যগীতি—

কী খেলা, হে সুন্দরী, কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান-দুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক। (১)

শ্যামা নৃত্যনাট্য—

এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমান-দুখ
কেন দাও অপমান-দুখ।
মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক। (২)

পরিশোধ কবিতা থেকে নাট্যগীতির সংলাপে রূপান্তর হয়েছে সুরগত প্রয়োজনে। শ্যামা নৃত্যনাট্যে সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে ভাববিকাশের প্রয়োজনে ভাষাগত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'দাও অপমান-দুখ' একবার নয়, দুবার বলে বজ্রসেন অপমানের বেদনায় ; একটি অতিরিক্ত 'কেন' যুক্ত হওয়ায় জিজ্ঞাসা তীব্রতর হয়েছে। এই জাতীয় ছোটখাট পরিবর্তন আরো লক্ষ্য করি—কবিতার 'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে', নাট্যগীতির সুরে হয়েছে 'নহে নহে, নহে এ কৌতুক', নৃত্যনাট্যে ঈষৎ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে হলো 'নহে নহে, এ নহে কৌতুক'। কবিতার "আলিঙ্গন ঘনতর করি/'সে কথা

এখন নহে' কহিল সুন্দরী।" নাট্যগীতিতে হয়েছে 'নহে নহে নহে, সে কথা এখন নহে', কিন্তু শ্যামার কিঞ্চিৎ গুরুত্ব বাড়িয়ে 'এখন'-কে করা হল 'এখনো' —'নহে নহে নহে—সেকথা এখনো নহে।' ফলে অর্থেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলো। রূপান্তরের আরো একটি উদাহরণ দিই।

পরিশোধ কবিতা—

প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা।···
বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

পরিশোধ নাট্যগীতি ও শ্যামা নৃত্যনাট্য—

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা—
বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম—
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ
নিজ 'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ॥ (৩, ৪)

## তেরো

## ॥ ভাষান্তরকালীন রূপান্তর ॥

গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের এবং তার পরবর্তী বিশ্ববিজয়-ইতিহাসের কাহিনী আমাদের জানা। অবসরযাপন করতে যেয়ে কবির অনুবাদে হস্তক্ষেপ, বিলাতের রেলস্টেশনে সাময়িকভাবে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া, মুগ্ধ রোটেন-স্টাইনের বাড়িতে ইংরেজ সুধীজনের সামনে কবিকর্তৃক অনূদিত কবিতাগুলি পাঠ, সুধীজনের নীরবে বিদায় গ্রহণ, কবির অনুশোচনা, জনবহুল বাসে

পাণ্ডুলিপি হাতে আত্মবিস্মৃত ইয়েটস্ এবং পরে অভিনন্দনের পর অভিনন্দন। পাশ্চাত্যজগৎ ঐ ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের মধ্যে প্রাচ্যের কবিকে প্রথম আবিষ্কার করল, তারপরেই নোবেল পুরস্কার। পাশ্চাত্যে তাঁর রচনার এই সমাদরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার সমগ্রতার সঙ্গে পশ্চিম জগতের পরিচয় মেটানোর প্রয়োজন বোধ করলেন। ফলে পরবর্তীকালে তিনি শুধু কবিতাবলীর অনুবাদ করেন নি, শুধু ইংরাজি বক্তৃতার মাধ্যমে ভারত-আত্মার পরিচয় দেন নি, পরন্তু নিজের গল্প নাটক উপন্যাসের অনুবাদ হয় নিজে করেন অথবা অন্যদের সাহায্যে -করানোর ব্যবস্থা করেন। যখন তিনি নাটকগুলিকে ভাষান্তরিত করেন তখন দেখা যায় ভাষান্তরকালেও তিনি কোন নাটকের সামান্য, কোন নাটকের প্রভূত পরিবর্তন করেছেন। অনুবাদের নিজস্ব মূল্য নয়, এই রূপান্তর বিবরণ এই অংশের আলোচ্য, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে অনুবাদের নিজস্ব মূল্য সম্বন্ধে মন্তব্য অনিবার্য হয়ে পড়বে।

### (ক) চিত্রাঙ্গদা : Chitra.

প্রথম যে নাটকের ভাষান্তরে রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছেন সে চিত্রাঙ্গদা নাট্য-কাব্য ( ১৮৯২ )। ভাষান্তরে তার নাম Chitra ( ১৯১৩ )। টমসনের মতে 'Those two (Gitanjali ও Chitra) first of his translations seem to me perfect in poise and loveliness.' (Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist). এই ভাষান্তরে পাই দৃশ্যের পুনর্বিন্যাস ও দৃশ্যসমূহের এবং সংলাপের সংকোচন-প্রবণতা। পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত Chitra চিত্রাঙ্গদাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছে। মূলের ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্য একত্রিত হয়ে Chitra-র ষষ্ঠ দৃশ্য লিখিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার ষষ্ঠ দৃশ্যে অর্জুন পঞ্চভ্রাতাসহ শিকারের স্মৃতি রোমন্থন করলে চিত্রাঙ্গদা বলেছিল, 'বন্য হরিণী' চিত্রাঙ্গদা, যে 'চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন স্বপনের মতো' তাকে আগে অর্জুন বাঁধুক, পরে অন্য শিকার হবে। অষ্টম দৃশ্যে অর্জুন জানতে চেয়েছিল চিত্রাঙ্গদার প্রতিবেশ এবং প্রশ্ন করেছিল এ প্রেমের কি ঘর নেই ; উত্তরে চিত্রাঙ্গদা জানিয়েছিল, 'সে কেবল মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গ গতির,' তার কোন ঘর নেই। দুটি দৃশ্যের সংলাপগত সাদৃশ্যবশত ইংরাজি রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ দুটিকে একটি দৃশ্যে পরিণত করেছেন। মূলের সপ্তম দৃশ্য বর্জিত হয়েছে, দশম দৃশ্য পরিণত হয়েছে সপ্তম দৃশ্যে, নবম দৃশ্য অষ্টম দৃশ্যে এবং একাদশ দৃশ্য নবম দৃশ্যে। শেষ দৃশ্যে 'আমি চিত্রাঙ্গদা! রাজেন্দ্রনন্দিনী' বলার ঠিক

প্রাক্‌কালে চিত্রাঙ্গদার নায়িকা অবগুণ্ঠন মোচন করেছিল এবং সেই সময় সূর্যোদয় হয়েছিল। Chitra-য় অবগুণ্ঠনমোচন হয়েছে বেশ কিছু আগে— 'এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে'—এর অনুবাদ Now look at your worshipper with gracious eyes' এই উক্তির পূর্বে নাট্যনির্দেশ আছে 'unveiling her original male attire.'

মূলের অনেক অংশ বর্জিত হয়েছে। কুরূপা চিত্রাঙ্গদা যখন অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের বিবরণ দিয়েছে তখনকার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির অনুবাদ Chitra-য় নেই।

অবলার কোমল মৃণালবাহু দুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ। (১)

মূলের অনেক সংলাপ অনুবাদে সংক্ষিপ্ত হয়েছে, যেমন

সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীব্রবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। (১)

Instantly he leapt up with straight, tall limbs, like a sudden tongue of flame from a heap of ashes. (I)

সংক্ষিপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমে অর্জুনের স্বপ্নাকুল দীর্ঘ একোক্তি। এই ধরনের সংকোচনে ক্ষতির দিক সম্বন্ধে টমসন বেশি কথা বলেন নি, বরং তিনি তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ পেয়েছেন, ক্ষতির জন্য দায়ী করেছেন ইংরাজি ভাষার স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে। 'Rabindranath's translation of Chitrangada provides an interesting study of his method, and is the best example of his insight into another language···The luxuriance of the Bengali has been shorn away largely (I think) because of the lapse of

twenty years between the play and its translation.' মূল রচনা ও অনুবাদের মধ্যে কুড়ি বছরের ব্যবধান থাকায় এই দীর্ঘকালে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন বলে, অথবা কুড়ি বছরের ব্যবধানে মূল-রচনাকালের আরক্তিম উন্মাদনা হারিয়ে ফেলার জন্য তিনি মূলের 'luxuriance' পরিত্যাগ করেছেন, এই হয়তো টমসনের উক্তির তাৎপর্য। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর উক্তির সমর্থনে মদনের উক্তির রূপান্তর থেকে—

বলো তন্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কি সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা। (৩)

I desire to know what happened last night. (III)

ভাষান্তরে যে অনেক রূপান্তর ঘটে ভাষাপ্রকৃতির জন্য, তারও উদাহরণ টমসন দিয়েছেন ;

Or, for a lesser loss, lovely even in deprivation take a sentence mutilated in obedience to the laws which forbid in one language what they permit in another.

বসন তার মিলাতে চাহিতেছিল, অঙ্গের লাবণ্যে সুখাবেশে।

(চিত্রাঙ্গদা, ২)

Her robes in ecstasy sought to mingle with the luster of her limbs (টমসন-কর্তৃক মূলানুগ অনুবাদ)···the vague veilings of her body should melt in ecstasy. (Chitra, II).

ইংরাজি ভাষান্তর যে বিদেশী পাঠকেরা পড়বে তারা ভারতীয় পুরাণ ও অনুষঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ এই কথা ভেবেও রবীন্দ্রনাথ মূলের অনেক পরিবর্তন করেছেন। তারই ফলে 'পঞ্চশর' হয়েছে 'The Lord of Love'। কিন্তু পাঠকের অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য এর চেয়েও গুরুতর পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এর ফলে টমসনের মতে কখনও কখনও 'The English text is more diffuse'। সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে প্রথম দেখে অর্জুনের যে বিহ্বল একোক্তি তার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পংক্তি পাশ্চাত্য পাঠকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্জিত।

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের

নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে ;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে। (২)

অনুরূপ উপমা আগে একবার বর্জিত হয়েছে অনুরূপ কারণে। প্রজাগণের মুখে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার কথা শুনে সেই প্রজাবৎসলা রমণীকে কল্পনা করেছে অর্জুন—

সিংহিনীর মত, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ভয়ে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া। (৯)

প্রথম উপমাটির বিষয় পাশ্চাত্য পাঠকের অপরিচিত নয় বলে অনুবাদে গৃহীত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে দেবী দুর্গার উপমা অপরিচিত বলে অভীষ্ট পাঠক-সম্প্রদায়ের বোধগম্য হবে না অনুমান করে রবীন্দ্রনাথ সেটি পরিত্যাগ করেছেন। ফলে ভাষান্তরে সংলাপটি হয়েছে—'Like a watchful lioness she protects the litter at her dugs with a fierce love.'

এই জাতীয় অনুবাদ যে কবি ও পাঠক উভয়ের প্রতি অবিচার করে একথা অন্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন একজন পাশ্চাত্য সাহিত্যপ্রেমিকা, রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। কবির প্রতি অবিচার হয়, কারণ কাব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে ; পাঠকের প্রতি অবিচার হয়, কারণ, পাঠকের সহানুভূতি ও গ্রহণীশক্তিকে অমর্যাদা করা হয়। অথচ কবিতার কাজই পাঠকের অনুভূতির দিগন্তকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করা ; পাঠকের অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে যে কবিতার চলাচল সে কবিতা নূতন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে না। শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্রনাথের বিজয়া, Tagore on the Banks of the River Plate (সাহিত্য আকাদমি-প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) রচনায় একটি ঘটনার কথা বলেছেন, যার থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকালে কোন্ উদ্দেশ্য সামনে রাখতেন সেটা উপলব্ধি করা যায়। 'পশ্চিমের লোকেদের প্রাচ্যের চিন্তা বোঝবার ক্ষমতা আছে কিনা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথেরও সন্দেহ হত। মনে আছে এসটানসিয়া চাপাদমালাল-এ আমরা যখন ছিলাম তখন একদিন বিকেলে তিনি একটি কবিতা লেখেন।

তিনি কবিতাটি যখন শেষ করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম।…'চায়ের সময় হয়ে এল।'—আমি বলেছিলাম 'কিন্তু নীচে নামবার আগে কবিতাটি অনুবাদ করে আমায় শোনাতে অনুরোধ করছি।'

'তাঁর সামনে ছড়ানো পাতাগুলোর ওপর ঝুঁকে বালির ওপর পাখিদের পদচিহ্নের মত সূক্ষ্ম রহস্যময় অজানা বাংলা অক্ষরগুলি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

'রবীন্দ্রনাথ পাতাটি তুলে নিয়ে অনুবাদ করে শোনাতে শুরু করলেন। অনুবাদটা আক্ষরিক তিনি আমায় বলেছিলেন। মাঝে মাঝে একটু থেমে তিনি যা শোনালেন তাতে আমার মন আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দস্তানা পরে যেমন জিনিস ছোঁয়া, অনুবাদের সাহায্যে কিছু পড়া অনেকটা তাই। আমার মনে হল সেরকম দস্তানা পরে নয়, যেন ভাগ্যগুণে বা অলৌকিক কোন উপায়ে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনাবস্তুর প্রত্যক্ষ নিবিড় স্পর্শ এতদিনে পেয়েছি। অনুবাদের দস্তানা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে অসাড় করে দিয়ে শব্দের সত্যকার অনুভব পেতে দেয় না। শব্দের মূল্যই কিন্তু সবচেয়ে বেশী, কারণ শুধু কবিরাই তাই দিয়ে গোচর ও অগোচরের মধ্যে, প্রতিদিনের স্থূল প্রত্যক্ষ অবাস্তবতা আর কবিতার অপ্রত্যক্ষ সত্যকার বাস্তবের মধ্যে ভঙ্গুর সেতু নির্মাণ করতে পারেন।

'রবীন্দ্রনাথকে আমি ইংরাজি রূপান্তরটিকে পরে লিখে রাখতে বলি। পরের দিন সেটি তিনি আমায় তাঁর সুন্দর ইংরাজি হস্তাক্ষরে লিখে দেন। তাঁর সামনে কবিতাটি পড়ে আমার আশাভঙ্গ আমি গোপন করতে পারি নি। ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলাম কাল যা যা পড়ে শুনিয়েছিলেন তা সব তো এখানে নেই। কেন সেগুলি বাদ দিয়েছেন? সেগুলিই ছিল কবিতাটির মূল, তার প্রাণ।

'তিনি উত্তরে বললেন যে সে কথা পাশ্চাত্য পাঠকের ভালো লাগবে না তিনি ভেবেছিলেন। কেউ যেন আমায় চড় মেরেছে মনে হলো। রাঙা হয়ে উঠল আমার মুখ। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলাম, এই একটিবার অন্ততঃ তিনি দারুণ ভুল করেছেন। এভাবে জোর দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা আমি খুব কমই বলি, যদিও আকস্মিক আবেগ আমার স্বভাবগত।' (শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র-কৃত অনুবাদ, চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩)।

প্রতীচ্যের মানুষের পক্ষে প্রাচ্যদেশীয় ভাবচিন্তাকে অনুধাবন করা সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও ঘটনাচক্রের যোগাযোগে

গীতাঞ্জলির অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর বৃহত্তর এবং উচ্চতর মান-সম্পন্ন পাঠকমণ্ডলীর সামনে তিনি তাঁর রচনাবলীকে উপস্থাপিত করার প্রলোভন জয় করতে পারেন নি। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, প্রতীচ্য পাঠকের সামনে রচনাবলী তুলে ধরে, কিন্তু তুলে ধরার সময় যা কিছু বিশিষ্টভাবে প্রাচ্যের বলে প্রতীচ্যবাসীর কাছে অবোধগম্য হতে পারে তাকে বর্জন করে। তিনি ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, তিনি পাশ্চাত্য পাঠকের চিন্তা ভাবনা ও কল্পনার অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে তাঁর রচনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন ; তিনি দাবী করেন নি, ইংরাজি ভাষা ও বিদেশী পাঠক তাঁর কবিতার মূল ভাব, অনুষঙ্গ, ভাষা ও মাধুর্যের নিকটবর্তী হোক। অথচ যেহেতু ইংরাজি তাঁর মাতৃভাষা নয়, সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্য দক্ষতা সত্ত্বেও, সেই ভাষায় তিনি জীবনের স্পন্দন সব সময় সঞ্চার করতে পারেন নি। ফলে, দুই দিক থেকেই এই অনুবাদগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মূল চিত্রাঙ্গদায় কামের তাপ ছিল, যে জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ এই নাট্য-কাব্যটিকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করেছেন। Chitra-র সঙ্গে মূল চিত্রাঙ্গদার পার্থক্য নিরূপণ করতে যেয়ে টমসন বলেছেন, 'Twenty years later, going over the scenes for his Western readers, he limned the picture on austere lines ('frank handling of passion' পরিত্যাগ করে), perhaps an implied condemnation of the earlier ones.' টমসনের এই অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই। এই অনুমান সত্য হলে মেনে নিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখের অশ্লীলতার অভিযোগ সত্য বলে মনে করেছিলেন। Chitra-য় চিত্রাঙ্গদার কামের উত্তাপ ও আবেগ-রক্তিমা নেই বটে, কিন্তু তার কারণ এই নয় যে তিনি অতীতকে তিরস্করণীয় মনে করেছিলেন। মনে হয়, বাংলা ভাষায় যে যাদুকরী শক্তি তাঁর ছিল তার দ্বারা যে কামতপ্ত প্রেমের চিত্র তিনি চিত্রাঙ্গদায় রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, ইংরাজি ভাষায় তাঁর সেই শক্তি ছিল না বলেই তিনি সেই উন্মাদনা Chitra-য় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

চন্দ্র অস্ত গেল বনে,<br>
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য<br>
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ<br>
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে। (৩)

The moon set behind the trees. One curtain of darkness covered all. Heaven and earth, time and space, pleasure and pain, death and life merged together in an unbearable ecstasy. (III)

'ঝাঁপিল' শব্দের মধ্যে উপমার যে দুরন্ত আভাস তা 'covered'-এ নেই ; 'অসহ্য' শব্দটি ধ্বনির দ্বারা ভাবের দ্যোতনা করে, এই ধ্বনিসম্পদ 'unbearable'-এ নেই। তাই মনে হয়, Chitra-য় মূলের তুলনায় যে কামতাপের অভাব, ভাষাগত কারণই সর্বাধিক পরিমাণে তার জন্য দায়ী। ইচ্ছা-অনিচ্ছা ততটা দায়ী নয়, কারণ অনুবাদ এখানে আক্ষরিক, যতটা দায়ী ভাষাগত অসামর্থ্য। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে বিশ বৎসরের ব্যবধানে, মূল রচনাকালে যে যৌবনোন্মাদনা তিনি ফুটিয়ে তুলতে সহজেই সক্ষম ছিলেন, বয়সের ব্যবধানে তার রূপায়ণ ততটা সহজ ছিল না। 'ল্যাবোরেটরি' গল্প যিনি অশীতিবর্ষ বয়সে লিখতে পারেন তাঁর পক্ষে কোন বয়সেই এই জাতীয় রচনা অসম্ভব নয়, এ কথা মনে রেখেও বলা যায় দুই দশক পূর্বে তারুণ্যের যে জ্বরোত্তাপ রূপায়ণ সম্ভব হয় অবলীলায়, দুই দশক পরেও তা সম্ভব হতে পারে কিন্তু অত অবলীলায় হয় না। কোথাও কোথাও অবশ্য এই তথাকথিত অশ্লীলতাকে গোপনের প্রয়াস লক্ষ্য করি।

হেন কালে
ঘুমঘোরে কখন করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মত পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু। (৩)

And suddenly in the depth of my sleep, I felt as if some intense eager look, like tapering fingers of flame, touched my slumbering body. (III)

অনুবাদে 'flame' শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা কামোন্মাদনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু মূলে 'রভসলালসা' কথার মধ্যে যে উন্মুক্ত স্পষ্টতা ছিল তা এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে টমসনের অভিযোগ সত্য মনে হয়। ইংরাজি গীতাগুলি পাঠ করে প্রতীচ্যের পাঠকমণ্ডলী তাঁকে যে ঋষি বা প্রফেট বলে জেনেছিল, তাঁর সেই পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই কি তিনি চিত্রাঙ্গদার উন্মুক্ত দেহময় আসঙ্গলীলামুখর প্রেমকে Chitra-য়

কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্রীড়াযুক্ত করেছিলেন, মূলের বর্ণের রক্তিমতাকে ধূসরতর করে এনেছিলেন ? গ্যেটের উক্তি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন শকুন্তলা নাটকে বাস্তবিকই তরুণ বৎসরের ফুল এবং পরিণত বৎসরের ফলের একত্র সমাবেশ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত চিত্রাঙ্গদায় তরুণ বৎসরের ফুলই অপরিমিত ঔজ্জ্বল্যে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু Chitra-য় পরিণত বৎসরের ফলের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কামতপ্ত দেহের উৎসব, প্রণয়ের সুতীব্র বিহ্বল আকুলতা, আসঙ্গলিপ্সার উত্তেজিত উন্মাদনা ভাষান্তরে কুণ্ঠিত-প্রকাশ হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ, ভাষাগত, বয়সের ব্যবধানগত; এবং সম্ভবত, প্রতীচ্যে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রতিষ্ঠিত ধারণা তার সঙ্গে সংগতিরক্ষার প্রয়োজনও কবির অজ্ঞাতে অনুবাদকালে কবিকে প্রভাবিত করেছিল।

ইয়েটস্ ইংরাজিতে Chitra পড়েছিলেন এবং এই নাটকের মূল বক্তব্য তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এই নাট্যকাব্য পাঠে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া তা পাই তাঁর For Anne Gregory নামক কবিতায়। ইয়েটস্ যদি বাংলায় চিত্রাঙ্গদা পড়তে পারতেন, যে-রূপে দেহগত সৌন্দর্য অন্তিমে অস্বীকৃত হলেও যে-রচনা দেহচেতনা ও আসঙ্গলিপ্সাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে, তাহলে বোধ হয় চিত্রাঙ্গদার বক্তব্যকে এত তীব্রভাবে অস্বীকারের প্রয়োজন ইয়েটস্ বোধ করতেন না। কামের যে তাপ বাংলা রূপে বর্তমান, ইংরাজি রূপান্তরে তা নেই বলেই, তরুণবৎসরের ফুলের যে প্রাধান্য মূলে ছিল তাকে অনেকাংশে বর্জন করে পরিণত বৎসরের ফলই বেশী প্রাধান্য পাওয়ায়, ইয়েটস্ এই দেহাতীত আত্মার বন্দনায় প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের Chitra-র বক্তব্যের প্রতিবাদ ইয়েটস্ উল্লিখিত কবিতাটিতে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা নায়ককে বলেছিল, তাহার দেহের সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে তার 'true self'-কে ভালোবাসতে। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা যেমন মদন ও বসন্তের কৃপায় বৎসরব্যাপী সুষমা পেয়েছিল, ইয়েটস্-এর নায়িকা তেমনি হলুদ কেশের কৃপায় সুন্দর হয়েছে। নায়িকা বলেছে—

'But I can get a hair-dye  
And set such a colour there,  
Brown, or black, or carrot,  
That youngmen in despair  
May love me for myself alone  
And not my yellow hair.'

সেই হলুদ কেশে সে এমন রং মাখাবে যে শেষ পর্যন্ত যুবাদল তাকে ভালোবাসবে তার হলুদ চুলের জন্য নয়, তার দেহসৌন্দর্যের জন্য নয়, তার আপন সত্তার জন্য। কিন্তু কবি উত্তরে বলেছেন—

> ...only God, my dear,
> Could love you for yourself alone
> And not your yellow hair.'

(খ) রাজা : The King of the Dark Chamber.

ম্যাকমিলান-প্রকাশিত The King of the Dark Chamber-এ বলা হয়েছে অনুবাদ নাট্যকারের নিজের। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড থেকে জানা যায়, 'কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামক এক প্রতিভাবান ছাত্র কবির রাজা নাটক তর্জমা করেন।' রবীন্দ্রনাথ এই তর্জমাই ইয়েটস্-কে পড়তে দেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি জীবনীর গ্রন্থপঞ্জীতে The King of the Dark Chamber সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'The translation is erroneously attributed to the author in the title-page'. মনে হয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন অনুবাদ করলেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। সাহিত্য-আকাদমি-প্রকাশিত শতবার্ষিকী শ্রদ্ধানিবেদন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'A Chronology of Eighty years'-এ বলা হয়েছে, 'K. C. Sen translated into English the drama, Raja and Debabrata Mukherjee, Dakghar, both revised by the Poet.' রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোন অনুবাদকের পক্ষেই, তর্জমাকালে এই জাতীয় স্বাধীনতা নেওয়া সম্ভব ছিল না, যে জাতীয় স্বাধীনতা রাজার ইংরাজি রূপান্তরে নেওয়া হয়েছে। রাজা থেকে The King of the Dark Chamber, এ শুধু ভাষান্তর নয়, রূপান্তরও বটে। এই রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণাধীনে করা হয়েছিল বলেই বোধ হয় ম্যাকমিলান কোম্পানি নাট্যকারকেই অনুবাদক বলে নামপত্রে উল্লেখ করেছিলেন। একদিক থেকে কথাটি মিথ্যাও নয়—কারণ The King of the Dark Chamber-এর ভাষান্তর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন করলেও, রূপান্তর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ও নির্দেশে। শ্রীযুক্ত সেন-কৃত অনুবাদকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রাজার কুড়িটি দৃশ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অরূপরতনে চারটি মাত্র দীর্ঘ

দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু The King of the Dark Chamber-এ রাজার দৃশ্যসংখ্যাই শুধু অক্ষুণ্ণ নেই, এখানে পরিবর্তনের পরিমাণ তুলনায় সামান্য। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি এই। প্রথমত, রাজার দ্বিতীয় দৃশ্য 'পথ' ইংরাজি তর্জমায় প্রথম দৃশ্য হয়েছে এবং প্রথম দৃশ্যের 'অন্ধকার ঘর' ইংরাজি রূপান্তরে দ্বিতীয় দৃশ্য হয়েছে। রাজা নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে 'মোদের কিছু নাই রে নাই' গান পদাতিকগণের প্রবেশের পরে ছিল, কিন্তু The King of the Dark Chamber-এ গানটি পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন অংশের সংলাপ বর্জিত হয়েছে, যেমন তৃতীয় দৃশ্যে 'কমলমুকুলদল' গান পর্যন্ত অংশ, তৃতীয় দৃশ্যেই ঠাকুরদার ও কুম্ভের সংলাপ এবং স্ত্রীলোকদের সংলাপ ও নাচের দল। পঞ্চম দৃশ্যের স্ত্রীলোকদের প্রবেশ থেকে 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে' গান পর্যন্ত বাদ, এবং কাঞ্চীরাজ ও রাজবেশীর কথোপকথনকালে সহসা ঠাকুরদার আত্মপ্রকাশ থেকে দৃশ্য-শেষ পর্যন্ত অংশও ইংরাজি রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে। একাদশ দৃশ্যের কিছু কিছু সংলাপ পরিবর্তিত হয়েছে, কোন কোন সংলাপ সম্পূর্ণত পরিত্যক্ত হয়েছে। দ্বাদশ দৃশ্যে বন্দী কান্যকুব্জ-রাজ ও অন্যান্য রাজগণের সংলাপ অংশ সর্বৈব বর্জিত। পঞ্চদশ দৃশ্যের স্বয়ম্বরসভার কিছু সংলাপ নবরূপে গৃহীত হয় নি, যেমন গৃহীত হয়নি অষ্টাদশ দৃশ্যে শম্ভু-সুদনদের কথা। তৃতীয়ত, রাজার ছাব্বিশটি গান সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে মাত্র এগারোটা হয়েছে। একটি গানের স্থানান্তর উল্লেখযোগ্য—রাজার অষ্টাদশ দৃশ্যের শেষে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গান ছিল, The King of the Dark Chamber-এ সেই জায়গায় রাজার পঞ্চম দৃশ্যের গান 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি'-র ভাষান্তর 'I am waiting with my all' ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, The King of the Dark Chamber-এর যে-স্থানে 'I am waiting with my all' গান বসেছে, রাজার পরবর্তী রূপান্তর অরূপরতনের ঠিক সেখানে 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি' গান ব্যবহৃত হয়েছে।

এই নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে যখন টমসন বলেন, 'Thakur-dada...spoils everything', 'Grand father is just a nuisance', তখন বোঝা যায় টমসন ঠাকুরদা চরিত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্যও উপলব্ধি করতে পারেন নি। যদি তিনি ঠাকুরদা চরিত্রের তাৎপর্য বুঝতেন তাহলে ঐ চরিত্র বর্জনের প্রস্তাব দিতেন না, কারণ ঠাকুরদাকে বর্জন করার অর্থ প্রায় হ্যামলেট নাটক থেকে

ডেনমার্কের যুবরাজকে বহিষ্কৃত করা। সহানুভূতির এই অনুদারতার জন্য রবীন্দ্রনাথ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুযোগ করে লিখেছেন, 'টমসন তাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।' এতৎসত্ত্বেও রাজা থেকে The King of the Dark Chamber-এ রূপান্তর সম্বন্ধে টমসন যে মন্তব্য করেছেন তা অনেকাংশে সত্য—'It has both gained and lost in translation. The gain is by the partial omission of bands of strolling singers who clutter up the action with aimless, almost imbecile revelry which becomes a convention in the poet's later dramas. Also, the scenes are freely re-arranged with a greater access to compactness'. টমসন যাকে 'imbecile revelry' বলেছেন তা যে উদ্দেশ্যহীন 'aimless' নয় তা টমসন যদিও ধরতে পারেন নি, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না, রাজায় ঠাকুরদার সঙ্গীসাথী হিসাবে বালকদল, বাউলদল, নাচের দল এবং যে কোনো প্রসঙ্গে তাদের গান নাটকের গতি এবং উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ইংরাজি রূপান্তরে এগুলি বহুলাংশে বর্জিত হওয়ায় নাটকের যে উন্নতি হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই রূপান্তরে ক্ষতিও হয়েছে একথা টমসন বললেও ক্ষতি কোথায় হয়েছে তা বলেন নি। যদিও তিনি 'Whose fiery blazon bursts the heavens asunder,?' এই জাতীয় পংক্তির মধ্যে এলিজাবেথীয় ব্ল্যাংক ভার্সের বিদ্যুৎ-প্রভা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু বাঙালী পাঠক যখন মূল রাজা নাটক ও তার ইংরাজি রূপান্তর তুলনা করেন তখন ভাষাগত ক্ষতির জন্য দুঃখবোধ না করে পারেন না। যদিও রূপান্তর, বর্জন-গ্রহণ, দৃশ্যসমূহের পুনর্বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-পরামর্শক্রমে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায় তথাপি তর্জমার ভাষার দায়িত্ব প্রধানত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের। কিন্তু এ কথা বললেও রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব হ্রাস হয় না। কারণ এই অনুবাদকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, প্রকাশে রাজি হয়েছিলেন, এতদূর পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে ভ্রমক্রমে হোক, ইচ্ছাক্রমে হোক, অনুবাদ যে তাঁরই এই কথা প্রচার করা হয়েছিল। বাঙালী বা বাংলা ভাষায় দক্ষ পাঠক যখন রাজার পাশে The King of the Dark Chamber রেখে তুলনা করেন তখন শব্দের অনুষঙ্গ, মাধুর্য, ধ্বনিসংগীতের ক্ষতি লক্ষ্য করে নিতান্ত ম্রিয়মাণ বোধ করেন এবং ভাষান্তরে যে কী পরিমাণে হারিয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারেন।

সুদর্শনা॥…সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তালের পর তাল ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত। (১২)

Sudarshana ॥...I used to come after dressing in the evening and stand at my window, and out of the blank darkness of our lampless meeting-place used to stream forth strains and songs and melodies, dancing and vibrating in endless succession and overflowing profusion, like the passionate exuberance of a ceaseless fountain ! (XII)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূলের কোন কোন অংশের তর্জমা সম্ভবপরতার পরপারে উপলব্ধি করে অনুবাদের কোন চেষ্টা হয় নি—যে গান 'কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে' ডেকে নিয়ে যায়, তার কথা তর্জমায় বলার চেষ্টা থেকেও অনুবাদক বিরত হয়েছেন। 'দীপ নেবানো'-র অনুষঙ্গ নেই 'lampless'-এ, 'বাসরঘরের' অনুষঙ্গ ফোটাতে অক্ষম 'meeting-place', 'গানের পর গান, তালের পর তাল' বোঝাতে অনেক বাগ্‌বিস্তার করা হয়েছে বটে কিন্তু 'লীলা'-র মাধুর্য তার মধ্যে নেই। রাজা নাটকের অনেক ক্ষেত্রে গদ্যও লিরিক হয়ে উঠেছে, ফলে তার অনুবাদ হয়েছে অসম্ভব। রাজার গান, যেগুলি নির্জলা লিরিক, তার অনুবাদের চেষ্টায় ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে। (২)

তার কী দীন দরিদ্র ভাষান্তর—

My beloved is ever in my heart
That is why I see him everywhere...(I)

আজি হৃদয়-মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা-হোথায়…। (১)

একে যখন নিম্নলিখিতভাবে ভাষান্তরিত করা হয়,

> But the time of their surrender will come.
> their flights hither and thither will be ended···(II)

তখন আমরা সুরহীন, মাধুর্য-অনুষঙ্গহীন, অবয়বত্বহীন সারমর্মটুকু বা অসার পদার্থটুকু পাই। অন্ধকারের কান্নার মতো 'বউ-কথা-কও' পাখির ডাককে যখন 'Speak, wife' বলে অনুবাদ করতে হয় তখনই বোঝা যায় অনুবাদে কতটা হারায়, অনুবাদ আক্ষরিক ও বিশ্বস্ত হয়েও কখনো কতদূর হাস্যকর হতে পারে।

## ( গ ) ডাকঘর : The Post Office.

বাংলায় ডাকঘর প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে, তার ইংরাজি অনুবাদ হয় মাত্র দুই বৎসর পরে। দুইটি রূপের মধ্যে কালগত ব্যবধান সামান্য হওয়ায় এই রূপান্তরে পরিবর্তনও সামান্য। ইংরাজি তর্জমা যদিও দেবব্রত মুখোপাধ্যায় করেছিলেন তথাপি ম্যাকমিলান-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্য সংগ্রহের মধ্যে রবীন্দ্ররচনা বলে অনুবাদটি গৃহীত হওয়ায় বোঝা যায় এই রূপান্তরটিকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত সামান্য পরিবর্তনও অনুবাদকের পক্ষে করা সম্ভব হতো না যদি রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবর্তনকে সংগত বলে অনুমতি না দিতেন। মূল ডাকঘর নাটকের তিনটি দৃশ্য The Post Office-এ দুইটি অঙ্কে সংহত—অঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য। ডাকঘরে মাধব ও অমলের প্রস্থানের পর প্রথম দৃশ্য শেষ হয়েছিল। কিন্তু The Post Office-এ মাধবের প্রস্থানের পর ডাকঘরের দ্বিতীয় দৃশ্যের দইওয়ালাকে (Dairyman) প্রবেশ করিয়ে এবং প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে দইওয়ালা ও অমলের কথোপকথন জুড়ে দুইটি দৃশ্যকে একটি অঙ্ক তথা একটি দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। ডাকঘরের তৃতীয় দৃশ্য ইংরাজি রূপান্তরে তাই দ্বিতীয় অঙ্ক হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে ফকিরবেশী ঠাকুরদার সঙ্গে অমলের কিছু সংলাপ অনুবাদে পরিত্যক্ত হয়েছে। অমল বলেছিল একজন ছিদামের কথা, যে বলেছে 'আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে', 'সে বেচারা দেখতে পায় না'—তার সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনাটি তর্জমায় বর্জিত। ভিক্ষার সঙ্গে সাধুত্বের বৈরাগ্যের যে অনুষঙ্গ ভারতবাসীর মনে জাগে, তা কর্মী প্রতীচ্যবাসীর মনে জাগবে না বলেই কি রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি পরিত্যাগ করতে নির্দেশ

দিয়েছিলেন ? এ ছাড়া অন্যান্য পরিবর্তন সামান্য। ছেলেদের একত্রিত কথোপকথন অনুবাদে ভেঙে স্বতন্ত্র এক-একজন ছেলের উক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। অমলের সঙ্গে প্রহরীর সংলাপে অমল সম্বন্ধে প্রহরীর কয়েকটি জনান্তিক মন্তব্য তর্জমায় পরিত্যক্ত।

(১) প্রহরী॥ ডাকঘর আর কার হবে। রাজার ডাকঘর।—**এ ছেলেটি ভারি মজার।** (২)

Watchman. Whose ? Why, the King's, surely ! (I).

(২) প্রহরী॥ তা নইলে ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অত বড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন।—**ছেলেটিকে আমার বেশ লাগছে।** (২)

Watchman. Otherwise why should he set his post office here right in front of your open window, with the golden flag flying ? (I)

(৩) প্রহরী॥ ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।—**এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।** (২)

Watchman. Oh, from door to door, all through the country. (I)

রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরের ভাষাকে বলেছিলেন 'গদ্যলিরিক'। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার সঙ্গে ডাকঘরের ভাষার তুলনা করলে এবং তাদের ছন্দস্পন্দের তুলনামূলক বিচার করলে কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। অমলের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিকে গদ্যকবিতার মতো করে সহজেই সাজানো যায়। 'আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে **আসছে**—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে **আসছে**। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে **আসছে**—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই **আসছে**—তারপরে আখের খেত—সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে **আসছে**--রাতদিন একলাটি চলে **আসছে**; খেতের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যত সেই **আসছে** দেখছি,

আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।' পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিপিকা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধহয় ভীরুতাই তার কারণ।' সেই ভীরুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অমলের এই সংলাপকে গদ্যকবিতার মতো করে সাজানো যায়।

আমি দেখতে পাচ্ছি
রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে
একলা কেবলই নেমে আসছে—
বাঁ হাতে তার লণ্ঠন,
কাঁধে তার চিঠির থলি।
কত দিন কত রাত ধরে
সে কেবলই নেমে আসছে।
পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে
সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে
সে কেবলই চলে আসছে……।

তেমনি বিপরীতক্রমে পুনশ্চের শেষ দান কবিতাটিকে গদ্যের মতো করে সাজানো যায়।

দেরি **করলে না**।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে-বেগনি ফুলে।
পাতা **গেল না** দেখা,
যতই ঝরে ততই ফোটে,
হাতে **রাখলে না** কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় করে।
তারপরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

দেরি করলে না। তার হাসিমুখের বেদনা ফুটে উঠল ভারে ভারে ফিকে-বেগনি ফুলে। পাতা গেল না দেখা, যতই ঝরে ততই ফোটে, হাতে রাখলে না কিছুই। তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় করে। তারপরে বিদায় নিল এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

পুনশ্চের কবিতাটির উদ্ধৃত অংশটিতে যেমন 'করলে না', 'গেল না,' 'রাখল না'-র ভাব ও ধ্বনির পৌনঃপুন্য ছন্দের নিয়মিত তালের অভাবকে দূর করে মধ্যানুপ্রাসের কাজ করে এবং গদ্যের মধ্যে পদ্যের বন্ধন সঞ্চার করে, তেমনি ডাকঘরের উদ্ধৃত অংশটিতে একই কাজ করে 'আসছে' এই ঘটমান বর্তমান ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য। অমলের এই উক্তির মধ্যে যখন অলৌকিক ডাকহরকরা 'আসছে' 'আসছে' এই কথা শুনতে পাই বারবার, তখন ভাব ও ধ্বনি দুই দিক থেকেই গীতাঞ্জলির গানটির কথা স্মরণপথে আসে।

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

গদ্যলিরিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরে যে ক্ষমতার চরমতার পরিচয় দিয়েছেন তার ইংরাজি অনুবাদ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে হঠকারিতা যাঁর মাতৃভাষা ইংরাজি নয়। মাতৃভাষা যাঁর ইংরাজি তাঁর পক্ষেও অনেক সময় ভাষাস্বভাবের দুস্তর পার্থক্যের জন্য এক ভাষার এই জাতীয় রচনা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া কবিতার অনুবাদ হয় না, এবং যেখানে গদ্যও কবিতার গুণে আক্রান্ত সেখানেও অনুবাদ হয়ে পড়ে অসম্ভবের সাধনা। তথাপি The Post Office-এ ডাকঘরের ভাষার যথা-সাধ্য তর্জমার চেষ্টা হয়েছে। অমলের পূর্বোদ্ধৃত সংলাপের এইরূপ অনুবাদ পাই—

I can see it all; there, the King's postman coming down the hillside alone, a lantern in his left hand and on his back a bag of letters; climbing down for ever so long, for days and nights, and where at the foot of the mountain the waterfall becomes a stream he takes to the footpath on the bank and walks on through the rye; then comes the sugarcane field and he disappears into the narrow lane cutting through the tall stems of the sugarcane; then he reaches the open meadow where the cricket chirps and where there is not a single man to be seen, only the snipes wagging their tails

and poking at the mud with their bills. I can feel him coming nearer and nearer and my heart becomes glad. (II)

(ঘ) প্রকৃতির প্রতিশোধ : Sanyasi or the Ascetic.

টমসন-রচিত রবীন্দ্রজীবনী ও সমালোচনা গ্রন্থ থেকে জানা যায়—'...in the summer of 1916, he went to Japan, writing Stray Birds on the way.…On the boat, as well as writing Stray Birds and his Pilgrim diary, he translated Nature's Revenge, Sacrifice, (The) King and (The) Queen, and Malini. He was an extraordinary rapid worker ; but this record must be considered remarkable. He did the translations all in a week.' এই চারটি অনুবাদের মধ্যে অতি-দ্রুততার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি দৃশ্য একটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে, নাট্যসময় সংক্ষিপ্ত হয়েছে, ঘটনা ও চরিত্র বাহুল্য হারিয়ে এমন গতি লাভ করেছে যা মূলে ছিল না—এগুলি কি অনুবাদকালের অতিদ্রুততার প্রমাণ ?

প্রকৃতির প্রতিশোধের (১৮৮৪) ইংরাজি রূপান্তর Sanyasi or the Ascetic (১৯১৭) সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে টমসন বলেছেন, 'The poet has taken such liberties with his own text that the latter half of his translation has hardly any correspondence with the Bengali.' প্রকৃতির প্রতিশোধের তিনটি ত্রুটির কথা টমসন উল্লেখ করেছেন ; প্রথমত, গঠনের শৈথিল্য, দ্বিতীয়ত পাত্র পাত্রীর সংখ্যার অকারণ প্রাচুর্য, 'shadows that duplicate each other,' এবং তৃতীয়ত যে-কোন সুযোগে দীর্ঘভাষণ প্রবণতা। এই তিন জাতীয় দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে ইংরাজি ভাষান্তরকালে দূর করার চেষ্টা করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের বহুলতার ফলে যে গঠনগত শৈথিল্য মূল রচনায় ছিল সেই দুর্বলতা রূপান্তরকালে দূর করেছেন—'Rabindranath has telescoped together with no dramatic loss whatever scenes that are not even contiguous in the Bengali.' ফলে মূলের ষোলটি দৃশ্য মাত্র চারটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যটি শুধু অপরিবর্তিত আছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দৃশ্য পর্যন্ত যুক্ত হয়ে ইংরাজিতে হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্য। মূলের সপ্তম,

একাদশ এবং ত্রয়োদশ দৃশ্য একত্রিত হয়ে Sanyasi or the Ascetic নাটকের তৃতীয় দৃশ্য নূতনভাবে রচিত হয়েছে। মূল নাটকের অষ্টম, নবম ও দশম দৃশ্য রূপান্তরকালে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। এই দৃশ্যগুলির কোন নাটকীয় মূল্য ছিল না —দৃশ্যগুলির অধিকাংশ জুড়ে ছিল সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দীর্ঘ একোক্তি, যা নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে অথচ নাট্যবিষয়ের উন্মোচনে কোনভাবে সাহায্য করে নি। বাংলা রূপের চতুর্দশ দৃশ্য থেকে ইংরেজি রূপের চতুর্থ দৃশ্যের সূত্রপাত।

কিন্তু মূলের কয়েকটি দৃশ্যের ভিত্তিতে রূপান্তরের এক-একটি দৃশ্য রচিত বলে একথা যেন মনে করা না হয়, মূলের দৃশ্যগুলিকে তর্জমাকালে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। রূপান্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বস্তুত দৃশ্যগুলির মূল কাঠামো নিয়ে স্বাধীনভাবে গ্রহণবর্জনের দ্বারা নূতন দৃশ্যগুলি রচনা ও পুনর্বিন্যাস করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষকদের গান 'হা দে গো নন্দরানী' বা ভিক্ষুকের গান শুধু বর্জিত হয় নি, 'বালকপুত্রসমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ' এবং তৎপরবর্তী সংলাপ এবং ঐ দৃশ্যেরই আরো কিছু পরে স্ত্রীলোকদের সংলাপ বর্জিত হয়েছে। রূপান্তরকালে প্রয়োজনমতো নূতন অংশও তিনি রচনা করেছেন—বালকপুত্র সমেত স্ত্রীলোক এবং তার সংলাপের পরিবর্তে ইংরাজিরূপে 'Enter a village Elder and Two women' এবং তৎপরবর্তী সংলাপ নূতন রচনা। মূলে অস্পৃশ্যা রঘুর দুহিতার কোন নামকরণ করা হয় নি, সেই নামহীন নিরুপাধি বালিকার যেন কোন সত্তা ছিল না, যেহেতু সমাজ তাকে গ্রহণ করে নি। ইংরাজি রূপান্তরে বালিকার নামকরণ করা হয়েছে Vasanti। তৃতীয় দৃশ্যে রঘুর দুহিতা যে অস্পৃশ্যা তা বোঝানোর জন্য বালিকার সঙ্গে পথিক, বৃদ্ধা, জননী ও কন্যার সংলাপ ছিল। নবরূপে সেই সংলাপ পরিত্যক্ত হয়ে সেই সংলাপের সারাংশ নিয়ে Vasanti ও Wo nan-এর সংলাপ লিখিত। এই-ভাবে পুরাতনের ভিত্তিতে, দৃশ্যগুলিকে যুক্ত করে, পুনর্বিন্যস্ত করে, বর্জন করে, নূতন সংলাপ রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ মূল রচনার গঠনগত শিথিলতা যথাসাধ্য পরিহার করেছেন। আকারে নাটকটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু মূল বক্তব্যের কিছুই তাতে হারায় নি।

প্রকৃতির পরিশোধের অস্পৃশ্যা বালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথোপকথন ছিল নানা দৃশ্যে এবং বালিকা যে দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীর স্নেহচ্ছায়ায় বাস করেছিল তার প্রমাণ ছিল। প্রথমে সন্ন্যাসী বলেছিল তৃতীয় দৃশ্যে 'তুমি না তেয়াজিলে মোরে আমি তেয়াজিব না,' চতুর্থ দৃশ্যে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল 'কখনো না,

পালাব না, রহিব এমনি,' পঞ্চম দৃশ্যে পুনরায় 'কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে'। ষষ্ঠ দৃশ্যে সে বালিকার উপহার ফুলফলে পদাঘাত করে বলেছে বটে 'আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,' কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে বলেছে 'দাও বৎসে এনে দাও ফুলফল তব'। অষ্টম ও নবম দৃশ্যে স্নেহ ও সন্ন্যাসের মধ্যে যখন সংশয় তখন দরিদ্র বালিকা এবং এক কন্যাসহ স্ত্রীলোককে দেখে স্নেহ বলবতী হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্ষু মুদে সে বলেছিল 'যাক দূরে, চলে যাক মায়া-মরীচিকা' এবং দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে সে একবার বালিকাকে দূর করেছিল, একবার কাছে টেনেছিল। দ্বাদশ দৃশ্যে বালিকার পালিত লতাকে ছিন্ন করে 'রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে মায়াবিনী' বলে, মূর্ছিতা বালিকাকে ফেলে সন্ন্যাসী সবেগে বিদায় নিয়েছিল। ষোড়শ দৃশ্যে ধূলি-লুণ্ঠিতা মৃতা বালিকার কাছে তপস্যার ধন উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী ফিরে এসেছিল। ইংরাজি রূপান্তরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বালিকার এমন বারংবার সাক্ষাৎ দেখানো হয় নি। বালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর সম্পর্কের যে দ্বিমুখী টান তা ইংরাজি রূপান্তরে পরিস্ফুট করা হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম সাক্ষাৎকালে। মূল নাটকে স্নেহ ও সন্ন্যাসসাধনার মধ্যে যে পুনঃপুনঃ আন্দোলন ছিল, এখানে তা নেই, যদিও বিরোধের মূল ভাবনাটি অক্ষুণ্ণ আছে। অস্পৃশ্যা বালিকাকে সে বলেছিল 'Wipe away your tears, child'; যদিও বলেছিল বিশ্বে সত্যকার কোন আশ্রয় নেই, তবু ডেকেছিল, 'Come away from here, child, come away.' কিন্তু সেই দৃশ্যের শেষেই সে মন্তব্য করেছিল, 'The girl imagines I love her,—foolish heart' এবং বালিকার লতা ছিন্ন করে সন্ন্যাসী বিদায় নিয়েছিল, 'Let go my hand. Do not touch me. I must be free.' ইংরাজিতে সন্ন্যাসী ও বালিকার সম্পর্কের রূপায়ণ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে সংলাপের বহু অংশ বর্জিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বালিকার বারবার দেখা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মৃতা বালিকার কাছে সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্তন করেছিল। কিন্তু ইংরাজি রূপান্তরে বালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারপর ক্রমাগত সন্ন্যাসী বালিকাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। বালিকার জন্য সন্ন্যাসীর উৎসুক অনুসন্ধান মূল রচনায় ছিল, নবরূপান্তরে কিন্তু তৃতীয় দৃশ্য থেকে সেই অনুসন্ধানই প্রাধান্য পেয়েছে। তার এই অনুসন্ধান সোনার তরীর পরশ পাথর কবিতার খ্যাপার কথা স্মরণ করায়। একদিনের জন্য সে অকস্মাৎ প্রেমের পরশ পাথর পেয়েছিল যার স্পর্শে তার

সন্ন্যাসের শিকল সোনা হয়েছিল ; সেই পরশ পাথরকে সে তখন চেনে নি, এখন সমস্ত জীবন ধরে সেই পরশ পাথরের সন্ধানে সে পুনরায় রত। প্রকৃতির প্রতিশোধে বালিকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ইংরাজি রূপে সন্ধানরত সন্ন্যাসী এক নারীর মুখে বালিকার মৃত্যু সংবাদ শুনেছে।

নাটকে প্রধান চরিত্র দুইটি মাত্র—সন্ন্যাসী এবং বালিকা। কিন্তু এদের চারিদিকে, এদের সম্পর্কের দ্বিধাকে পরিস্ফুট করার জন্য যে প্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলির সমাবেশ মূল নাটকে করা হয়েছিল এদের সংখ্যা নানা উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি রূপান্তরে কমিয়ে এনেছেন। এই চরিত্রগুলি অধিকাংশই পথিক, পথ দিয়ে যেতে যেতে এরা কখনও সন্ন্যাসী বা বালিকার সঙ্গে কথা বলে, কখনও নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে যায়। কোন কোন চরিত্রের সংলাপ বর্জন করে সেই চরিত্রকে নাটক থেকে রবীন্দ্রনাথ বহিষ্কৃত করেছেন। যেমন, দ্বিতীয় দৃশ্যে স্ত্রীলোকদের সংলাপ বর্জিত হওয়ায় সেই স্ত্রীলোকেরা আর মঞ্চে প্রবেশের অধিকার পায় নি। ভিক্ষুকের গান বাদ, সুতরাং ভিক্ষুক চরিত্রও নবরূপান্তরে পরিত্যক্ত। আর এক কৌশলে স্বাতন্ত্র্যহীন চরিত্রবাহুল্য হ্রাস করা হয়েছে। যেখানে মূলে ছিল 'কতকগুলি পথিকের প্রবেশ' সেখানে রূপান্তরে হয়েছে 'Enter three villagers', যেখানে 'একদল মালিনীর প্রবেশ' ছিল সেখানে পরিবর্তে 'Enter two flower-girls singing', যেখানে মূলে 'একদল সৈনিক' ছিল সেখানে হয়েছে 'Enters a soldier' এবং যেখানে আদিতে 'কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ' ছিল সেখানে রূপান্তরে 'A mother enters with two children'.

টমসন প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'the original is a swamp of declamation ; everyone makes long speeches.' টমসন বাড়িয়ে বলেছেন, সকলে নয়, মূল নাটকে মাত্র সন্ন্যাসীই দীর্ঘ ভাষণ উচ্চারণের অধিকার পেয়েছিল। এই দীর্ঘ একোক্তি, স্বগতোক্তি এবং সংলাপগুলি নাটকের গতির পক্ষে বাধা ছিল এবং সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব তার কার্যকলাপের সাহায্যে রূপায়িত হয় নি, এই দীর্ঘায়িত ভাষণগুলির সাহায্যে উক্ত হয়েছে মাত্র। লেখনীকে নির্মম ছুরিকার মতো ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘ ভাষণগুলিকে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের সীমায় এনে নাটকের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন। টমসন উল্লেখ করেন নি—আর একদিক থেকেও সন্ন্যাসীর ভাষণগুলি রূপান্তরে অধিক নাটকীয় গুণ অর্জন করেছে। মূল নাটকে সন্ন্যাসীর সমস্ত উক্তি, কখনও কখনও বালিকার উক্তি অমিল পয়ারে

লেখা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অমিল পয়ারে নিবদ্ধ উক্তিগুলিকে যদিও বা সহ্য করা যায়, দীর্ঘ ভাষণে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। কারণ পয়ারে নাট্যগতি এবং নাটকীয় সংঘাত বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ধারণের উপযুক্ত ক্ষমতা নেই, এই ছন্দে পাঁচালী লেখা যায়, নাটক লেখা যায় না। Sanyasi or The Ascetic-এ এই অমিল পয়ারে লেখা সন্ন্যাসীর দীর্ঘ ভাষণগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় যেমন, তেমনি পয়ার গদ্যে রূপান্তরিত হওয়ায় নাটকীয়তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। গদ্যে রূপান্তরিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ভাষণগুলি স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যে এসেছে এবং নাটকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়েছে।

শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।
কখনো বা কোনদিন কে জানে কেমনে
একটি আলোকরেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি। (১)

Water oozes and drips from the cracks, and in the pools float the ancient frogs. I sit chanting the incantation of nothingness. (I).

আবার দেখি সংক্ষিপ্ত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ নূতন ইমেজ বা বক্তব্য রূপান্তরে এনেছেন যা মূলে ছিল না। যেমন নিম্নোদ্ধৃত অংশের ইংরাজি রূপান্তরে পার্বত্য হ্রদের ইমেজটি নূতন এসেছে।

আঁধার গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদিকালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছি। (১)

In this dark cave I am alone, merged in myself, and the eternal night is still, like a mountain lake afraid of its own depth. (I)

টমসন বলেছেন, 'The best things, dramatically, in Nature's Revenge, are the conversations on the road, which are full of simple obvious humour'। রবীন্দ্রনাথ তর্জমাকালে সাধারণ মানুষের এই সহজ সরস উক্তিগুলি বর্জন করেছেন বলে টমসন অভিযোগ করেছেন। তিনি আরিস্টফানেসের The Frogs-এর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, এই জাতীয় রসিকতা পাশ্চাত্য পাঠক গ্রহণ করবে না, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি এই হিউমার বর্জন করে থাকেন তাহলে তিনি ভুল করেছেন। মনে হয় স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির সরসতা বর্জন করেন নি, সেগুলি বর্জিত হয়েছে ভাষাগত কারণে। এক ভাষার মৃত্তিকার স্পর্শময় লোকমুখের সজীব হিউমার অন্যভাষায় রূপান্তরিত করা সহজ নয়। এই ভাষাগত কারণই মূলের হিউমার অনুপাতে বিবর্ণ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। ফলে শুধুমাত্র যে হিউমার সজীবতা হারিয়েছে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই সরস লোক-যাত্রার অংশগুলি নাটকের মূল ভাবের সঙ্গে বাস্তব জীবনের যে সেতুবন্ধ রচনা করেছিল সেই সেতুও দুর্বল হয়ে গেছে।

## (ঙ) মালিনী : Malini

টমসন মালিনীর ইংরাজি তর্জমা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন, 'It is translated fairly faithfully, except that its long beautiful speeches are cut down, and the first scene's opening, in which Malini receives the sage Kasyapa's last instruction, is omitted.' কিন্তু কাশ্যপ চরিত্র শুধু বর্জিত হয় নি, রূপান্তরকালে আরো নানা তাৎপর্যপূর্ণ বর্জনকর্ম রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এই বর্জনব্যাপার বা দীর্ঘ উক্তিগুলির সংক্ষিপ্তকরণই মালিনীর এই নবরূপান্তরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। মালিনী মূলে প্রবহমান পয়ার বা সমিল ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখিত হয়েছিল, কিন্তু ইংরাজি রূপান্তরকালে সংলাপগুলি গদ্যে লিখিত হয়েছে। এমনিতেই বাংলা তথা ভারতীয় ভাষা অলংকারকে বেশি প্রশ্রয় দেয়, তারপর মালিনী মূলে পদ্যছন্দের বন্ধে লিখিত হওয়ায় কাব্যসুলভ অলংকারে সেই নাটকের সংলাপ অলংকৃত ছিল। এই অলংকৃত ভাষণগুলিকে

ইংরাজিতে অনুবাদ করতে যেয়ে দুই রকম অসুবিধা হয়েছে। যেখানে মূলের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়েছে সেখানে ইংরাজি সংলাপগুলিকে বিজাতীয়ভাবে অলংকৃত মনে হয়, যেমন

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মদলে। (১)

The moment has come for me, my life, like the dewdrop upon a lotus-leaf, is trembling upon the heart of this great time. (I)

অপরপক্ষে মূলের অলংকৃত ভাষাকে অনুসরণ করে যেখানে মূলের ভাবটিকে মাত্র ইংরাজি তর্জমায় প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ভাষা মূলের সৌন্দর্য ব্যঞ্জনা অনুষঙ্গ সব হারিয়ে নিতান্ত দীনদরিদ্র ও নির্জীব হয়ে গেছে।

হে দেবী তোমারি জয়। নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জ্বালায়েছ, আজি হলো পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুরাঘাত করিনু গ্রহণ।
রক্ত উচ্ছ্বসিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে—তবু সমুজ্জ্বল
তব শান্তি, তব প্রীতি, তব সুমঙ্গল
অম্লান-অচল-দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হলো আজ,
জয় দেবী। ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার। (৪)

All these hurts and insults I accept in your name, my lady. Kemankar, you are paying your life for your faith,—I am paying more. It is your love, dearer than my life. (II)

সুতরাং এই ভাষান্তরে, কখনও অতি-অলংকারদোষে কখনও অলংকার-বর্জিত দ্যুতিবর্জিত দারিদ্র্যের দোষে মূলের তুলনায় সংলাপ দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত, অথচ বিনিময়ে কোন নূতন সৌন্দর্য অর্জন করতে পারে নি।

আর একটি গুরুতর পরিবর্তন দৃশ্যসমূহের পুনর্বিন্যাসে। মালিনী নাটকে চারটি দৃশ্য ছিল, Malini-তে সেই চারটি দৃশ্য ঐক্যলাভ করে দৃশ্যবিভাগহীন দুইটি অঙ্কে পরিণত হয়েছে। মালিনীর প্রথম তিনটি দৃশ্যের সমন্বয়ে এই রূপান্তরে অবিচ্ছিন্ন প্রথম অঙ্ক রচিত হয়েছে এবং মূলের চতুর্থ দৃশ্য ইংরাজি রূপান্তরে পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে। বাংলা রূপে যেখানে প্রথম দৃশ্যের যবনিকা নেমে এসেছে সেখানে ইংরাজি রূপে মঞ্চনির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'They all go out' এবং পরক্ষণেই 'Enter a crowd of Brahmins, in the street, before the palace balcony.'। আবার যেখানে দ্বিতীয় দৃশ্যের যবনিকাপাত হওয়ার কথা সেখানে 'They ( অর্থাৎ ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ) go' এবং তারপরেই 'Enter the king with the Prince, on the balcony'। এইভাবে দুইবার যবনিকাপাতের প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ তিনটি দৃশ্যকে একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত করেছেন এবং ফলে নাট্যগতি তীব্রতর হয়েছে, অবাধগতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মালিনীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন সে কথা স্মরণযোগ্য। মালিনীর ইংরাজি অনুবাদ পড়ে কবি ও গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ ট্রেভেলিয়ান বলেছিলেন 'এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন।' গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে মালিনীর সাদৃশ্য কোথায় এ কথা চিন্তা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই মন্তব্য করেছেন, 'মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' যদিও ট্রেভেলিয়ানের এই মন্তব্য মালিনী সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে উক্তিটি করা হয়েছিল মালিনীর ইংরাজি রূপ সম্বন্ধে এবং বস্তুত গ্রীকনাট্যের দেশগত ঐক্যের সাদৃশ্য মেলে ইংরাজি মালিনীতে তুলনায় বেশী—যেখানে 'রাজ-অন্তঃপুর' 'মন্দির প্রাঙ্গণ', 'অন্তঃপুরের' তিনটি দৃশ্য একত্রিত হয়ে একই দৃশ্য পটভূমিকায়—'The Balcony of the palace facing the street' —অভিনীত হয়েছে। চতুর্থ দৃশ্য ঘটেছে 'রাজ-উপবনে', ইংরাজি মালিনীরও দ্বিতীয় অঙ্ক 'The Palace Garden'-এ অভিনীত হয়েছে। স্থানগত দিক থেকে এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যের বেশী দূরত্ব নেই। তাই এই নাটকে দেশগত ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু কালগত ঐক্য বাংলা মালিনীতে যেমন

অনুপস্থিত, ইংরাজি মালিনীতেও তেমনি অনুপস্থিত। কালগত ব্যবধান ঘটেছে বাংলায় তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে, ইংরাজিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে। এই কালগত ব্যবধানের প্রমাণ মালিনী চরিত্রের পরিবর্তনে। শুধুমাত্র স্থানগত নৈকট্যের জন্য নয়, এই কালগত সান্নিধ্যের জন্যও রবীন্দ্রনাথ মালিনীর প্রথম তিনটি দৃশ্যকে Malini-তে একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্কে রূপান্তরিত করেছিলেন।

ইংরাজি মালিনীর প্রারম্ভে কাশ্যপ চরিত্রকে বর্জনের কথা টমসন উল্লেখ করেছেন। অনেক কিছু টমসন উল্লেখ করেন নি, যেমন প্রথম দৃশ্যের শেষে সেনাপতি চরিত্র বর্জন। মালিনীতে রাজ-উপবনে মালিনী ও সুপ্রিয়ের কথোপকথনে নির্বাক পরিচারিকাবর্গ, উপস্থিত ছিল, কিন্তু একদল নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় রমণীকে সমগ্র দৃশ্য ধরে মঞ্চে উপস্থিত রাখার বাস্তবিক অসুবিধার জন্য হোক, বা অনাত্মীয় যুবকযুবতীর কথোপকথনকালে অন্য লোকের উপস্থিতির প্রয়োজন ইংরাজি তর্জমাকালে অনুভব না করার জন্য হোক, এই 'পরিচারিকা-বর্গ' ইংরাজি রূপে গৃহীত হয় নি। এতদ্ব্যতীত অনেক উক্তি এবং দীর্ঘ উক্তির অংশও বর্জিত হয়েছে। মূল মালিনীর প্রথম দৃশ্যে মহিষী ও মালিনীর কথোপ-কথনকালে মহিষীর পিতার দারিদ্র্যের সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিত্যক্ত হয়েছে রূপান্তরে। এই দৃশ্যেই মালিনীর 'আমি স্বপ্ন দেখি জেগে' ইত্যাদি দীর্ঘ ভাষণের শেষাংশ—

রাজকন্যা আমি, দেখি নাই<br>
বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই<br>
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,<br>
আমাকে কে করে দেয় ঘরের বাহির<br>
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,<br>
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ<br>
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী<br>
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি। (১)

তর্জমাকালে গ্রহণ করা হয় নি। মালিনীর তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে পাই প্রথমে মহিষীর প্রবেশ, ও মালিনীকে অনুসন্ধানের পর প্রস্থান, অতঃপর যুবরাজ-সহ রাজার প্রবেশ এবং পরে মহিষীর পুনঃপ্রবেশ। কিন্তু ইংরাজি তর্জমায় মহিষীর প্রথম প্রবেশ ও তৎকালীন সংলাপ পরিত্যক্ত হয়েছে। ইংরাজি রূপে বাদ পড়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সংলাপ। যেমন ব্রাহ্মণগণের

সঙ্গে মালিনীর প্রত্যাবর্তনের 'সৌন্দর্যময় ছবি' সম্ভবত বর্জিত হয়েছে, ভারতীয় পুরাণকাহিনী বিষয়ে পাশ্চাত্য পাঠকের অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিতে যেয়ে।

সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে উর্মিদল সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা। (৩)

তৃতীয় দৃশ্যের শেষে স্বেচ্ছানির্বাসিত মালিনীকে পুনরায় লাভ করে মালিনীর মঙ্গলের জন্য মহিষী-কর্তৃক 'বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণের' নিকট ত্রিশ-চরণ ব্যাপী প্রার্থনাও রূপান্তরকালে অগ্রাহ্য হয়েছে। রাজকন্যার সঙ্গে পুরস্কারস্বরূপ সুপ্রিয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে পীড়িত সুপ্রিয় 'ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও হে রাজন' বলে রাজাকে বাধা দিয়েছে। এই প্রস্তাবকালে যে স্বগতোক্তির মধ্যে ধর্মানুপ্রাণিতা মালিনীর প্রেমিকা রমণীতে রূপান্তরের প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাই সেই স্বগতোক্তিটি—

ওরে রমণীর মন,
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায়? (৪)

বর্জিত হয়েছে। সুপ্রিয় ও মালিনীর অনুরোধে রাজা ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে স্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল 'কিন্তু তার পূর্বে একবার দেখিব পরীক্ষা করি বীরত্ব তাহার'। কিন্তু এই পরীক্ষার প্রস্তাব ইংরাজি তর্জমায় রাজাকে করতে দেখি না। ক্ষেমংকরের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে সুপ্রিয় মালিনীকে বলেছিল 'হে দেবী, তোমারি জয়'। সুপ্রিয়ের এই উক্তি ভাষান্তরকালে অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু ক্ষেমংকর লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা আঘাত করার পর মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে মূল রচনায় সুপ্রিয় যে পুনরায় বলেছিল 'দেবী তব জয়', সেই মৃত্যু-কালীন উক্তিটি নিষ্কারণে ইংরাজি রূপে পরিত্যক্ত হয়েছে।

দীর্ঘ উক্তিগুলিকে হ্রস্বকায় করার কথা টমসন বলেছেন। কী কৌশলে এই দীর্ঘ উক্তিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে উদাহরণের সাহায্যে পূর্বে দেখিয়েছি। সংক্ষিপ্ত করতে যেয়ে মূলের অনেক কথা বাদ পড়ে যায়, অনেক

অনুষঙ্গ হারিয়ে যায়। কিন্তু যেমন হারায়, তেমনি কখনও কখনও অনুবাদে নূতন ব্যঞ্জনার আবির্ভাব হয়—যদিও এমন নিদর্শনের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম।

মোরা ব্রাহ্মণ সমাজে
একত্রে মিলেছি সবে ধর্মরক্ষা কাজে
তুমি কোথা হতে এসে মাঝে দিলে দেখা
অতিশয়-সুনিপুণ বিচ্ছেদের রেখা—
সূক্ষ্ম সর্বনাশ। (২)

We have united in defence of our faith, and you come like a subtle rift in the wall, like a thin smile on the compressed lips of contempt. (I)

## (চ) বিসর্জন : Sacrifice

১৮২০ সালে বিসর্জন লেখা, তাকে Sacrifice-এ রূপান্তরিত করা হয় ১৯১৭ সালে। দীর্ঘ ব্যবধানে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যেমন হয়, 'His translation, as usually, can amalgate different scenes, omitting long intermediate passages, not only without loss but with great gain' বিসর্জন থেকে Sacrifice-এ রূপান্তরকালে মূলের অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ পরিত্যাগ করে নাট্যকাহিনী নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের যোগ করে নাট্যকাহিনীতে কিভাবে নিরবচ্ছিন্নতা দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যায়। ৩।৫ দৃশ্যের শেষে বন্দী রঘুপতিকে দেখিয়ে গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদের বলেছিল, 'নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে' এবং ৪।১ দৃশ্যের সূত্রপাতে গোবিন্দমাণিক্য বিচারসভায় রঘুপতিকে প্রশ্ন করেছিল, 'আর কিছু বলিবার আছে?' এক দৃশ্যের শেষ এবং অন্য দৃশ্যের আরম্ভকে যুক্ত করা হয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের দুইটি উক্তিকে একটি উক্তিতে পরিণত করে।

Govind. Make them prisoners. (To Raghupati) Have you anything to say ?

জয়সিংহের আত্মবলির পরে ৫।১ দৃশ্যের শেষে রঘুপতি 'প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া' বলেছে 'ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!' এবং ঐ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমেই রঘুপতির সংলাপ পাই—

দেখো দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! ( ৫।৪ )

এই দুইটি স্বতন্ত্র উক্তিকে এককালীন উক্তি করায় বিচ্ছিন্ন দৃশ্য দুইটি অবিচ্ছিন্ন হয়েছে। রঘুপতি বলেছে,

(Beating his forehead on the temple floor) Give him, give him back to me! (Stands up addressing the image) Look how she stands, deaf, dumb, blind···

এই নিরবচ্ছিন্নতার প্রয়োজনে এবং অবান্তরকে বর্জন করে মূল নাট্য-কাহিনীকে দ্রুত সরল লক্ষ্যে ধাবিত করার প্রয়োজনে, মূলের অনেকগুলি দৃশ্য রূপান্তরকালে বর্জিত হয়েছে। ৩।১ দৃশ্যে যেখানে প্রত্যক্ষত দেবীকে বিমুখ করিয়ে রঘুপতি প্রজাদের উত্তেজিত করেছিল, মাকে ফেরানোর জন্য প্রজারা রাজার কাছে আবেদন করেছিল এবং গুরুর প্রতি জয়সিংহের অবিশ্বাস প্রবলতর হয়েছিল—সেই দৃশ্যটি বর্জিত হয়েছে। রঘুপতির মিথ্যাচারের এই অন্যতম প্রমাণ পরিত্যক্ত হওয়ায় রঘুপতির মহিমা ইংরাজি রূপান্তরে কম খর্ব হয়েছে। ৩।২ দৃশ্যও পরিত্যক্ত যেখানে প্রজাদের বিদ্রোহের কুমন্ত্রণায় ও মোগল-আক্রমণের কথা আছে, নক্ষত্র রায়কে যেখানে গোবিন্দমাণিক্য সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে 'আমারে মারিবে তুমি' এবং নক্ষত্র অনুতাপ করেছে। ৪।৩ দৃশ্যও রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে, যেখানে পদচ্যুত নয়নরায় প্রত্যাবর্তন করে এসেছে; মোগলের সঙ্গে নক্ষত্রের যোগদানের সংবাদ জানা গেছে; নক্ষত্র কর্তৃক লিখিত চিঠির কাহিনীটিও তাই নেই। ৫।২ দৃশ্যও রূপান্তরে নেই, যে দৃশ্যে ছিল তার নির্বাসনে নগরীর আনন্দোৎসবে রাজার বেদনা, গুণবতী কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যকে নিজ মতে আনার শেষ চেষ্টা। প্রজাবিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণের উপকাহিনী ইংরাজি রূপান্তরে বর্জিত বলে রাজার স্বেচ্ছানির্বাসনের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিকবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই অঙ্কের ক্ষুদ্র তৃতীয় দৃশ্যটি যেখানে রানীর পূজার জন্য প্রস্তুতির কথা আছে, সেটিও রূপান্তরে অগ্রাহ্য হয়েছে। এ ছাড়া মূলের দুইটি দৃশ্যের বিন্যাসক্রম রূপান্তরকালে বিপরীত হয়েছে।

মূলের যে সব দৃশ্য রূপান্তরকালে ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছে সেগুলিরও নানা অংশ রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনমত বর্জন করেছেন। ১।৩ দৃশ্যে রঘুপতির প্রবেশের পূর্বে জয়সিংহ-অপর্ণার দীর্ঘ সংলাপাংশ বর্জিত, যেখানে

অপর্ণা জয়সিংহকে বলেছিল, 'কাঙাল যে জন তাহারো কাঙাল তুমি'; এবং প্রথম দৃশ্যের

অপর্ণা ॥ তুমি তো নিষ্ঠুর নহ—আঁখিপ্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এসো তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষমো মোরে
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

জয়সিংহ ॥ (প্রতিমার প্রতি) তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে। ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

গোবিন্দমাণিক্য ॥ (জনান্তিক হইতেই) যেথা আছে প্রেম। (১।২)
ইত্যাদি বর্জিত হওয়ায় অপর্ণা কর্তৃক রক্তাক্ত মন্দির ছেড়ে জয়সিংহকে প্রেমে নেবার আহ্বান, তাদের মধ্যে প্রেমের পরিস্ফুটন বিলম্বিত হয়েছে।

বিসর্জন সম্বন্ধে বলতে যেয়ে টমসন বলেছেন, 'Shakespearian drama has bequethed some conventions of very doubtful value, which Rabindranath took over.' এইরূপ একটি 'convention' হলো শেকসপীয়ারের জনতাদৃশ্য, যার সঙ্গে তুলনীয় বিসর্জনের 'talk of villagers'। গ্রামবাসীদের এই সংলাপ, যা টমসনের কাছে 'dull' এবং 'bucolic chatter' বলে মনে হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে রূপান্তর-কালে বর্জন করেছেন—জনসাধারণের ভাষার তর্জমার অসুবিধার জন্য হোক, কিংবা সর্বপ্রকার অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন করে নাটকীয় ঐক্য অর্জনের জন্য হোক। ১।৫ দৃশ্যে রঘুপতি যেখানে সেনাপতি নয়নরায়কে রাজদ্রোহের পরামর্শ দিচ্ছে তার পূর্বে 'একদল লোকের প্রবেশ' ও তাদের কথোপকথন বর্জিত। রঘুপতি ও নয়নের সংলাপের পর পুরবাসীদের প্রবেশ ও দীর্ঘ সংলাপ আছে, তা প্রায় সর্বাংশে পরিত্যক্ত হয়ে কখনও কালীর প্রতি জয়ধ্বনি 'Victory to Mother' এবং গুণবতী বলিসহ পূজা পাঠিয়েছেন শুনে রানীর প্রতি জয়ধ্বনি 'Victory to our Queen'-এ পরিণত হয়েছে। অবশ্য পুরবাসীগণের কালীবন্দনা গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' অনুবাদে গৃহীত হয়েছে। ২।৪ দৃশ্যে যেখানে চাঁদপাল নক্ষত্র রায় কর্তৃক রাজহত্যা তথা ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ এনেছে

তার পূর্বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত জনতার সংলাপ ও তর্জমাকালে ব্যবহৃত হয় নি। যেখানে রঘুপতি দেবীপ্রতিমাকে পিছন ফিরিয়ে প্রজাদের কাছে প্রমাণ করেছিল দেবী তাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন সেই ৩।১ দৃশ্য বর্জিত হওয়ায় উক্ত দৃশ্যে প্রজাগণের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাও অনুবাদে অগ্রাহ্য হয়েছে। ২।৩ দৃশ্যে যখন দ্বিধাগ্রস্ত জয়সিংহ নিজেকে সম্বোধন করে জনান্তিকে বলেছিল 'দূর হোক চিন্তাজাল' এবং নিশিপুরের সানন্দ মেলাযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছিল তখন শুধু 'আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে' গানটি রূপান্তরে বর্জিত হয় নি, 'দূরে অপর্ণার প্রবেশ' হলে অপর্ণার প্রতি তার দীর্ঘ উক্তিটিও বর্জিত হয়েছে। এই দৃশ্যে রঘুপতির কথায় জয়সিংহ ভালবাসার জন অপর্ণাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, 'চলে যা অপর্ণা'। এই অংশ অনুবাদে গৃহীত না হওয়ায় অপর্ণার সঙ্গে রঘুপতির দ্বন্দ্ব যে শুধু বিশ্বাসের নয়, জয়সিংহের ভালোবাসা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে সেই দ্বন্দ্বকে তীব্র করেছে সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অথচ আদর্শগত বিরোধে জয়সিংহ গুরুর কাছ থেকে যেমন দূরে সরে গেছে, তেমনি অপর্ণাকে যতই রঘুপতি বিতাড়িত করতে বলেছে ততই অন্যদিক থেকেও জয়সিংহ রঘুপতির কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ৩।৪ দৃশ্যে জয়সিংহ-অপর্ণার কথোপকথন রূপান্তরে অনেক সংক্ষিপ্ত। এই দৃশ্যে অপর্ণার সঙ্গে শেষ সংলাপে জয়সিংহ যেমন ইঙ্গিতে অপর্ণার নিকট হতে বিদায় নিয়েছিল, তেমনি বিদায় নিয়েছিল, পরমরমণীয় পৃথিবীর নিকট হতে। অপর্ণার মুখের দিকে যেমন, পৃথিবীর দিকে তেমন পরম মমতায় তাকিয়েছিল জয়সিংহ শেষবারের মতো।

> আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
> শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রি জাগরণে যেন
> পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
> ঘুম ভারে! সুন্দর জগৎ! (৩।৪)

এই সুন্দর জগৎ থেকে চিরবিদায়ের বেদনার ভাব রূপান্তরে নেই। ফলে যে ক্ষতি হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরে পূজা বন্ধ করার জন্য রাজা সেনাপতি নয়নকে আদেশ দিলে রাজানুগত্য ও নিজ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সৈনাপত্য ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল নয়ন রায়, গোবিন্দমাণিক্য-নয়নরায়ের কথোপকথনকালে চাঁদপালের উক্তিগুলি রূপান্তরকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। ৪।১ দৃশ্যের শেষে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত নয়ন রায় স্বদেশে ফিরে এসে চাঁদপালের বিশ্বাসঘাতকার ও মোগলপক্ষে তার যোগদানের

খবর দিয়েছিল রাজাকে—এই অংশও অনুবাদে বর্জিত। ১।৪ দৃশ্যে গুণবতীর সমস্ত অনুরোধ আবেদন ও অভিমানকে রাজা উপেক্ষা করলে গুণবতী যে স্বগতোক্তিতে নিজেকে ধিক্কৃত করেছিল, 'ধিক, কী সোহাগে পুত্রহীনা পতিরে জানায় অভিমান,' সেই স্বগতোক্তি ইংরাজি রূপান্তরে পাই না। অথচ এই স্বগতোক্তি বিনা রানীর আচরণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। গুণবতীর ধারণা পুত্রহীনা বলেই সে অবজ্ঞাত, ফলে পুত্রলাভের বাসনা তার দ্বিগুণ হয় এবং বলিদানের দ্বারাই পুত্রলাভ করা যাবে, রঘুপতির এই উক্তি স্মরণ করে বলিদানে সে আরো বেশী আগ্রহ অনুভব করে এবং বলিদানে সে যতই আগ্রহ দেখায় ততই স্বামীর থেকে সে দূরে সরে যায় এবং স্বামীর থেকে মানসিক দূরত্বের প্রকৃত কারণ বুঝতে না পেরে পুনরায় সে তার বন্ধ্যাত্বকেই দায়ী করে। এই এক পাপচক্রে গুণবতী বন্দিনী।

বিসর্জনের সঙ্গে Sacrifice-এর একটি প্রধান ব্যতিক্রম কালগত। রাজর্ষির দীর্ঘ কালসীমা বিসর্জনে সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিসর্জনের সংক্ষিপ্ত কালপরিধি Sacrifice-এ সংক্ষিপ্ততর হয়েছে। রঘুপতি জয়সিংহকে শপথ করিয়েছিল—

বল তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষরাত্রে দেবীর চরণে।' (২।৪)

কিন্তু ইংরাজিতে Raghupati বলেছে, 'Say, I will bring kingly blood to the altar of the Goddess before it is midnight.'

বন্দী রঘুপতি মূলে দুইদিন সময় চেয়েছিল গোবিন্দমাণিক্যের কাছে, কারণ শ্রাবণের শেষরাত্রির এখনও দুইদিন বাকি।

আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড় করে
নতজানু আজি আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে— দুই দিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। (৪।১)

ইংরাজি রূপান্তরে আজ 'midnight'-এ কার্য সমাধা করতে হবে তাই একদিন মাত্র সময়ের প্রার্থনা।

I am a Brahmin. Your caste is lower than mine.
Yet, in all humility, I pray to you, give me only one day's time.

এখানে অনুবাদগত একটি কৌতূহলের বিষয় লক্ষ্য করি। রঘুপতি চেয়েছিল জয়সিংহ ধর্মদ্রোহী গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করে তার রক্ত আনুক

তাই তার কাছে 'রাজরক্ত'-এর অর্থ রাজার রক্ত—সুতরাং রঘুপতির উক্তির অনুবাদে রাজরক্তের প্রতিশব্দ হওয়া উচিত ছিল King's blood', 'Kingly blood' নয়। 'রাজরক্ত' বলায় দ্ব্যর্থতাজনিত কারণে, রঘুপতির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হলেও, জয়সিংহ যখন নিজদেহের রাজবংশীয় রক্ত দিয়ে শেষে পূজা করে তখন জয়সিংহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কিন্তু 'রাজরক্তের' অনুবাদ যদি রঘুপতির উদ্দেশ্য বিবেচনায় King's blood করা হতো তা হলে জয়সিংহ নিজরক্তে পূজা সম্পন্ন করলে সত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতো না। সেই কারণে রঘুপতির উদ্দেশ্য স্পষ্টতই King's blood হলেও তার উক্তিতে 'রাজরক্তের' অনুবাদ করতে হয়েছে 'Kingly blood'—নাটকের প্রয়োজনে দ্ব্যর্থতা বজায় রাখার জন্য। মনে হয় এখানে 'রাজরক্তের' প্রতিশব্দ হিসাবে royal blood ব্যবহার করলে অধিকতর সংগত হতো। আবার যখন রানীর উক্তি—

> করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
> বর্ষে বর্ষে দিব তারে, এক-শো মহিষ
> তিনশত ছাগ। (১।১)

অনুবাদ হয়, 'My offering are already on their way to the temple,—the red bunches of hibiscus and beasts of sacrifice' তখন মূল উক্তির ড্রামাটিক আয়রনি নবরূপায়ণে হারিয়ে যায়। যে রমণী মাতৃত্বকামনায় উন্মুখ সে কিনা সন্তান লাভের জন্য পশুমাতার সন্তানবধে কুণ্ঠাবোধ করে না—এই ঘটনার মধ্যে যে নাটকীয় পরিহাস ছিল তাই ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার আর্তনাদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং সেই পরিহাসই উদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে আভাসিত হয়েছিল। কিন্তু তর্জমাকালে 'মা যদি সন্তান দেন' এই বাক্যাংশ গৃহীত না হওয়ায় রূপান্তরে সেই পরিহাসের আভাস অনুপস্থিত।

রাজা পরবর্তীকালে স্বীকার করেছে, রানীর পূজা মন্দির থেকে যে ফিরে এসেছে তার দায়িত্ব নিজের। কিন্তু ইংরাজি তর্জমায় সেই স্বীকারোক্তির পূর্বে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে রাজা বলিসহ রানীর পূজাকে বিমুখ করার আদেশ নিজেই দিচ্ছেন। ১।২ দৃশ্যের শেষে বলি বন্ধ করার আদেশ জারি হওয়ার পর কয়েকটি নূতন বাক্য যা মূলে ছিল না তা যোগ করা হয়েছে এই কারণে।

> Minister. But sire, the Queen has offered her sacrifice for this morning's worship; it is come near the temple gate.

Govind. Send it back.

অন্যত্রও কিছু সম্পূর্ণ নূতন লেখার নমুনা পাই। ৩।৩ দৃশ্যে যেখানে গুণবতী ধ্রুবকে হত্যার জন্য নক্ষত্রকে প্ররোচিত করেছে, যেখানে কিছু সংলাপ নূতন করে লেখা এবং ঐ অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে নিদ্রিত ধ্রুবকে হত্যার জন্য মন্দিরে নিয়ে আসার পর রঘুপতি ও নক্ষত্রের সংলাপের কোন কোন বাক্যও সম্পূর্ণ নূতন রচনা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। টমসন বলেছেন বিসর্জনের দুইটি 'underplot'—একটি 'talk of villagers', অপরটি 'the Queen's desire to remove Dhruba'—'both of which the poet has omitted from his English version.' কিন্তু কই ধ্রুবর উপকাহিনী তো বর্জিত হয় নি। সম্ভবত এই কথা লেখার মুহূর্তে টমসনের কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মরণ ঘটেছিল।

টমসন বিসর্জনের দুর্বলতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'But the chief fault of Sacrifice is excessive declamation. A great deal of this the poet's maturer judgemant evidently condemned, for it disappears from the English.'। কীভাবে এই জাতীয় দীর্ঘ উক্তিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতা ইংরাজি রূপান্তরে পরিহার করার চেষ্টা করেছিলেন, নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে।

আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণে আনন্দের প্রথম হাসিটি। (১।১)

**…and here I am, the Queen, with all the world lying at my feet, hankering in vain for the baby-touch at my bosom, the stir of a dearer life within my life.**

যেখানে নাটকীয় আবেগের চাপ নেই, অনুভূতির কোন অতলস্পর্শী তীব্রতা নেই, সেখানে বিসর্জন নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিবদ্ধ সংলাপের ভাষা Sacrifice-এ গদ্যে রূপান্তরিত হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নি। যেখানে আবেগ তীব্র, ঘটনাবর্তের চাপ যেখানে প্রখর, অনুভূতির গভীরতা যেখানে অনুভূতির প্রকাশকে সমুন্নতি দান করে, সেখানে বিসর্জনের ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবধ্বনিতরঙ্গ সঞ্চার করতে পেরেছেন তা Sacrifice-এর গদ্যে রচিত সংলাপের ভাষায় অনুপস্থিত। রঘুপতির বিখ্যাত উক্তিটির মূল রূপ এবং তার গদ্য রূপান্তর পাশাপাশি রাখলে এই বক্তব্যের সত্য স্বতঃপ্রকাশ হবে। মূল উক্তিটি যে রেটরিক বা ভাষণজাতীয় উক্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই রেটরিক এলিজাবেথীয় নাটকের রেটরিকের মতো প্রয়োজন-বিবেচনায় অত্যন্ত সংগত হয়েছে।

তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা কেবা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহাহত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কী জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে

উধ্বর্শ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম মুহূর্তে দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিনী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—( ২।১ )

Then come and learn your lesson once again from me. Sin has no meaning in reality. To kill is but to kill, —it is neither sin nor anything else. Do you know that the dust of this earth is made of countless killings? Old time is ever writing the chronicle of the transient life of creatures in letters of blood. Killing is in wilderness, in the habitations of man, in bird's nests, in insect's holes, in the sea, in the sky; there is killing for life, for sport, for nothing whatever. The world is ceaselessly killing; and the great Goddess Kali, the spirit of ever-changing time, is standing with her thirsty tongue hanging down from her mouth, with her cup in hand, into which is running the red life-blood of the world, like juice from the crushed cluster of grapes.

রাজর্ষিতে রঘুপতির 'আর এক শিক্ষা' দেবার যে উক্তি আছে জয়সিংহের উদ্দেশে, Sacrifice-এর এই উক্তিটি তাকে অর্থের দিক থেকে অনুসরণ করে নি, অনুসরণ করেছে বিসর্জনের উক্তিটিকে। কিন্তু রাজর্ষি এবং Sacrifice-এ উক্তিটি গদ্যে লেখা হওয়ায় বিসর্জনের তরঙ্গিত অমিত্রাক্ষরে যে আবেগের তীব্রতা তা বাংলা রাজর্ষিতে বা ইংরেজি Sacrifice-এ নেই। রাজর্ষিতে 'হত' শব্দটির পুনরুক্তি হয়েছে বটে, Sacrifice-এ 'killing' শব্দটি পুনঃপুনঃ কয়েকবার ব্যবহার পাই কিন্তু বিসর্জনে 'এ জগৎ মহাহত্যাশালা' বলার পর 'হত্যা' শব্দটির পৌনঃপুন্যে যে উচ্চারণধ্বনিগত আঘাত ছুরিকাঘাতের মত ভাষণটিকে খচিত করে এবং আবেগপ্রখর করে তার তুলনা রাজর্ষি-রূপে বা Sacrifice-রূপে নেই। বিসর্জনের উক্তিটির Sacrifice-এ রূপান্তরকালে শুধু যে ব্যাঘ্রের উপমা বর্জিত হয়েছে তা নয়, ছন্দোবদ্ধতা পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে আবেগের ভাষা পরিণত হয়েছে যুক্তির ভাষায়।

## (ছ) রাজা ও রানী : The King and the Queen

রাজা ও রানী নাটক লেখা হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১৭ সালে দীর্ঘকালের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করেন The King and the Queen নামে। রাজা ও রানীর অন্য রূপান্তর তপতী (১৯২৯)-র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এই অনুবাদ ও রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে টমসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন—Of all his dramas, King and Queen is that in which he has taken the greatest liberties in translation. There is singularly little correspondence between the original and English version, even the one or two main lines which have been kept, out of a very complex, being very freely handled and changed.

রাজা ও রানীকে The King and the Queen-এ পরিণত করতে যেয়ে কী পরিমাণ স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন, একটিমাত্র ব্যাপার থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মূল নাটকের পাঁচটি অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত ত্রিশটি দৃশ্য রূপান্তরে দুইটি মাত্র অবিচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত হয়েছে। কী উপায়ে এই বিপুল পরিবর্তন করা হয়েছে তার কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। রানী সুমিত্রার প্রতি আসক্তিতে রাজা বিক্রমদের রাজকর্তব্যে হেলা করছে এবং রানীর আত্মীয়রা সেই সুযোগে প্রজাশোষণ করেছে, ঘটনাবস্তুর এই পশ্চাৎপট মূল নাটকের ১।২ দৃশ্যের রাজা, দেবদত্ত ও মন্ত্রীর সংলাপ থেকে বোঝা যায়—কিন্তু রূপান্তরকালে এই দৃশ্য এবং তৎপরবর্তী দৃশ্য 'রাজপথ' 'লোকারণ্য' বর্জিত। তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রা ও বিক্রমের সংলাপ থেকে রূপান্তরিত নাটকের সূচনা। সংলাপগুলিকেও কী নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথ বিরলভাষী করেছেন তার উদাহরণ পাই নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলিতে।

বিক্রমদেব ॥ মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম—সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনককান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে—দিবালোকতট হতে

এস, নেমে এস, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে? (১।৩)

Vikram. Why have you delayed in coming to me for so long, my love?

বিক্রমদেব॥ রাজা রানী। কে রাজা? কে রানী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়।
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা॥ শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
একি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করি মধ্যাহ্ন-আকাশ
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নই। আমারে দিয়ো না লাজ
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে। (১।৩)

Vikram. The King and the Queen? Mere names. We are more than that; we are lovers.

Sumitra. You are my king, my husband, and I am content to follow your steps. Do not shame me by putting me before your Kingship.

এই দৃশ্যের শেষে রাজার প্রস্থানের পর দেবদত্ত প্রবেশ করেছে এবং এইভাবে তৃতীয় দৃশ্যের শেষে মূল নাটকের চতুর্থ দৃশ্যের সুমিত্রা-দেবদত্তের কথোপকথন সংযুক্ত করে দৃশ্যগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন করা হয়েছে রূপান্তরে, যেভাবে Sacrifice-এ দৃশ্যগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

ভাষান্তর ও রূপান্তরকালে অনেকগুলি চরিত্র সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। ফলে স্বভাবতই ঐ চরিত্রগুলির সংলাপ এবং ঐ চরিত্রগুলির সংলাপের ভিত্তিতে রচিত দৃশ্যগুলিও The King and the Queen থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। দেবদত্তের পত্নী নারায়ণী পরিত্যক্ত হয়েছে নাটকীয় ঘটনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায়। সুমিত্রা যখন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে যাচ্ছিল

তখন সেই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল ত্রিবেদী এবং রাজা ত্রিবেদীকে ডেকে পাঠিয়েছিল সেই ঘটনা বিবৃত করার জন্য ; ইংরাজি-রূপে ত্রিবেদীর এই অংশের সংলাপটুকু শুধু গৃহীত হয়েছে এবং সেখানে ত্রিবেদীর নাম নেই, সে শুধু Priest। এই অংশটুকু ব্যতীত নাটকের অন্যান্য অংশ থেকে ত্রিবেদী তার মালাপ্রপিজম্-সহ, বহিষ্কৃত হয়েছে। মন্ত্রী ত্রিবেদীকে সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ মনে করে কী ভাবে তাকে দিয়ে রানীর আত্মীয় সামন্তবর্গকে কালভৈরবের পূজায় আমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছিল বন্দী করার উদ্দেশ্যে ১।৮ দৃশ্যে, এবং ২।১ দৃশ্যে কী ভাবে জয়সেন ও মিহিরগুপ্তের কাছে সরলতার সুযোগে ত্রিবেদী মন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিয়েছিল—সেই ঘটনাগুলিও তাই অনুপস্থিত। রানীর আত্মীয়বর্গ, যারা তার স্বামীর রাজ্যে উচ্চপদাধিকারী হয়ে স্বেচ্ছাচারীর মতো প্রজাশোষণ করছে, তাদের সাক্ষাৎ রাজা ও রানী নাটকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায়। ইংরাজি রূপান্তরে তাদের নাম এবং কার্যকলাপের কথা শুনি বটে কিন্তু পাত্র-পাত্রী হিসাবে নাটকে সাক্ষাৎভাবে পাই না। বিদেশী পাঠক, যাদের জন্য এই ভাষান্তর, এবং রূপান্তর, তাদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য বিসর্জনের গোবিন্দমাণিক্য যেমন Govind হয়েছিল, তেমনি বিক্রমদেব Vikram হয়েছে এবং রানীর আত্মীয়বর্গের নাম শিলাদিত্য এবং যুধাজিৎ থেকে রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে হয়েছে, Sila এবং Ajit। ৫।৩ দৃশ্য, যেখানে ইলার পিতা অমরুরাজ স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করে কুমারসেনকে চলে যেতে বলেছিল সেই দৃশ্য রূপান্তরকালে গৃহীত না হওয়ায় অমরুরাজের ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের প্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলি গ্রহণ করে The King and the Queen-এর প্রথম অঙ্ক রচিত। কিন্তু মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্যও রূপান্তরকালে গৃহীত হয় নি। ফলে অনুগত ভৃত্য শংকরের ভূমিকা আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, কুমারসেন মঞ্চের প্রত্যক্ষতা থেকে চলে গেছে নেপথ্যের অন্তরালে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ছিল ইলা সখীগণ ও কুমারের সংলাপ, তৃতীয় দৃশ্যে কুমারসেন ও সুমিত্রার সংলাপ, চতুর্থ দৃশ্যে ছিল রেবতী ও কুমারসেনের মন্ত্রণা এবং কুমার-সেনকে যুদ্ধের জন্য বিদায়দান এবং পঞ্চম দৃশ্যে পুনরায় ছিল সখীপরিবৃত ইলার সঙ্গে কুমারের সংলাপ। তৃতীয় অঙ্ক পরিত্যক্ত হওয়ায় রূপান্তরে কুমারসেন চলে গেল নেপথ্যে—রাজা তাকে অনুসন্ধান করে বেড়ায় উন্মাদের মতো, নাটকেও আমরা তার কথা শুনি কিন্তু তার প্রত্যক্ষ দেখা পাই না। তৃতীয় অঙ্কের মত ৫।৪ দৃশ্যের ইলা ও সখীগণের সংলাপ এবং ঐ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে

কুমারসেন সুমিত্রা মধুজীবী শিকারী ইত্যাদির সংলাপ রূপান্তরকালে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। একেবারে শেষে সুমিত্রা কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেছে। ইলার ভূমিকাও The King and the Queen-এ অনেক কমে এসেছে। ফলে, মূল নাটকে কুমারসেন অতিপ্রাধান্যের দ্বারা বিক্রমের নায়কত্বের যে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল, কুমার-ইলার উপাখ্যান সুমিত্রা-বিক্রমের মূল আখ্যানের পাশে থেকে নাট্যকাহিনীকে যে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল এবং শেক্সপীয়রীয় নাট্য-পরিকল্পনার মাঝে এই উপকাহিনীর মাধ্যমে যে লিরিকের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল, সেই বিবিধ দুর্বলতা ইংরাজিতে রূপান্তরকালে কুমার-সেনকে নেপথ্যচারী করে এবং ইলার ভূমিকাকে ক্ষুদ্রতর করে দূর করা হয়েছে। টমসন একদিকে এই দৃশ্যগুলি বর্জনের জন্য দুঃখ করেছেন, 'We lose by omission of beautiful scenes which show us more fully the Queen's character and the love between his brother and herself, and which give us very charming picture of Ila and her love for Kumar'। আবার অন্যদিকে এই দৃশ্যগুলি বর্জনের প্রয়োজনীয়তাও টমসন স্বীকার করেছেন, 'His English version. shows an awareness of the fact that he squandered his chance of success ( রাজা ও রানী রচনাকালে ), and let the drama sprawl and trail through a jungle of undramatic and only secondarily relevant matter'। উক্তি দুইটি পরস্পরবিরোধী—সেই অপ্রয়োজনীয়ের অরণ্যের জন্য টমসন দুঃখ করেছেন যার শাখাপ্রশাখার জটিলতার ফলে রাজা ও রানী সার্থক হতে পারে নি। আসলে কাব্যপ্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচক প্রথম উক্তিটি করেছেন, নাট্যপ্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন। কাব্যের ও নাটকের প্রয়োজন যে কখনও কখনও পরস্পরবিরোধী হতে পারে তা এই সময় খেয়াল করেন নি।

দৃশ্যগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে, স্বতন্ত্র দৃশ্যগুলিকে যুক্ত করার জন্য ইংরাজি রূপান্তরে অনেক অংশ নূতন করে লিখতে হয়েছে। রানী ও মন্ত্রী পরামর্শ করে স্থির করেছিল রানীর আত্মীয় সামন্তবর্গকে বন্দী করার জন্য কালভৈরবের পূজায় উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ করা হবে। মন্ত্রীর প্রস্থানের পর রানীর সঙ্গে দেবদত্তের সংলাপের কিছু অংশ সম্পূর্ণ নূতন রচনা।

**Devadatta.** Queen, they will not come.

**Sumitra.** Then the King shall fight them.

Devadatta. The King will not fight.

Sumitra. Then I will!

Devadatta. You!

Sumitra. I will go to my brother Kumarsen, Kashmir's King, and with his help fight these rebels, who are a disgrace to Kashmir. Father, help me to escape from this kingdom, and do your duty, if things come to worst.

Devadatta. I salute thee, Mother of the people.

সুমিত্রার অনুনয় সত্ত্বেও বিক্রমদেব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে রাজি না হলে মূল নাটকে

ধিক্ এ অভাগ্য রাজ্য হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী! (২।২)

বলে প্রস্থান করেছিল। রূপান্তরে 'Oh the unfortunate land, and the unfortunate woman who is the Queen of this land! বলে সুমিত্রা প্রস্থানোদ্যত হলে বিক্রম প্রশ্ন করেছে 'Where are you going?' উত্তরে সুমিত্রা জানিয়েছে 'I am going to leave you.' এবং তার উদ্দেশ্য 'to fight the rebels'। বিক্রম সুমিত্রার উক্তির আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে নি, তার ধারণা 'It is her woman's wiles' এবং 'she shall regret it'। মূল নাটকের ৪।১ দৃশ্য পাঠে জানা যায় রাজা বেরিয়েছিল বিদ্রোহীদের দমন করতে। সুমিত্রা কুমারের সহায়তায় বিদ্রোহীদের বন্দী করে নিয়ে এলে, কাশ্মীরের সাহায্যগ্রহণ অপমানকর বলে, এবং সুমিত্রার কাছে হার স্বীকার করতে হয় বলে, রাজার শিবিরে রানীর শিবিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। রানীর প্রতি উন্মুখ প্রেমের প্রতিদান লাভে ব্যর্থতায় ধ্বংসের উন্মাদনা এবং কাশ্মীরের সাহায্যে অপমান নাটকের দুই রূপেই রাজার কার্যকলাপের উদ্দীপনা যুগিয়েছে বটে, কিন্তু ইংরাজি রূপে বিদ্রোহদমনের অজুহাতটুকুও রাখা হয় নি। কারণ, এখানে বিক্রমের সঙ্গে সংলাপে সেনাপতি জানিয়েছে—'The rebellion in our land has been quelled. The rebels themselves are fighting on our side. Why waste our strength and time in Kashmir when your presence in your own capital is so urgently

needed ?' The King and the Queen নাটকে শংকর চরিত্রকে দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাই। রূপান্তরকালে শংকরের পুরাতন সব সংলাপ প্রায় পরিত্যাগ করে তার মুখের সংলাপ নূতন করে রচনা করা হয়েছে। সুমিত্রা 'has come humbly to ask your pardon' এই খবর নিয়ে শংকর বিক্রমের সভায় এসেছে এবং সে রাজাকে অনুরোধ করেছে রাজা যেন 'magnify a domestic quarrel into a war' না করে।

রাজা ও রানীর যে যে অংশ The King and the Queen-এ গৃহীত হয়েছে, সেই অংশগুলিও সব সময় অবিকৃতভাবে গৃহীত হয় নি। রেবতীর হিংস্র হৃদয়ের মধ্যে নিজের হৃদয়ের 'red flame of hell-fire'-এর প্রতিবিম্ব যেখানে বিক্রম দেখেছে সেই অংশ রাজা ও রানীর ৫।৫ দৃশ্য থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে গৃহীত হয়েছে। অমরুরাজ যেখানে ইলাকে বিক্রমের সম্মুখে উপস্থিত করেছে সেই অংশের সংলাপ মূল নাটকের ঐ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য থেকে নেওয়া। এই দৃশ্যটি প্রায় সম্পূর্ণ অবর্জিতভাবে রূপান্তরে গৃহীত হয়েছে।

বিক্রমদেব ॥ জানি না সে
কোন্ ভাগ্যবান। সাবধান, অতি প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এককালে চরাচরে তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালোবাসিতাম ; সে প্রেমের পরে
পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে।
বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার।

ইলা ॥ কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম। (৫।৭)

Vikram. What a fortunate man is he! But I warn you, girl, gods are jealous of our loves. Listen to my secret. There was a time when I despised the whole world, and only loved. I woke up from my dream, and found that the world was there; only my love burst as a bubble. What is his name, for whom you wait ?

Ila. He is Kashmir's King. His name is Kumarsen.

শেষ দৃশ্যের ঘটনা ইংরাজিতে গ্রহণকালে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। শুধু যে চন্দ্রসেন বিক্রমের কথোপকথন, চন্দ্রসেনের স্বগতোক্তি, চন্দ্রসেন-শংকরের সংলাপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে তাই নয়। কুমারের মুণ্ড স্বর্ণথালে নিয়ে সুমিত্রার প্রবেশ ও উক্তির পর মূল নাটকে তার পতন ও মৃত্যু হয়েছিল। এর পরে সেখানে ছিল ইলার প্রবেশ এবং এই বীভৎস দৃশ্য দেখে তার মূর্ছা। তারপরে শংকরের উক্তি ছিল। বিন্যাসক্রম বিপরীত হয়ে রূপান্তরে শংকরের উক্তি পাই পূর্বে, তারপরে ইলা বধূবেশে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ইলার শেষ উক্তির গুরুতর পরিবর্তন করা হয়েছে। 'একী! একী! মহারাজ, কুমার আমার' বলে পূর্বে যেখানে ইলা মূর্ছিতা হয়েছিল, নবরূপে সেখানে ইলার বধূবেশের মধ্য দিয়ে যেমন, তেমনি তার পরিবর্তিত উক্তি, 'King, I hear the bridal music. Where is my lover? I am ready.'-র মাধ্যমে প্রতীক-ধর্মের এমন ব্যঞ্জনা সুফীকাব্যসুলভ উপমার ব্যবহারে পরিস্ফুট হয়েছে যা মেলোড্রামাময় মূল নাটকের অস্তিমে ছিল না। ইলার এই প্রতীকী উক্তির পর অসংগত হবে মনে করে চন্দ্রসেনকর্তৃক রেবতীকে ধিক্কার এবং বিক্রমের নত-জানু অনুশোচনা রূপান্তরে পরিত্যক্ত হয়েছে, যার পরে মূল নাটকে যবনিকা নেমে এসেছিল। অকস্মাৎ প্রতীকীলোকে উত্তীর্ণ করে, সেখান থেকে পুনরায় নিতান্ত বাস্তবে নাট্যকার অবতরণ করাতে চান নি। এখানে যে প্রতীকের ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়েছে তাই সম্ভবত তপতীতে আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে।

## (জ) ফাল্গুনী: The Cycle of Spring

ফাল্গুনীর (১৯১৬) ইংরাজি রূপান্তর The Cycle of Spring (১৯১৭)-এর অনুবাদ সম্বন্ধে সাহিত্য-আকাদমি প্রকাশিত শতবার্ষিকী শ্রদ্ধানিবেদনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনার পঞ্জীতে বলা হয়েছে, টমসন যাকে 'unhappy introductory matter' বলেছিলেন, সেই 'The great part of the introductory portion of this drama was translated by Mr. C. F. Ardrews and Prof. Nishikanta Sen and revised by the author.' অন্যের অনুবাদ সম্বলিত এই The Cycle of Spring-ও যেহেতু রবীন্দ্ররচনা বলে ম্যাকমিলান প্রকাশিত সমগ্র কাব্য ও নাট্যরচনাবলীতে গৃহীত হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় এই অনুবাদটিকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন।

দুই রূপের মধ্যে কালগত ব্যবধান সামান্য, ফাল্গুনীর ইংরাজি ভাষান্তরকালে রূপান্তরের পরিমাণও সামান্য। দুই-একটি গান অনুবাদকালে পরিত্যক্ত হয়েছে, যেমন সূচনায় কবিশেখরের গান, 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' এবং দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতভূমিকায় উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান, 'ছাড়গো আমায় ছাড়গো'। অন্যান্য গানগুলিতে নিম্নোদ্ধৃত উপায়ে অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে—

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভারে তন্দ্রাহারা। (১।গী. ভূ.)

My shadow dances in your waves,
everflowing river,
I, the blossoming Champak, stand unmoved
on the bank
with my flower-vigils. (I)

বাংলা রূপে যে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ-যমকের ব্যবহার ছিল, যার ফলে চরিত্র-সমূহের সংলাপ হয়েছিল রহস্যময় রূপক-গুণান্বিত, অনুবাদে সেই শ্লেষ-যমক অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না বলে প্রায় তার অধিকাংশই বর্জিত। দুই-একটি উদাহরণ দিই।

আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়—আমরা জনপদের সেবা তো কখনও করি নি—তাই ওই পদপ্রাপ্তিটা আশাও করি নে। ( সূচনা )

My poetry never accepts reward. (Intro)

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাবো। ( সূচনা )

But poet, there must be some canvas for a background.

No. Our only background is the mind. On that we shall summon up a picture with the magic wand of music. ( Intro. )

কখনও ইংরাজি রূপে নূতন pun তৈরির চেষ্টা করে মূলের যমক-শ্লেষের এই অভাব নাট্যকার দূর করার চেষ্টা করেছেন। যেমন,

সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য। (১)

Time itself is play. Its only object is Pas-time. (I)

ফাল্গুনীতে নাট্যনির্দেশ অনুপস্থিত, কিন্তু The Cycle of Spring-এ

বিস্তারিত নাট্যনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র কবির পরিচালনায় নাটকটি অভিনীত হয়েছিল বলে এবং এই জাতীয় নাটক ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে গভীরভাবে স্বীকার করে নিয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপে নাট্যনির্দেশ দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। সম্ভবত বিদেশী প্রযোজক ও পরিচালকের মুখ চেয়ে ইংরাজি রূপান্তরে তিনি বিস্তারিত নাট্যনির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই এখানে তিনি পর্দার রঙের কথা বলেছেন, মঞ্চের উপর চাঁদ তারা, গাছ ও ফুলের অবস্থিতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন, মঞ্চের বাম কোণে অস্পষ্টভাবে গুহামুখ দেখা যাবে সে কথা বলেছেন, এমন কি আলোকসম্পাতের নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জানিয়েছেন 'the action is continuous.'। 'এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা এবং সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নহে। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।' —নাট্যকারের এই মন্তব্য ফাল্গুনীতে নাটকের থেকে স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছিল, কিন্তু ইংরাজী রূপান্তরে এই মন্তব্য নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের Song-prelude-এর পরে band of youths-এর গানের পরে মন্তব্য করা হয়েছে 'In the following dialogue only the names of the principal characters are given. Wherever the name is not given the speaker is one or other of the youths.'

অর্থাৎ নবযৌবনের দলের মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। যে কোন জনের মুখের কথা অপর যে কোন জনের মুখে বসতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকে জনতাচিত্রে বা নাগরিকসমাবেশে বিভিন্ন জনের মধ্যে যতটুকু চরিত্রস্বাতন্ত্র্য থাকে, এখানে সেটুকু চরিত্রপার্থক্যও নেই। বাংলায় যেখানে একজনের কথা ছিল মূলে, তা তাই অবলীলাক্রমে ভেঙে দুজনের কথায় পরিণত করা যায় রূপান্তরে।

> তুলট কাগজ গেছে আপদ গেছে কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে। (১)
>
> The manuscript book banished! What a good riddance!
>
> We ought to strip off Dada's grey philosopher's cloak also. (I)

বিপরীতক্রমে দেখা যায়, কয়েকজন নবযৌবনের দলের কথা একজনের কথায় পরিণত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। কেবলমাত্র একটি মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।
কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে —তার পিছন পিছন আমিও যাবো।
ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয়ে এল। (৪)

And everybody said that he was terrifying, a bodiless head, a gaping mouth, a dragon eager to swallow the moon of the youth of the world. But we are no longer afraid. The flowers go, the leaves go, the waves in the river go, and we shall also follow him. Ah, blind Ministrel, strike your lute and sing to us. Who knows what is the hour of the night ? (IV)

সকলের কথাই যেহেতু একই কথা তাই সংখ্যায় কিছু আসে যায় না, তাই একের কথা সহজেই অনেকের হয়, অনেকের কথা সহজেই একের হয়।

চরিত্রস্বাতন্ত্র্য নেই বলে রবীন্দ্রনাথ নবযৌবনের দলের নামকরণ করেন নি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যাদের 'principal characters' বলেছেন—চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার—তাদের মধ্যেও চরিত্রস্বাতন্ত্র্যের সাক্ষাৎ মেলে না। চন্দ্রহাস, জীবনসর্দার ও নবযৌবনের দলের সংলাপের মধ্যে এমন কোন বিশিষ্টতা নেই, যে সংলাপ থেকেই বক্তাকে চিনে নেওয়া যায়। নামের দ্বারা তারা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সংলাপের দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নি। তাই মূলে যা চন্দ্রহাসের কথা ছিল রূপান্তরে তা নবযৌবনদলের সদস্যের কথা হয়ে যায়, আবার মূলে যা নবযৌবনদলের কোন নামহীন সভ্যের কথা ছিল তা অনুবাদে Chandra-র সংলাপে পরিণত হয়।

চন্দ্রহাস॥ আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমানুষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হু হু করে চলেছে যে তার বয়সটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁস নেই। (২)

And we have a leader, who is a perfect veteran in childhood. He rushes along so recklessly that he drops off his age at every step he runs. (II)

বিপরীত ব্যাপারের উদাহরণ দিই।

হাঁ। ঠিক জবাব বেরোয় না। সাদা কথা বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না। (২)

Chandra. Yes, otherwise the answer becomes too unintelligible. (II).

আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মানুষ না। (২)

Chandra Again we are found out. We are no ordinary beings. (II)

সবশেষে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা বলা প্রয়োজন। ফাল্গুনীতে প্রত্যেক দৃশ্যকে বিষয়ের দিক থেকে এবং ঘটনাস্থানের দিক থেকে স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রথম দৃশ্যের নাম 'সূত্রপাত', স্থান 'পথ'; দ্বিতীয় দৃশ্যের নাম 'সন্ধান', স্থান 'ঘাট'; তৃতীয় দৃশ্যের নাম 'সন্দেহ', স্থান 'মাঠ'; এবং চতুর্থ দৃশ্যের নাম 'প্রকাশ' এবং স্থান 'গুহাদ্বার'। নবযৌবনের দল জরাবুড়োর সন্ধানে বেরিয়েছিল, মধ্যপর্যায়ে তার সন্ধান না পেয়ে তাদের মনে জেগেছিল সন্দেহ এবং সর্বশেষে যখন গুহাদ্বার থেকে জীবনসর্দারের প্রকাশ হয়েছিল তখন জানা গিয়েছিল জরা যৌবনের ছদ্মবেশমাত্র। এই সন্ধান-সন্দেহ-প্রকাশের লীলানাট্য অভিনীত হয়েছিল পথে ঘাটে মাঠে এবং গুহাদ্বারে। কিন্তু The Cycle of Spring-এর দৃশ্যগুলির নামকরণ বিষয়ানুসারে কিংবা ঘটনাস্থানের ভিত্তিতে করা হয় নি—করা হয়েছে সময় অনুসারে। এখানে প্রথম দৃশ্য Morning, দ্বিতীয় দৃশ্য Noon, তৃতীয় দৃশ্য Evening এবং চতুর্থ দৃশ্য Night। রাতশেষের ভোরের আলো দেখা দিয়েছে জীবনসর্দারের প্রকাশকালে নাটকের অন্তিমে। নাটকের বিষয়বস্তু যেহেতু সময়, কালের গতি, যে গতি নবীনকে পুরাতন, পুরাতনকে নবীন করে, যৌবনের গায়ে জরার পোষাক পরায়, জরার ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে পুনরায় যৌবনকে প্রকাশিত করে—সেই কালচক্র যেহেতু নাটকের বিষয়, সেইজন্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথ কাল পরিবর্তনের ভিত্তিতে ইংরাজি রূপান্তরকালে দৃশ্যগুলির নূতনভাবে নামকরণ করেছিলেন। একটি দিনের যে কালগত পরিবর্তন, আহ্নিক গতি, প্রভাত থেকে রাত্রিতে, তারই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে দেখাতে চেয়েছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী

কালচক্রের পরিবর্তনকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক দৃশ্যের গীতিভূমিকার নামকরণ—নবীনের আবির্ভাব, প্রবীণের দ্বিধা, প্রবীনের পরাভব, এবং নবীনের জয়—ইংরাজি রূপান্তরকালে পরিত্যক্ত হয়েছে।

## (ঝ) রক্তকরবী : Red Oleanders

রক্তকরবী ও Red Oleanders দুইটিই পরিণত বয়সের রচনা এবং দুই রূপের মধ্যে কালগত ব্যবধান নগণ্য। বাংলা রক্তকরবী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে, ইংরাজি রূপান্তর Red Oleanders প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। কিন্তু রক্তকরবীর প্রথম প্রকাশ হয় আশ্বিন ১৩৩১ (১৯২৪)-এ প্রবাসীতে। প্রবাসীতে বলতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেই ছেপে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পুরো নাটক। পরের বছরই ইংরাজি তর্জমা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাংলা বই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে আরো এক বছর দেরি হয়। সেই কারণে রক্তকরবীকে Red Oleanders-এ রূপান্তরিত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেন নি। কোন কোন অংশ বর্জিত হয়েছে, যেমন নাটকের আরম্ভেই কিশোর ও নন্দিনীর প্রথম দুইটি উক্তি। অথবা রাজা ও নন্দিনীর সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যাপকের উক্তিটি—'নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।' কখনও কখনও এক-আধটি ইঙ্গিত-পূর্ণ সংলাপও বাদ পড়ে গেছে রূপান্তরে। যেমন—

> চন্দ্রা ॥ বল কী! ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে!
>
> ফাগুলাল ॥ দেখ নি? ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

তর্জমায় কখনও সংলাপের একাংশ পরিত্যক্ত।

> নন্দিনী ॥ তারপরে আবার তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

Nandini. Then again, you hide your king behind a wall of netting. Is it for fear of people finding out that he's a man ?

বিশু একদিন কেন তাকে নীরবে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে কথা নন্দিনী জানতে চাইলে রক্তকরবীতে বিশু 'ও চাঁদ, চোখের জলে লাগল জোয়ার' গান গেয়ে কারণ বোঝাতে চেয়েছে। Red Oleanders-এ গানটি বর্জিত হয়েছে কিন্তু গানটির কিছু অংশ বিশুর সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

My boat was tied to the bank ; the rope snapped ; the wild wind drove it into the trackless unknown.

এক-একটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন সংলাপ Red Oleanders-এ যুক্ত হয়েছে, যেমন ফাগুলালের উক্তি 'Don't worry me, Chandra. A thousand times over have I told you that in these parts there are high roads to the market, to the burning ground, to the scaffold—everywhere except to the homeland' অথবা অন্যত্র—

গোকুল ॥ একটা কি মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরী।

Gokul. You know some spell, I'm sure. You're snaring everybody here. You're a witch. Those who are bewitched by your beauty will come to their death.

Nandini. That death will not be yours, Gokul, never fear ! You'll die digging.

Gokul. Let me see, let me see what's that dangling over your forehead ?

Nandini. Only a tassel of red oleanders.

একটি ক্ষেত্রে সংলাপধারাকে রূপান্তরকালে বিপরীতক্রমে সাজানো হয়েছে—

নেপথ্যে ॥ আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত করো না। পূজায় ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও—এখনি যাও।

নন্দিনী ॥ আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে ॥ রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

Voice. You want Ranjan, I know. I have asked the governor to fetch him at once. But don't remain standing at the door when I come out for the worship, for then you'll run great risk.

Nandini. I have cast away all fear. You can't drive me away. Happen what may, I'm not going to move till your door is opened.

Voice. To-day's for the Flag-worship. Don't distract my mind. Get away from my door.

ডাকঘরের মতো রক্তকরবী নাটকের ভাষা কবিতার দিগন্তকে স্পর্শ করে বলে কবিতার অনুবাদে যেমন ছন্দের স্পন্দন, সংগীতের মাধুর্য, চিত্রের তীক্ষ্ণতা, উপমার রূপ অনেক পরিমাণে হারায়, তেমনি এই নাটকগুলির ভাষাও অনুবাদে কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে যায়। 'বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ' ইংরাজি রূপান্তরে যখন 'The dance rhythm of the All' হয় তখন শুধু যে ভাবরেখার স্পষ্টতা, রূপের অবয়বত্ব বিমূর্ত হয়ে যায় তাই নয়, মূল নাটকের ভাষার মধ্যে যে বাঁশির সুর, যে নাচের ছন্দ ছিল তাও হারিয়ে যায়। 'স্বপনতরীর নেয়ে' হয় 'Boatman of dreams'—নেয়ে শব্দটি নন্দিনীর পক্ষে বেমানান হয় না, কিন্তু 'Boatman' কথাটি নন্দিনী, নারীত্বের সমস্ত মাধুর্যের নির্যাসের এই প্রতিমার সঙ্গে কিছুতেই মানায় না। 'ঘুমভাঙানিয়া' ও 'দুখজাগানিয়া' বেদনাদায়কভাবে হয় 'Breaker of my sleep' এবং

'Waker of my grief'। 'ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা' এই উক্তিতে লোকভাষাভঙ্গির যে প্রাণবন্ততা ছিল তা অনুবাদে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে—'Man despises the broken pot of his own creation more than the withered leaf fallen from the tree.' নিমন্ত্রণবাড়ির ছিটানো উচ্ছিষ্টের যে ছবি মূল উক্তিটিতে ছিল, অনুবাদে তার আভাসও নেই। যেখানে অনুবাদ মূলানুগ সেইরূপ একটি সংলাপের ভাষান্তরের উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হয়েছে।

নেপথ্যে ॥ বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

Voice. You will never understand. I, who am a desert, stretch out my hand to you, a tiny blade of grass, and cry : I am parched, I am bare, I am weary. The flaming thirst of this desert licks up one fertile field after another, only to enlarge itself,—it can never annex the life of the frailest of grasses.

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেখানে মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ সেখানে তুলনায় ইংরাজিতে ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা প্রায় ক্ষেত্রেই বেশি। অল্প কথায় যেখানে মূলে স্পষ্টতা প্রত্যক্ষতা, ভাষান্তরে বহুবাদিতা সত্ত্বেও সেই প্রত্যক্ষতা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত মূলের সরল বাক্যগুলির ভাষান্তরে জটিল বাক্যে পরিণত হবার যে প্রবণতা তাও নাটকগুলির ইংরাজি রূপান্তরের অভিনয়যোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

### (ঞ) মুক্তধারা : The Waterfall

মুক্তধারা থেকে The Waterfall-এ রূপান্তরের আলোচনা সর্বশেষে করছি, কারণ এই অনুবাদটি কোনদিন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

মুক্তধারা লিখিত হয় পৌষ-সংক্রান্তি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে এবং তার অব্যবহিত পরে মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার মে ১৯২২ সংখ্যায় The Waterfall নামে তার তর্জমা প্রকাশিত হয়। মডার্ন রিভিয়ু-র ঐ সংখ্যায় লেখকের নাম হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে, কিন্তু সে কি মূল রচনার লেখক হিসাবে, নাকি অনুবাদক হিসাবেও সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তুত রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জীতে এই তর্জমার কোন উল্লেখ নেই, সাহিত্য আকাদমি প্রকাশিত শতবার্ষিকী গ্রন্থের সংলগ্ন গ্রন্থপঞ্জীতেও নেই। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়াই বোধ হয় অনুল্লেখের কারণ। (মার্জরি সাইকস্-কৃত মুক্তধারার পরবর্তীকালীন ইংরাজি তর্জমা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হলো, কিন্তু মডার্ন রিভিয়ুতে-প্রকাশিত এই অনুবাদটি সেই মর্যাদা পেল না কেন তা জানি না।) রবীন্দ্রজীবনীতে পাদটীকায় 'ইংরাজি অনুবাদ The Waterfall-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও অনুবাদকের নাম নেই। কিন্তু কয়েকটি কারণে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তর্জমাটি করেছিলেন। মডার্ন রিভিয়ু যখন লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম করছে, অনুবাদক হিসাবে অন্য কারো নাম নেই, তখন লেখককেই অনুবাদক হিসাবে মেনে নেওয়া সংগত। পত্রিকায় অনুবাদটির শেষে লেখকের 'note' জুড়ে দেওয়ায় এই অনুমান আরো প্রবল হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদে বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় প্রস্তুত অনুবাদে মূল রচনা থেকে যে জাতীয় স্বাধীনতা নেওয়ার উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি, সেই জাতীয় উদাহরণ এই তর্জমাতেও বিরল নয়। এ ছাড়া আছে Rabindranath through Western Eyes গ্রন্থের পাদটীকায় আরনসনের মন্তব্য—'An English translation of Muktadhara by Rabindranath himself appeared in the Modern Review, 1922.।'

ভাষান্তরকালে স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখানে স্বাধীনতার পরিমাণ প্রকৃতির প্রতিশোধের বা রাজা ও রানীর, এমন কি বিসর্জনের অনুবাদের মতো নয়, এই অনুবাদ রক্তকরবীর অনুবাদের মতো প্রায় মূলের অনুগত। ইংরাজি তর্জমায় বেশ কিছু গান অবশ্য গৃহীত হয় নি। বাউলের কণ্ঠে মূলে যে গান ছিল 'ও তো আর ফিরবে না রে' বাউলচরিত্রসহ সেই গান The Waterfall থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। অন্য সব কয়েকটি বর্জিত গান মূলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে গেয় ছিল। 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব,' 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়,'

'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না', 'আগুন আমার ভাই,' 'শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,' 'ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে'। কিছু সংলাপ পরিত্যক্ত হয়েছে রূপান্তরে, যদিও তার পরিমাণ বেশী নয়। যেমন, নিম্নের অংশটি তর্জমায় পাই না।

ধনঞ্জয় ॥ ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২ ॥ রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয় ॥ তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

এইরূপ আরো কিছু সংলাপ বর্জিত হয়েছে—যেমন, কুন্দন যখন পুনঃপ্রবেশ করে ধনঞ্জয়ের বাঁধন খুলে দিয়েছে তখনকার সংলাপ, উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের কথোপকথন। 'দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ' ও তাদের কথোপকথনও পরিত্যক্ত হয়েছে—যেখানে মাসি যুবরাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য ছেলেমানুষ মেয়েটিকে শাসন করছে, কিন্তু মেয়েটি শাসন না মেনে বরং যুবরাজের জয়-কামনায় ভৈরবের কাছে তার লম্বা চুল মানত করছে।

বাংলা থেকে ইংরাজিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দিই।

পথিক ॥ বাবা রে। **ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা**। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

Stranger. What a monster! **It looks like a dragon's skull with its fleshless jaws hanging down!** The constant sight of it would make the life within you withered and dead.

মূলের ছোটো ছোটো বাক্যগুলি নাট্যসংলাপের উপযুক্ত ছিল, তর্জমায় সেখানে জটিল বাক্যবন্ধ নাট্যসংলাপের গতি ব্যাহত করে।

আর একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য। উদ্ধৃত অংশটির তর্জমায় লাতিন বাক্যাংশ চমৎকারভাবে ব্যবহার করে মূলের ধরণ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

গুরু ॥···খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ ॥ জয় রাজরা—

গুরু ॥ ( হাতের কাছে দুই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া )—জেশ্বর।

ছাত্রগণ ॥ জেশ্বর।

গুরু ॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ ॥ শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু ॥ ( ঠেলা মারিয়া ) পাঁচবার।

ছাত্রগণ ॥ পাঁচবার।

গুরু ॥ লক্ষীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ ॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু ॥ উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ ॥ উত্তরকূটা—

গুরু ॥ —ধিপতির

ছাত্রগণ ॥ —ধিপতির

গুরু ॥ জয়।

ছাত্রগণ ॥ জয়।

Schoolmaster .....Shout, with your loudest voices boys :
'Salve Imperator'.

Boys. 'Salve Im—'

Schoolmaster. '—perator !'

Boys. '—perator !'

Schoolmaster. 'Salve Imperator Imperatorum !'

Boys. 'Salve Imperator—'

Schoolmaster '—Imperatorum !'

Boys. 'Imperatorum !'

## চোদ্দ

## ॥ সূত্রের সন্ধানে ॥

রবীন্দ্রনাথের নাটকের রূপান্তর প্রধানত এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে রূপান্তর। কয়েকটি ছোটগল্পকে তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেছেন সেই কারণে যথা-প্রয়োজন পরিবর্তন ঘটাতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কয়েকটি উপন্যাসকে তিনি নাটকে পরিণত করেছেন—ফলে নাট্যবিষয়কে নূতন ফর্মে ঢেলে সাজাতে

হয়েছে। কখনও কাব্য বা কবিতাকে রূপান্তরিত করে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। নাটক থেকে যখন নাট্যবিষয়কে অন্য নাটকে রূপান্তরিত করেছেন তখনও অনেক ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের কারণ ফর্মগত। রাজা ও রানী যখন তপতীতে পরিণত হয় তখন পদ্যনাট্য গদ্যনাট্যে পরিণত হয়। কবিকাহিনী ও ভগ্নহৃদয় যখন নলিনী নামক অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাট্যে এবং সেই গদ্যনাট্য যখন মায়ার খেলা গীতিনাট্য এবং পরে মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে পরিণত হয় তখন হয় এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে ক্রমাগত রূপান্তর। নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা থেকে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, গদ্যনাট্য চণ্ডালিকা থেকে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা এই রূপান্তরগুলিও একই জাতীয়। দুইটিই যদিও গদ্যে রচিত নাটক কিন্তু. তবু প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তধারায় পরিবর্তন এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে রূপান্তরের মধ্যে পড়ে—কারণ প্রায়শ্চিত্ত ছিল কাহিনীনাট্য কিন্তু মুক্তধারা প্রতীকনাট্য। যে সমস্ত ক্ষেত্রে রূপান্তর এই জাতীয় সেই সব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নিতে কোন অসুবিধা থাকে না। নটীর পূজা রচিত হয়েছে বলে পূজারিনী কবিতার অস্তিত্ব, বা তাসের দেশ লিখিত হয়েছে বলে একটি আষাঢ়ে গল্পের অস্তিত্ব, বা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য কিংবা তপতী গদ্যনাট্য রচিত হয়েছে বলে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য এবং রাজা ও রানী পদ্যনাট্যের অস্তিত্ব লোপ করে দিতে হবে এই দাবী অসংগত—কারণ সব ক্ষেত্রেই দুইটি ফর্মেরই নিজস্ব স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য আছে। সে ক্ষেত্রে একটি লিখিত হয়েছে বলে অন্যটির অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে গেছে এমন দাবী করা চলে না—কারণ দুটি রূপ স্বতন্ত্র শিল্পের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্ববশ।

কিন্তু সংশয় দেখা দেয় কয়েকটি রূপান্তরের ক্ষেত্রে। এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে, সর্বপ্রথম সংস্করণ থেকে সর্বশেষ সংস্করণে, বিসর্জন এবং রাজা ও রানী নাটকে যে সার্থকতার সন্ধানে প্রভূত পরিবর্তন করা হয়েছিল তা পূর্বেই বিবৃত করেছি। অচলায়তনের পাশে গুরু, বা রাজার পাশে অরূপরতন রাখলে যে পরিমাণ পার্থক্য দুই রূপের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়, বিসর্জন বা রাজা ও রানীর প্রথম সংস্করণ থেকে শেষ সংস্করণে পরিবর্তন তার চেয়ে কম নয়। অচলায়তন-গুরু-রাজা-অরূপরতন সম্বন্ধে যদি সংশয় থাকেও তবে অন্তত গোড়ায় গলদ-শেষরক্ষা এবং শারদোৎসব-ঋণশোধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই নাটকগুলির দুই রূপের মধ্যে যত পার্থক্য তার চেয়ে অনেক পার্থক্য শুধু বিসর্জন বা রাজা ও রানীর সংস্করণগত পরিবর্তনে পাই না, আরও দুই-একটি নাটকের নানা সংস্করণের মধ্যে তার চেয়ে বেশী পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কোন পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ সংস্করণগত পরিবর্তন বলে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হলেন কেন, এবং কোন পরিবর্তনকে তিনি নূতন নামে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা দিলেন কেন। যদি কোন পরিবর্তন গুণগত হয় তবে তাকে স্বতন্ত্র নামে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা দেবার অর্থ থাকে, যদি পরিবর্তন হয় পরিমাণগত তাহলে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা দেবার অর্থ থাকে না। যদিও শারদোৎসবের তুলনায় ঋণশোধে তাত্ত্বিকতার আভাস অধিকতর, যদিও শেষ-রক্ষায় গোড়ায় গলদের তুলনায় পরিহাসরস আরও বেশী উচ্ছ্বসিত, তবু দুই রূপের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য আছে এ কথা বলা যায় না—অচলায়তন-গুরুতে রাজা-অরূপরতনে গুণগত পার্থক্য আছে একথাও বলা যায় না। অচলায়তনকে গুরুতে রাজাকে অরূপরতনে পরিবর্তনকালে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়-যোগ্য করে তোলাই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য এই কথা বলেছেন। কিন্তু নাটকের প্রধান সর্তই তো অভিনয়যোগ্যতা, অভিনয়সার্থকতা। নাটক সাহিত্যগুণে যতই ভূষিত হোক, যতক্ষণ সেই নাটক পাদপ্রদীপের সম্মুখে অভিনয়ে উত্তীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ নাটক হিসাবে সে চরিতার্থতা অর্জন করে না। সুতরাং অভিনয়যোগ্য করার জন্য অর্থাৎ সার্থক নাটক করার জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ও রাজাকে গুরু ও অরূপরতনে নবরূপ দিলেন তখন অভিনয়যোগ্য নয় বলে বিবেচনা করেছিলেন যে পূর্বরূপকে তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করা উচিত ছিল না। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনকে গুরুতে, রাজাকে অরূপরতনে রূপান্তরিত করে অথচ দুইটি রূপকেই স্বতন্ত্রভাবে অক্ষুন্ন রেখে সাহিত্য হিসাবে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন রাজা ও অচলায়তনকে, নাটক হিসাবে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন অরূপরতন ও গুরুকে। হয়তো একই উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্ত এবং তার পরবর্তী রূপ পরিত্রাণকেও রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র রচনার মর্যাদা দিয়ে দুই রূপকেই প্রচলিত রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনয়যোগ্য করে তোলার জন্য রূপান্তর করেছিলেন অথচ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি রাজা, অচলায়তন, প্রায়শ্চিত্ত ও শারদোৎসব যত সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে, অরূপরতন, গুরু, পরিত্রাণ, ঋণশোধ তত সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয় নি। প্রথম রূপগুলি নাট্যগোষ্ঠীসমূহের নিকট যত জনপ্রিয় দ্বিতীয় রূপগুলি তত নয়। দ্বিতীয় রূপগুলিকে আকারে-প্রকারে যথার্থ নাটক করতে যেয়ে প্রথম রূপের প্রাণশক্তি জীবনীশক্তি সম্ভবত উবে গিয়েছিল। যদি ধরেও নেওয়া যায়, শারদোৎসবে শরৎপ্রকৃতি প্রধান, ঋণশোধে তাত্ত্বিকতা প্রাধান্য পেয়েছে, সাহিত্যিক কারণে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও অচলায়তনকে,

অভিনয়ের প্রয়োজনে অরূপরতন ও গুরুকে হয়তো স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্তু গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা সম্বন্ধে এই রকম কোন যুক্তি খাটে না। এক নাটকের একটি সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে যত পার্থক্য, গোড়ায় গলদ থেকে শেষরক্ষায় তার চেয়ে পার্থক্য কম। যদি রবীন্দ্রনাথ সত্যিই মনে করে থাকেন পূর্বে গোড়ায় গলদ ছিল তাকে মেজেঘষে তিনি শেষরক্ষা করেছেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়টি উন্নততর রূপ তাহলে পূর্বতন রূপটিকে, গোড়ায় গলদকে, স্বতন্ত্র রূপে প্রচলিত রাখার কোন অর্থ হয় না। নূতন উন্নততর সংস্করণ প্রস্তুত হলে যেমন বিসর্জন এবং রাজা ও রানীর পূর্ব সংস্করণগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে, তেমনি গোড়ায় গলদকেও পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। একই প্রশ্ন ওঠে প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণ সম্বন্ধে। বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদগুলিকে নাট্যদৃশ্যে পরিণত করার ফলে প্রায়শ্চিত্তে যে জাতীয় দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়েছিল, তা বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণ নাটকে মোচন করেছিলেন। এই পরিবর্তনে নাটকের শিল্পগত উন্নতি হয়েছে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যদি নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন তাহলে পরিত্রাণের পাশাপাশি তিনি পূর্বরূপ প্রায়শ্চিত্তকে প্রচলিত রাখতে দিলেন কেন? যতই যুক্তি উত্থাপনের চেষ্টা করা হোক, যতই কারণ অনুমান করা যাক, অচলায়তন ও গুরু, রাজা ও অরূপরতন, শারদোৎসব ও ঋণশোধ নাটকগুলিকে পাশাপাশি প্রচলিত রাখা সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন ওঠে। অন্য নাটকের বহু পার্থক্যপূর্ণ পূর্বসংস্করণকে তিনি রক্ষা করেন নি, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে তিনি পূর্বরূপকে অন্য নামে স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা দিলেন কেন? শারদোৎসব-ঋণশোধের সূক্ষ্ম ভাবগত ব্যবধানই কি দুই রূপ রক্ষার কারণ? প্রায়শ্চিত্ত, অচলায়তন, রাজাকে পঠিতব্য সাহিত্য হিসাবে এবং পরিত্রাণ, গুরু, অরূপরতনকে অভিনয়যোগ্য নাটক হিসাবে দেখেছিলেন বলেই কি তিনি দুইটি রূপকেই স্বতন্ত্র মহিমায় রক্ষা করেছেন? কিন্তু তাহলেও গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষার প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে। অথবা এই সমস্ত নাটকের দুই রূপকে বজায় রাখার কারণ কি নাট্যকারের অব্যবস্থিত-চিত্ততা? যখন তিনি সংস্করণগত পরিবর্তন করেছেন, তখন পরবর্তী রূপই যে উন্নততর রূপ সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সেখানে তাঁর আত্মবিশ্বাস বিচলিত হয় নি এবং তাই তিনি পূর্বরূপকে পরিত্যাগ করে সংস্কৃত রূপকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু রাজা-অরূপরতন, প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণ, অচলায়তন-গুরু, শারদোৎসব-ঋণশোধ, গোড়ায় গলদ-শেষরক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত হতে পারেন নি, দুইরূপের কোনটিতেই তিনি সম্ভবত

নাট্যকেন্দ্রকে অভ্রান্তভাবে ধরতে পারেন নি—এই সব ক্ষেত্রে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস বিচলিত হয়েছিল। তাই তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দুই রূপকেই স্বতন্ত্র নাটক হিসাবে রক্ষা করে নির্বাচনের দায় থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

গঠনগত ঐক্য এবং সংহতির সন্ধানই প্রধান কারণ যা রবীন্দ্রনাথকে নাট্যসমূহের পুনঃ পুনঃ রূপান্তরসাধনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মালিনীর ভূমিকায় গ্রীকনাট্যের যে দেশকালে অবিচ্ছিন্নতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ততদূরে না হোক, যতদূর পর্যন্ত সম্ভব পরবর্তী রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর নাটকীয় ঐক্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন—কাহিনীর ঐক্য, বহুধাবিভক্ত দৃশ্যসমূহের মধ্যে ঐক্য এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে কালগত ঐক্য। রাজর্ষির দ্বিতীয়াংশে. যে নির্বাসনকাহিনী ও সুজাকাহিনী মাসিকপত্রের পেটুকে দাবী মেটানোর প্রয়োজনে অনুপ্রবেশ করেছিল তাকে অবান্তর হিসাবে বিসর্জনে বর্জন করায় অধিকতর ঐক্য অর্জিত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের ও বহিরাক্রমণের উপকাহিনী বর্জন করে এবং ঘটনাকালের সীমাকে সংক্ষিপ্ত করে নাটকটির ইংরাজি ভাষান্তরে তিনি আরো ঐক্য অর্জনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে পারিবারিক কাহিনী ও প্রজাবিদ্রোহের দুইটি কাহিনীর একত্র উপস্থিতির ফলে ঐক্য ছিল না, নাট্যকাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল—মুক্তধারা পরিত্রাণে তা সংশোধন করা হয়েছে। মুক্তধারায় প্রজাবিদ্রোহের, পরিত্রাণে পারিবারিক কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু এইভাবে যে ঐক্য অর্জিত হয়েছে তাই নয়, প্রায়শ্চিত্তের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য মুক্তধারায় নেই, এই পথের নাটকে কাহিনী অঙ্কদৃশ্যবিভাগহীন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে চলেছে। পরিত্রাণে যদিও নাট্যকাহিনী অবিচ্ছিন্নভাবে চলে নি তথাপি এখানেও প্রায়শ্চিত্তের অনেক কয়েকটি দৃশ্যের যোগে এক একটি দৃশ্য প্রস্তুত হওয়ায় ঐক্য বেশী এসেছে। রাজা ও রানীর পাঁচ অঙ্কে মোট ত্রিশটি দৃশ্য আছে, তপতীতে মাত্র পাঁচটি দৃশ্য। একই প্রবণতা লক্ষ করি রাজা থেকে তার রূপান্তর অরূপরতনে, অচলায়তন থেকে তার রূপান্তর গুরুতে। রাজার সঙ্গে The King of the Dark Chamber-এর তুলনা করে টমসন বলেছেন ইংরাজি ভাষান্তরে হয়েছে 'greater access to compactness'। শুধু The King of the Dark Chamber-এ কেন, সমস্ত কয়েকটি ইংরাজি ভাষান্তরকালে যখনই রূপান্তর করেছেন তখনই অপ্রয়োজন বিবেচনায় কোন কোন দৃশ্য বর্জন করে, কোন কোন দৃশ্য যুক্ত করে নাটককে তিনি

ঐক্যময় দ্রুতগামী ও লক্ষ্যাভিমুখী এবং লঘুভার করেছেন। অনেক সময় এই উদ্দেশ্য সাধন করতে যেয়ে তিনি নাটকের ক্ষতিও করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—যেমন রাজা ও রানীর ইংরাজি ভাষান্তরে। মূল নাটকের ত্রিশটি দৃশ্য ভাষান্তরে দুইটি মাত্র দৃশ্যবিভাগহীন অঙ্কে পরিণত হয়েছে। ডাকঘরে তিনটি দৃশ্য ছিল, The Post Office-এ দুইটি, মালিনীর প্রথম তিনটি দৃশ্য ইংরাজিতে একটিমাত্র নিরবচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের ষোলটি দৃশ্য রূপান্তর Sanyasi or the Ascetic-এ মাত্র চারিটি দৃশ্যবিভাগহীন অঙ্কে পরিণত হয়েছে। বিসর্জনের ভাষান্তর Sacrifice-এ দৃশ্যঅঙ্কের বিভাগের কোন বালাই নেই। চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে এগারোটি দৃশ্য Chitra-য় নয়টি, আবার নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় ছয়টি। শুধু দৃশ্যসংখ্যা কমিয়ে এবং দৃশ্যগুলি দীর্ঘ করে নয়, চরিত্রসংখ্যা জনতাদৃশ্য কমিয়েও রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্য অর্জন করতে চেয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে যেখানে বিপরীত ব্যাপার লক্ষ্য করি—যেমন প্রথম সংস্করণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়ার যোগে দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্মিকীপ্রতিভায় বা চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য থেকে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে, পরিশোধ গীতিনাট্যের তুলনায় শ্যামা নৃত্যনাট্যে—যেখানে চরিত্রসংখ্যা দৃশ্যসংখ্যা বেড়েছে এবং ঘটনাবর্ত জটিলতর হয়েছে, সেখানে ঈপ্সিত ঐক্যের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করেন নি। সেখানে নাট্যকাহিনীর বিস্তারের উদ্দেশ্য নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা দান।

অবান্তর বর্জনের দ্বারা তিনি যে ঐক্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন তার প্রধান কারণ তিনি নাটকগুলিকে 'সুঠাম' এবং ফলত 'ড্রামাটিক' করতে চেয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য ছিল বহুলাংশে বর্ণনামূলক, তার মধ্যে আখ্যানকাব্যের লক্ষণ যত ছিল, নাটকের লক্ষণ তত ছিল না। নৃত্যের অতিরিক্ত মাত্রাই যে শুধু নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে যুক্ত হয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গে এসেছে নাটকীয় গতি এবং প্রত্যক্ষতা। রাজা ও রানীকে যে রবীন্দ্রনাথ তপতীতে রূপান্তরিত করেছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কুমার-ইলার প্রসঙ্গে রাজা ও রানীতে যে লিরিকপ্লাবন প্রবেশ করেছিল তা পরিহার করে রূপান্তরে অধিকতর নাট্যগুণ সঞ্চার। মায়ার খেলা গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের আলোচনাকালেও একই ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। বহু পূর্বে রচিত, ভাবালুতাময়, স্বয়ংসম্পূর্ণ গানে খচিত, তরলশিথিল এই গীতিনাট্যের কাহিনীকে জীবন-অন্তিমে রবীন্দ্রনাথ নানা উপায়ে যথাসাধ্য নাট্যগুণান্বিত

করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। যতই নাটক অবান্তর বর্জন করে ঐক্য লাভ করে ততই নাটক সত্যসত্যই ড্রামাটিক হয়ে ওঠে, ততই নাট্যকাহিনীর মধ্যে যেখানে ট্র্যাজেডির বীজ সেখানে আলোর বৃত্ত কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং ফলে সেই ট্র্যাজিক সম্ভাবনার বিস্ফোরক বারুদের মত জ্বলে ওঠা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিকে নাটককে রূপান্তরে যেমন ঐক্যময় এবং ড্রামাটিক করার চেষ্টা করেছেন আঙ্গিকগত কারণে, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যয়গত কারণে তিনি বর্জন করার চেষ্টা করেছেন ট্র্যাজিক নিষ্পত্তিকে।

রাজা ও রানী শেষ হয়েছে এলিজাবেথীয় রীতির রক্তবজ্রময় ট্র্যাজেডিতে, মৃত্যুর ঘনঘটায়, কিন্তু তার রূপান্তর তপতী ট্র্যাজেডিতে শেষ হয় নি, তার পরিণাম বিরহমিলনের উর্ধ্বে দুঃখতাপের পরপারে। রাজা ও রানীর সুমিত্রা-বিক্রমদেব, কুমারসেন-ইলার কাহিনীর মধ্য দিয়ে নষ্টভ্রষ্ট ব্যক্তিগত জীবনের প্রায়-ট্র্যাজিক পরিণাম উন্মোচিত হয়েছিল, তপতীতে পাই সুখদুঃখের উর্ধ্বে কাহিনীকে ও ভাবকে একটি স্বতন্ত্র উচ্চতর স্তরে স্থাপন। কবিকাহিনী থেকে মায়ার খেলা গীতিনাট্য মূলতঃ একই কাহিনীর প্রথম যৌবনে কৃত নানা রূপান্তর। কবিকাহিনীতে বিরহমুহ্যমানা নলিনী স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে এবং কাব্যপরিণামে নায়ক কবিরও মৃত্যু। ভগ্নহৃদয়ে চপলা নলিনীর ব্যর্থতায় কোন সান্ত্বনার ব্যবস্থা কবি করেন নি। মুরলার সঙ্গে কবির মরণমিলন ঘটেছে কিন্তু নলিনী ব্যর্থতার বোঝা বহন করে চলেছে। নলিনীর প্রতি এই অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত কবি করলেন নলিনী নাটকে। সেখানে মুরলার রূপান্তর নীরজা নাট্যশেষে নলিনী-নীরদের ব্যবস্থা করেছে এবং নিজের ব্যর্থ জীবনের বোঝাকে সে লঘু করতে চেয়েছে মৃত্যুর পথে। মায়ার খেলা গীতিনাট্যে কাহিনীর পরিণতি হলো ভগ্নহৃদয়ের অনুরূপ—মুরলার রূপান্তর শান্তার সঙ্গে কবির মিলন হলো; ভগ্নহৃদয়ের নলিনীর মতো প্রমদাও এখানে ব্যর্থ। কিন্তু কবিকাহিনী থেকে গীতিনাট্য মায়ার খেলা পর্যন্ত যতগুলি রূপান্তর পাচ্ছি তার প্রত্যেকটির পরিণতি বিষাদজনক; প্রত্যেকটি রূপান্তরে দুই প্রণয়িনীর মধ্যে একজনকে প্রেমে ব্যর্থতার গুরুতর বোঝা বহন করতে হয়েছে। প্রণয়িনীযুগলের মধ্যে কখনও একজনকে কখনও অপরজনকে বেদনাভারাক্রান্ত অন্ধকারে নাট্যকার মগ্ন করেছেন, কিন্তু কোনরূপেই সেই বিষাদকালিমাকে তিনি সম্পূর্ণ মোচন করতে পারেন নি। কিন্তু নৃত্যনাট্য মায়ার খেলায় সেই বিয়োগান্ত পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন। মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে এই প্রেমের খেলা তিনি ভেঙ্গে দিলেন 'খেলা-ভাঙার

খেলা' গানের দ্বারা। প্রমদা ও শান্তা কারো সঙ্গে অমরের মিলন হয় নি, কিন্তু তাতে ব্যর্থতাবোধের কোন সাক্ষাৎ পাই না। বিচ্ছেদবহ্নিশিখা তাদের বেদনাধূমাচ্ছন্ন নয়, তার মধ্যে এখন যেন আত্মিক সত্যের জ্যোতি জ্বলে। এইভাবে এই সর্বশেষ রূপান্তরে ট্র্যাজিক পরিণতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যে অপরাধের মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রকৃতির যাদুকরী মা মন্ত্রের জোরে আনন্দকে নিয়ে টেনেছে, তাকে অশুচি করার অপরাধের জন্য মাকে জীবন দিতে হয়েছিল। গদ্যনাট্যের শেষে মায়ের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে অপরাধের জন্য মাকে কোন মূল্য দিতে হয় নি। নাট্য-পরিণামে সে আনন্দের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, এবং সেই ক্ষমায় তার উদ্ধার। এই ক্ষমার মধ্য দিয়ে বিরোধের বীজকে যথাসাধ্য অপসারিত করার কথা পাই নটীর পূজা এবং মালিনী নাটকের পরিণামে। কিন্তু বিপরীত ব্যাপার পাই শ্যামায়—সেখানে ক্ষমা নেই, সেখানে ক্ষমাহীনতার সান্ত্বনাস্পর্শ-লেশহীন শূন্যতা। প্রত্যয়গত কারণে ট্র্যাজিক নিষ্পত্তিকে রূপান্তরে-রূপান্তরে অস্বীকার করে জীবনপরিণামে তিনি কি সেই প্রত্যয়ের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন—তা না হলে এই নিয়তিতাড়িত বিবেকদষ্ট প্রণয়ীযুগলের কাহিনী রচনায় তিনি ব্রতী হলেন কেন? শ্যামায় আমরা নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে ট্র্যাজিক পরিণতির সম্মুখীন হই—ট্র্যাজেডির অন্ধকারে একটি আলোরেখা প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে, এখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি আদিরূপে যেখানে ছিল মূর্ততা, বাস্তব পরিমণ্ডলের সুস্পষ্ট উপস্থিতি এবং মানবিকতা, সেখানে রূপান্তরে এসেছে অমূর্ততা এবং তাত্ত্বিকতার প্রাধান্য। শারদোৎসবে শরৎপ্রকৃতির বন্দনাই ছিল প্রধান, ঋণশোধ নাটকে প্রধান হয়েছে প্রকৃতির বিষয়ে কবির তত্ত্বো-পলব্ধি। শেষের রাত্রি গল্পে একটি কাহিনীমাত্র ছিল, কিন্তু গৃহপ্রবেশে নামকরণ ও অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৃত্যু যে একটি মহত্তর জীবনে প্রবেশ তার ইঙ্গিত করা হয়েছে। অচলায়তন নাটকে মঠবাসীদের জীবন-যাত্রাকে অবলম্বন করে সর্বপ্রকার গোঁড়ামি অন্ধতা এবং সর্বপ্রকার অচলা-য়তনকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস করেছিলেন। গুরু নামক রূপান্তরে শুধু নামের পরিবর্তনে নয়, নাটকের সর্বাঙ্গে সেই স্যাটায়ার-প্রাধান্য আসন ছেড়ে দিয়েছে রূপকের প্রাধান্যকে। অচলায়তনে ছিল অচলায়তন ভাঙা প্রধান কথা, গুরুতে গুরু তথা ঈশ্বরের আগমন প্রধান কথা। রাজায় বাস্তব ও অতিবাস্তবের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ছিল। রূপকত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও

বাস্তবজীবনের পটভূমিকা সেই নাটককে সম্পূর্ণ নিরবয়ব, বিমূর্ত এবং তত্ত্বসর্বস্ব করে দেয় নি। কিন্তু অরূপরতনে রূপকের অতিপ্রাধান্য পাই, বাস্তব অতি-বাস্তবের সামঞ্জস্য এই পরবর্তীরূপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং এখানে নাট্যকার বিমূর্ত-ভাবের দিকে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। প্রায়শ্চিত্ত কাহিনীনাট্য মুক্তধারায় কী ভাবে প্রতীকনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে তা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রতাপাদিত্যের নির্মম প্রতাপ কী ভাবে যন্ত্ররাজ বিভূতি এবং বাঁধযন্ত্রের প্রতীকে আরোপিত হয়েছে তাও সেই প্রসঙ্গে দেখিয়েছি। কাহিনীনাট্যের এই প্রতীকনাট্যে রূপান্তরের ফলে, এই গুণগত পরিবর্তনে ভাষাতেও এসেছে অপূর্ববর্তমান প্রতীকী ব্যঞ্জনা। রাজা ও রানী থেকে তপতীতে রূপান্তরে মানবগুণ হ্রাস পেয়েছে, ব্যক্তিজীবনের তীব্র দ্বন্দ্বসংঘাতের পরিবর্তে তাত্ত্বিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। রাজা ও রানীর ইংরাজি রূপান্তর The King and the Queen-এও এই রূপক প্রবণতার অস্ফুট ইঙ্গিত পাই ইলার শেষ উক্তিতে, যেখানে ইলা কুমারসেনের ছিন্ন মস্তক দেখে মূর্ছার প্রাক্কালে 'bridal music' শুনতে পেয়েছে বলেছে। বিবাহসংগীতের এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা রাজা ও রানী নাটকে ছিল না। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত করা অমূলক হবে না যে রবীন্দ্রনাট্যের রূপান্তরের অর্থ, পরবর্তীরূপে রূপক বা প্রতীকধর্মের, তাত্ত্বিকতার, বিমূর্ততার প্রাধান্য লাভ। কিন্তু ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই তা নয়। রথযাত্রায় ইতিহাসতত্ত্বের বিমূর্ততাই প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু রূপান্তরিত রথের রশিতে মেয়েদের বিচিত্রমুখী প্রতিক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় এমন বাস্তব পটভূমিকা এসেছে যা আদিরূপে ছিল না।

অর্থাৎ রূপান্তরের ফলে পরবর্তীরূপে আকারগত পুনর্বিন্যাস এবং সংক্ষিপ্তির ফলে এসেছে ঘনত্ব এবং সংহতি, ফলে পরবর্তী রূপে আঙ্গিকগত উন্নতি ঘটেছে নিঃসন্দেহে। অথচ এই উন্নতি সত্ত্বেও অধিকাংশ রূপান্তরে পরবর্তীরূপ যে নাটক হিসাবে সামগ্রিক উন্নতি অর্জন করতে পারে নি তার কারণ ট্র্যাজেডির উপলব্ধিকে অস্বীকারের প্রবণতা, বাস্তবতা, মানবিকতা ও অবয়বত্বের পরিবর্তে রূপকত্ব ও তাত্ত্বিকতার নিরবয়বত্বের অতিপ্রাধান্য। তাই আঙ্গিকগত নানা উন্নতি সাধন সত্ত্বেও সেই পরবর্তীরূপ সব সময় আমাদের তৃপ্ত করতে পারে না। তৃপ্তি আমরা সব সময় পাই না, কিন্তু এই রূপান্তর-পর্যায় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতার বিবর্তন-ইতিহাস ধারণ করে রয়েছে, সেই দিক থেকে এই রূপান্তরে আমাদের কৌতূহল প্রশমিত হয় না।

# রবীন্দ্রনাট্যে ঐক্য

**এক**

রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী অসংখ্য পরিবর্তন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনকালে নাট্যকাহিনীর রূপান্তরও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু নাটকগুলির আঙ্গিক বা রূপকল্পনাগত, ভাষা ও কাহিনীগত বহু বিচিত্র রূপান্তর সত্ত্বেও লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে মৌলিক তত্ত্ব-প্রত্যয়গত, রূপ-উপকরণগত সাদৃশ্য বর্তমান। ফলে নাটকগুলির মধ্যে পাই সামগ্রিক পরিকল্পনার সাদৃশ্যগত ঐক্য, এবং যে প্রত্যঙ্গগুলি মিলে সেই ব্যাপক পরিকল্পনাকে সফল করে তোলে তাদের সাদৃশ্যজনিত ঐক্য। কোন নাটকের মূল কাহিনী ঐতিহাসিক, কোনটি প্রহসন, কোনটি রূপক বা প্রতীকনাট্য, কোনটি গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য, কোনটির ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক, কোনটির প্রসঙ্গ সামাজিক—কিন্তু সমস্তের মধ্যে একটি ঐক্যময় সত্যকে, একটিমাত্র নাটকীয় কেন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বারবার অনুসন্ধান, আবিষ্কার করেছেন এবং নাটকগুলিতে নানা উপায়ে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাট্যে তত্ত্বগত বিচারে বিষয়বস্তু একটিমাত্র, জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির বিরোধ এবং পরিণামে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ। জড়শক্তি এখানে জড় বা স্থূল জগৎ নয়, রবীন্দ্রনাটকে জড়ত্ব বিবিধ বন্ধনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে; অপরপক্ষে মুক্তির অসম্বরণীয় হাতছানির মধ্য দিয়ে প্রাণের আহ্বান পরিস্ফুট। জড়ত্ব ও প্রাণের বিরোধ তাই বন্ধন ও মুক্তির বিরোধে রূপান্তরিত এবং সেই বিরোধের ফল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির মহৎ প্রকাশে। কিন্তু বিশুদ্ধ মুক্তিও বন্ধনের নামান্তর, যে মুক্তি স্নেহমায়ামমতাকে উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে সেই মুক্তি কোন্ অলক্ষ্য অবসরে বন্ধনে রূপান্তরিত হয় তা বোঝা যায় না। সেই কারণে সামঞ্জস্যের সত্যই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্যে বারংবার প্রতিধ্বনিত। অর্থাৎ যে প্রত্যয় রবীন্দ্ররচনাবলীর সর্বত্র সজীব, সেই প্রত্যয়ই এই সাহিত্যের নাট্যশাখায় অন্যভাবে রূপায়িত।

এই বন্ধন নানা রকমের। কখনও সে বন্ধন মানসপ্রেমের, সৌন্দর্যলিপ্সার, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়পরতার। মায়ার খেলার মধ্যে এই বন্ধনের পরিচয় পাই—প্রমদার ব্যর্থতার পর সংগীতে ধ্বনিত হলো,

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা। (৭)

চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে অর্জুন প্রথমে ছিল ব্রহ্মচর্যব্রতের বন্ধনে স্বেচ্ছা বন্দী। সে বলেছিল, 'ব্রহ্মচর্যব্রতধারী আমি। পতি-যোগ্য নহি বরাঙ্গনে।' কিন্তু পরে মীনকেতুর কৃপায় কুরূপা চিত্রাঙ্গদা স্বরূপা হয়ে স্বপ্নের মতো আবির্ভূত হলে সেই অর্জুন ভেবেছিল 'ধরণী খুলিয়া দিল ঐশ্বর্য আপন' এবং মুগ্ধ অর্জুন চিত্রাঙ্গদার 'চরণে শরণাগত' হয়েছিল। ব্রহ্মচর্যের বন্ধন থেকে প্রথমে অর্জুন প্রেমে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু পরে সেই সৌন্দর্যতৃষ্ণাময় প্রেমই হলো বন্ধন। নারীর ললিত লোভন লীলায় ক্লান্ত বীর ভেবেছিল 'ক্ষত্রিয়ের বাহু বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন'। সেই কুসুমের কারাগারে বদ্ধ বাতাস থেকে মুক্তিতেই নাটকের পরিণতি। অর্জুনকে অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় চিত্রাঙ্গদাও ছিল মদন-প্রদত্ত রূপের বন্ধনে নিরুপায় বন্দিনী। বৎসরকাল অতিক্রান্ত হলো; অবগুণ্ঠন মোচন করে রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা সত্য পরিচয় দিয়ে সেই রূপের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। রাজা ও রানী নাটকের নায়ক বিক্রমদেব রূপতৃষ্ণা এবং কর্তব্যচিন্তাহীন প্রেমের শৃঙ্খলে বন্দী। বিক্রম সুমিত্রাকে বলে 'সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি,' অপরপক্ষে সুমিত্রা বলে 'অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী।' নিজের ক্লান্তি অর্জুনকে রূপমত্ত প্রেম থেকে কল্যাণব্রত প্রেমে অগ্রসর করেছিল, এখানে সুমিত্রা বিক্রমকে রূপতৃষ্ণার বন্ধন থেকে মুক্ত করার সর্বচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। বিক্রম মানসপ্রেমের বন্ধনে বদ্ধ থাকলেও ইলার তীব্র গভীর ভালোবাসা দেখে শেষাংশে বিক্রম তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, কারণ সে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিল 'অতি প্রেম সহে না বিধির।' নাটকের শেষে 'সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো।' 'রূপের কালি' বা ইন্দ্রিয়জ রূপের বন্ধনে বন্দী ছিল রাজা নাটকের নায়িকা রানী সুদর্শনা। সুদর্শনাকে তাই মৃদু তিরস্কার করে রাজার দাসী সুরঙ্গমা বলেছিল, 'তুমি 'দেখব দেখব' করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে।' সেই গণ্ডীবদ্ধতা থেকে সে উদ্ধার পেতে চেয়েছে 'সকল-রূপ-ডোবানো রূপ' ইন্দ্রিয়াতীত রূপের মধ্যে। 'ইচ্ছে করছে, চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে

সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই।' যা ননির মতো কোমল, শিরীষফুলের মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো সুন্দর তা যে মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্বুদের মতো শূন্য তা বহু দুঃখে নাট্যপরিণামে রানী উপলব্ধি করেছিল। সুদর্শনা পরিণামে উপলব্ধি করল দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো কথা।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রতাপাদিত্যের বন্ধন তার রাজ্য। রাজ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এই রাজা, খুল্লতাতকে হত্যার চেষ্টায়, পুত্র পুত্রবধূর উপর নির্মমতায় প্রজাবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে, স্নেহমমতা ও মানবিক সমস্ত দাবীকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু পরিণামে একদিন তার নিজের সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল, ধনঞ্জয়কে বলেছিল, 'বৈরাগী আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাটাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।' ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তরে বলেছিল, 'মহারাজ রাজাটাও তো রাস্তা।' রাস্তার উপর যেমন কারো অধিকার নেই, তেমনি রাজ্যপালন রাজার করা উচিত নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের সঙ্গে। রাস্তা যেমন লক্ষ্যে বা গন্তব্যে পৌছানোর উপায়, তেমনি রাজ্যও উপায়, লক্ষ্য নয়। যে রাজা রাজ্যের বন্ধনে বন্দী নন, কল্যাণব্রতে মুক্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা। শারদোৎসবের সন্ন্যাসীবেশী রাজা বিজয়াদিত্য প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্যের মতো রাজ্যের বন্ধনে বন্দী নয়, কারণ সে জানে 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' যে রাজত্বের বন্ধনে প্রতাপাদিত্য বন্দী সেই বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় রাজর্ষি উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্য-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষত 'পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা' এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে। দুঃখহরণ, মঙ্গলকর্ম করা যেদিন দুঃসাধ্য হয়েছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যেদিন ভ্রাতৃবিরোধ এবং রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেদিন অস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা না করে বিসর্জন নাটকের রাজা গোবিন্দমাণিক্য স্বেচ্ছায় নির্বাসনে উদ্যত হয়েছিল, প্রকৃত রাজর্ষির মতো।

আবার ক্ষুদ্রধর্মের অনুশাসন, আচার অনুষ্ঠান ধর্মগত সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বন্ধন এবং সেই বন্ধন থেকে নিত্যধর্মের মুক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী কয়েকটি নাটকে রূপায়িত হয়েছে। বিসর্জনে রঘুপতি সেই ক্ষুদ্রধর্মের প্রতিনিধি গোবিন্দমাণিক্য তার প্রতিপক্ষ এবং সেই বাহ্যবিরোধ জয়সিংহের চিত্তক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধে রূপান্তরিত। ধর্মমত নিয়ে যে বিরোধের সূত্রপাত তার সঙ্গে

জড়িয়ে গেছে রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তির মধ্যে অধিকারের বিরোধ এবং তারো সঙ্গে জড়িয়ে গেছে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধায় এবং অপর্ণার প্রতি তার ভালোবাসায়, রঘুপতির মনে ভালোবাসার অধিকার নিয়ে ঈর্ষা। বন্ধ্যাত্বের বেদনায় জর্জরিত গুণবতীর সন্তানকামনা গোবিন্দমাণিক্যের বিবেক-নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়াকে কঠিন করেছে। গুরুর প্রতি আনুগত্য এবং গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আন্দোলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের হৃদয়ে জয়সিংহ এই বিরোধের মীমাংসা করেছে আত্মবলিদান করে এবং জয়সিংহের প্রতি স্নেহ ও সেই স্নেহভাজনের আত্ম-বলিদানের ফলে পরিণামে রঘুপতির পরিত্রাণ সম্ভব হয়েছে, তথাকথিত ধর্মের গোঁড়ামি থেকে। মালিনীর ক্ষেমংকর নতি স্বীকার করে নি, রঘুপতির মতো তার কোন পরিবর্তন হয় নি, শেষ পর্যন্ত সে ত্যাগ করে নি তার ক্ষুদ্রধর্মের বন্ধনের শৃঙ্খলকে। কিন্তু প্রণয়াস্পদের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে মূর্ছিতা মালিনী যে শেষ মুহূর্তে ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করে নিজ ধর্মের মহত্ত্ব প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করল, তারই মধ্যে ক্ষেমংকরের উদ্ধারের বীজ যেন রোপিত হলো। মালিনী গুরু কাশ্যপের কাছে নিয়েছিল বেদছাড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামি বর্জন করে সে মুক্তি পেয়েছিল করুণামৈত্রীর ধর্মে—'কানে এসে বাজে মুক্তির সংগীত।' সেই মুক্তি হয়তো একদিন মালিনীর পক্ষে বন্ধনস্বরূপ হয়ে উঠত, কিন্তু সুপ্রিয়ের প্রতি প্রেমে সে যে লজ্জার আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে। তারই ফলে সে বিশুদ্ধ মুক্তির গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে নি। নাটকে সুপ্রিয়ও এক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। ধর্মসংস্কারের বন্ধন থেকে মালিনীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই সে মুক্ত ছিল—মালিনীর ভালোবাসা তাকে সেই গণ্ডী থেকে স্বাধীন করে নি। কিন্তু মালিনীর ভালোবাসার জোরে সে মুক্ত হয়েছে ক্ষেমংকরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের নির্মম পেষণ থেকে। নটীর পূজাতেও শ্রীমতী বৃহত্তর মহত্তর নিত্যধর্মের কাছে আত্মনিবেদন করেছে আত্মবলিদানের মাধ্যমে। সেই উজ্জ্বল আত্মনিবেদন অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে, বিরোধীর বিরোধকে নিরতিশয় লজ্জিত করেছে। জয়সিংহের আত্মবলিদান যেমন রঘুপতিকে গোঁড়ামির বন্ধন থেকে, পৌরোহিত্যের অধিকার-অহমিকার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, তেমনি শ্রীমতীর আত্মনিবেদন রত্নাবলী-প্রমুখ অবিশ্বাসীর দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়েছে। অচলায়তনের মঠের মধ্যে ছিল পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য, আচারবিচারসংস্কারের প্রাণহীন বন্ধন—'মন্ত্রতন্ত্র আচার-আচমন সূত্রবৃত্তি' সব জানলা-বন্ধ-করা প্রাচীর-ঘেরা এই মঠের মধ্যে চলেছে সপ্তকুমারিকাগাথা।

পাঠ। 'প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন' কোনখানে জীবনের চিহ্ন নেই, আচার্যের ভাষায় এই মঠের সর্বত্র 'নিশ্চল শান্তি' বিরাজমান। এই বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অচলায়তনের ভিতরেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, বাইরে থেকে শোনপাংশু-যূনকেরা প্রাচীর ভেঙে সমান করে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বয়ং গুরু এসে মঠবাসীকে সেই নির্মম শৃঙ্খলার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। অচ্ছুৎ চণ্ডালিকা সমাজের নিষ্ঠুর নির্বোধ নির্দেশে সংকোচ ও ত্রাসের মধ্যে এতদিন বন্দী ছিল, বন্দী ছিল 'অপমানের অন্ধকারে', সমাজ তাকে 'চিরজীবন রেখে দিল এই ধিককারে' ; মা-র কাছে সে অভিযোগ করেছে

জন্ম কেন দিলি মোরে
লাঞ্ছনা জীবন ভরে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ। (১)

সন্ন্যাসী আনন্দ মুক্তপুরুষ আনন্দ তাকে মানবীর স্বীকৃতি দিয়ে অস্তিত্বের অসম্মান থেকে মুক্ত করেছে। আনন্দ তার 'করপুটের কমলকলিকায়' চণ্ডালিকার দেওয়া এক গণ্ডূষ জল নেওয়ায় আজ সেই অচ্ছুৎকন্যার জীবনে 'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি!' ধুয়ে গেল 'জন্মজন্মান্তরের কালী', মুক্ত হলো সে সামাজিক অবিচারের বন্ধন থেকে। এই সমস্ত বন্ধন প্রাচীন বন্ধন—এই প্রাচীন নাগপাশগুলি আধুনিক সভ্যতার মত্ত মাতঙ্গের মতো উন্মাদ অগ্রগতিতে ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অস্পৃশ্যতা, ধর্মগত সংস্কারের গোঁড়ামি ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যেমন একদিকে প্রাচীন বন্ধনগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে তেমনি অন্যদিকে গড়ে তুলছে স্বতন্ত্র চরিত্রের নূতন বন্ধন। সেই নূতন বন্ধন যান্ত্রিকতার, মনুষ্যত্ববিরহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার, জড়স্থূলশক্তির দাসত্বের, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে নূতন জাতিভেদের—এই নূতন বন্ধনকেই রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে। যন্ত্ররাজ বিভূতি বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছে—'বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে-কথা ভাববার সময় ছিল না।' রক্তকরবী নাটকে 'যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নিচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে।' যন্ত্ররাজ বিভূতির মতো যক্ষরাজ অমানবিক শক্তির জোরে গর্ব করে বলে 'সৃষ্টিকর্তার চাতুরি আমি ভাঙি।' দুই নাটকেই যান্ত্রিকতার যন্ত্রণা চিত্রিত। শেষ পর্যন্ত সেই যন্ত্র ও যান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে দুই ক্ষেত্রেই মুক্তি ঘটেছে—মুক্তধারায় বাঁধ ভেঙে জলের ধারা ছুটতে আরম্ভ করেছে, রক্তকরবীতে রাজা নিজের জালাবরণ

ভেঙে নিজের সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে পথে। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীকে যেমন একটি মানবীর কাহিনী বলে দাবী করেছিলেন, তেমনি মুক্তধারার ইংরাজি অনুবাদ The Waterfall-এর সংলগ্ন Note by the Author (The Modern Review, মে ১৯২২)-এও দাবী করেছেন নাটকটিকে 'as a representation of a concrete fact of psychology' হিসাবে। তিনিও কিন্তু ঐ মন্তব্যে স্বীকার করেছেন—'The name Free Current is sure to give rise in the readers' minds to the suspicion that it has a symbolic meaning; that it represents all that the word 'freedom' signifies in human life. This interpretation will appear to be still more obvious when it is seen that the Machine referred to in the play has stopped the flow of its water.' কালের যাত্রার রথের রশি নাটিকাটিতে রূপায়িত হয়েছে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য—কোন অর্থনৈতিক শ্রেণী যখন সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই অর্থনৈতিক শ্রেণীকে অপসারিত করে নূতন শক্তিশালী কোন অর্থনৈতিক শ্রেণী সমাজের অগ্রগতির পথকে মুক্ত করে। সমাজের রথ অচল হয়ে গিয়েছে; কে রথের রশি টানবে? 'সেদিন নেই রে যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।' দ্বিতীয় সৈনিক দুঃখ করেছে—

> মাথা দিল হেঁট করে।
> স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
> একটু ক্যাঁচকোঁচও করলে না চাকাটা।

সকলেই জানে 'আজকাল চলছে যা-কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে', কিন্তু ধনপতিও রথের রশি টানতে অক্ষম হয়েছে। সামাজিক অগ্রগতির পথ যখন অবরুদ্ধ, যখন রথ চলে না, তখন শূদ্রদল এসে রশিতে হাত লাগিয়েছে এবং 'মাতাল রথ' চলেছে ছুটে। ভবিষ্যতে কোন যুগে হয়তো শূদ্রদের টান সত্ত্বেও রথ আবার অচল হবে, তখন আসবে উলটোরথের পালা। তাসের দেশে প্রাচীন আচারবিচার ও শাস্ত্রবন্ধন এবং আধুনিক কালের একনায়কতন্ত্রের নিয়মবাঁধা শাসনের যেন এক সংমিশ্রণ ঘটেছে, চারিদিকে 'চমৎকার শৃঙ্খলা'। নিয়মের রাজত্ব তাসের দেশ 'মরা দেশ'। সব কিছুতেই এখানে নিয়ম,

> চলো নিয়ম-মতে।
> দূরে তাকিয়ো না কো,

ঘাড় বাঁকিয়ো না কো,
চলো সমান পথে। (২)

এই নিয়মের মধ্যে এল 'ইচ্ছে'। 'বিদেশ হইতে তিনটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে।' রাজপুত্র-প্রমুখ বিদেশীরা নিয়ে এল 'খ্যাপামির হাওয়া'। হরতনীর মনের মধ্যে ভ্রমর এল, অন্যান্যরাও বুঝতে পারছে তাদের এতদিনের তাসজন্মটা ছিল স্বপ্ন। রাজপুত্রের আবির্ভাব সেই বন্ধনময় নির্জীব পরিবেশের মধ্যে মুক্তি-চাঞ্চল্য সঞ্চার করল। অচলায়তনে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, রক্তকরবীতে খোদাইকরেরা সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত—কেউ ৪৭ফ, ৬৯ঙ আর তাসের দেশের গাঁইগোত্রের বিভেদ—তাদের কারো কোন মানবিক মূল্য নেই। আধুনিক কালে যাকে এলিয়েনেশন বা প্রবাসানুভূতির সমস্যা বলা হয়, এই সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই সমস্যাকে নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

ফাল্গুনীতে রূপায়িত হয়েছে কালের বন্ধন, যার অপর নাম জরার বন্ধন। ফাল্গুনীতে এবং ঋতুনাট্যে দেখানো হয়েছে নিত্যনবীনত্বের মধ্যেই কালবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জরাবুড়োকে জয় করতে গিয়ে দেখা গেল জরার গুহা থেকে বেরিয়ে এল জীবনসর্দার—'জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে তবু বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হলো না।' 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিত পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।' একথা শুধু নটরাজ পালাগানের মর্ম নয়, ফাল্গুনী ও অন্যান্য ঋতু-আবর্তন ব্যাপার অবলম্বনে রচিত ঋতুনাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জরা বা কালের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ বিশ্বপ্রকৃতির সামগ্রিক লীলায় যোগদানের মধ্যে। ডাকঘর নাটকেও এই মুক্তির আহ্বান এল বন্ধ ঘরের মধ্যে অমলের কাছে। অমল গণ্ডীবদ্ধ ঘরের নিষেধের মধ্যে থাকতে চায় না, জীবনের ক্ষুদ্রসীমায় তার আত্মা পীড়িত হয়। তাকে পথিক ডাকে, দইওয়ালার সুর তাকে উতলা করে তোলে, ছেলেদের খেলা, সুধার ফুলতোলা সব তাকে ডাকে, গণ্ডীর বাইরের মুক্তজগৎ ডাকে। সেই মুক্তিরই চরমরূপ মৃত্যু বা ঈশ্বরসন্নিধান। এ কি জীবাত্মার বন্ধনমুক্তির কথা? জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তির যে ইশারা ক্ষণে ক্ষণে জানালা দিয়ে হাতছানি দিত তার ডাকে অমল সাড়া দিল, দূত এসে জানিয়ে গেল সেই পরম মুক্তির সংবাদ—'মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।' জীবাত্মার বন্ধন থেকে গৃহপ্রবেশের যতীনও মুক্তি পেয়েছে—'মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে। আজ আমি ওপারের

ঘাটের থেকে সানাই শুনতে পাচ্ছি।' অন্যত্র আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তে যতীন বলেছে, 'শুনতে পাচ্ছ না ? আসছে। এখনি আসবে। চোখের উপর কী রকম সব ঘোর হয়ে আসছে। গোধূলিলগ্ন গোধূলিলগ্ন আমার। বাসরঘরের দরজাটা খুলবে।' যতীন জীবাত্মার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, মিথ্যাবিবাহের বন্ধন থেকে মরণবিবাহে মুক্তি পেয়েছে। মণি ছিল অন্য বন্ধনে বন্দী—সে ছিল আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ—'ভগবান ওর বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পান নি।' পিত্রালয়ের থেকে ফিরে এসে শেষে সে যে যতীনকে প্রণাম করেছে তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার হয়তো বলতে চেয়েছেন, আত্মসর্বস্বতা থেকে মণির মুক্তি সূচিত হলো এতদিনে। এই মুক্তির ইঙ্গিত অবশ্য স্পষ্ট হয় নি। অন্য এক বন্ধনে শ্যামা বন্দিনী। প্রিয়কান্তি প্রিয়জনকে পেতে যেয়ে নিজের প্রেমের কাছে কিশোর প্রেমিক উত্তীয়কে বলি দিয়েছে শ্যামা। সেই পাপের বন্ধন থেকে শ্যামার কোন মুক্তি নেই—শুধু শ্যামারই মুক্তি নেই। বজ্রসেন তাকে ক্ষমা করতে পারে নি, কবিও তাকে ক্ষমা করতে পারেন নি, 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষম হে মম দীনতা'। শ্যামা স্বকৃত পাপের কারাগারে বন্দী, হয়তো সে পাপিষ্ঠার একমাত্র ক্ষমা পাপীজনশরণ ঈশ্বরের অপরিসীম ক্ষমার শক্তিতে—অন্য কোথাও তার মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই। এক কারাগার থেকে বজ্রসেন মুক্ত হলো কিন্তু পরিণামে যাবজ্জীবন বন্দী হয়ে থাকল ক্ষমতাহীনতার কারাগারে। দান্তে-বর্ণিত নরকে পাওলো এবং ফ্রানসিসকা যেমন পাপে-গুরুভার প্রেমের বোঝার ট্র্যাজেডিতে অনন্তকাল ধরে আবদ্ধ, তেমনি এই নিষ্করুণ নৃত্যনাট্যের কাহিনীতে অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তির কোন আশা নেই। প্রেম ও পাপের জড়িত কেন্দ্রের চারিদিকে শ্যামা ও বজ্রসেন সমস্ত জীবন ধরে আবর্তন করবে।

অথচ বিশুদ্ধ মুক্তি, সম্পূর্ণ বন্ধনশূন্য মুক্তি বিপরীত পক্ষে বন্ধনেরই নামান্তর। প্রকৃতির পরিশোধে এই কথাই বলা হয়েছে। এই নাটকে দেখানো হয়েছে, যে সন্ন্যাস সংসার ও প্রকৃতিকে স্বীকার করে না, সে সন্ন্যাসও এক রকম বন্ধন, গুহা তার প্রতীক। সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে ডেকে বলেছিল

দেখার হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,  
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি  
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া

শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়। (১)

'নিজেকে অভিনন্দন করে নিজেকেই সে বলেছিল—

কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়।
জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস। (২)

অস্পৃশ্যা বালিকার ভালোবাসার স্পর্শ, সেই স্নেহের বন্ধন অবশেষে সন্ন্যাসীকে 'সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে'—সংসারবন্ধনকে সচরাচর মনে করা হয় সীমাবদ্ধতা কিন্তু এখানে বৈরাগ্য এবং মুক্তিই হয়ে উঠেছে সীমা এবং সেই সীমা থেকে অসীমের দিকে নিয়ে যায় সংসারের স্নেহমমতার বন্ধনগুলি। যে জগৎকে এতদিন মনে হয়েছিল প্রপঞ্চময়, স্নেহমমতার চোখ দিয়ে দেখলে সে জগৎকে মনোহর মনে হয়, 'ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে/তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।' বালিকাকে ভালোবেসে সন্ন্যাসী বুঝেছিল 'চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন।' সন্ন্যাস ও স্নেহের দ্বন্দ্বে এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সন্ন্যাসী আপ্রাণ প্রয়াস করেছে—কিন্তু ক্রমে সে স্নেহপ্রেমের বেদনার বন্ধনকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে তার মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ বাল্মীকি-প্রতিভায় যেমন দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে বালিকাকে দেখে অন্তর্গূঢ় করুণার ধারা অপত্যস্নেহরূপে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি প্রকৃতির পরিশোধে সন্ন্যাসের শুষ্কতার ও শূন্যতার বন্ধন ভেদ করে বেরিয়ে এল চিরকালের করুণাধারায় প্লাবিত মানুষ। চণ্ডালিকা নাটকের দুই রূপেই প্রকৃতির প্রতিশোধের বক্তব্যের ছায়া আছে—সাধক আনন্দ প্রকৃতিনাম্নী চণ্ডালকন্যার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে নি। প্রকৃতি মা-কে মন্ত্র পড়তে বলেছে 'উড়ে যাবে শুষ্ক সাধন, শুকনো পাতার মতো।' প্রকৃতির প্রতিশোধে যে কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে সেই কথাই প্রহসনগুলির মধ্যে অত্যন্ত লঘুতার সঙ্গে বলা হয়েছে। অপত্য-স্নেহের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি সন্ন্যাসীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল, প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি চিরকুমারব্রতধারী চিরকুমার সভার সদস্যদের উপর প্রতিশোধ নিল। সভার জনৈক সভ্যের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে—'যে সন্ন্যাসধর্ম বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটি কি খুব উঁচুদরের সন্ন্যাস।' যে চিরকুমার সভায় 'বিশেষত পান তামাক পত্নী নিয়মবিরুদ্ধ ছিল, সেই সভার অন্যতম সদস্য পূর্ণ অচিরকালের মধ্যে অন্তরালবর্তী অঞ্চলবদ্ধ চাবির ঝংকার শুনে উপলব্ধি করল 'গৃহস্থ সন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে

দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।' এই কর্তব্যবুদ্ধির ফল হলো জোড়ায়-জোড়ায় বিবাহ। গোড়ায় গলদ-শেষরক্ষাকেও এক অর্থে প্রকৃতির প্রতিশোধ বলা যায়। নিমাই-গদাই প্রেমকে ব্যামো বলে জানত—'বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবক-যুবতীর তেমনি এই একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা উৎকট, কারো বা একটু মৃদুরকমের।' সেই নিমাই-গদাই শেষ পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক ব্যামোর আক্রমণে নিরতিশয় বিপর্যস্ত হয়েছে—ইন্দুমতীর পুরুষবেশ দেখে পদ্যমেলানোর চেষ্টা তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক। ইন্দুমতীর প্রেমে অতি-ডাক্তারির বন্ধন থেকে সে আবেগময় স্বাভাবিক মনুষ্যত্বে মুক্তি পেল। বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকেও এই থীমটি পাই। বৈকুণ্ঠের ভাই অবিনাশ এতদিন গাছপালা এবং উড়ে মালি নিয়ে মগ্ন ছিল, তারও উপর প্রকৃতি কেদারের শ্যালিকার রূপ ধরে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে এখন উপহারের আংটি কেদারের শ্যালীর করতলে না পদতলে নিবেদন করবে ভেবে পায় না। মুক্তির উপায় নাটকে অচ্যুতানন্দের চেলা ফকির গুরুমন্ত্র আওড়ায় প্রাণপণে, কিন্তু তার সন্ন্যাসসাধনায় প্রকৃতি বাধা—মেয়ে নাকি সুরে চায় নবঞ্চুস, শ্যালী পুষ্প বিঘ্ন সৃষ্টি করে সাধনায়। বাবা পরীক্ষায় পাশ করতে উপদেশ দিলে বলে, 'গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাশ তারপরেই চাকরি।' সন্ন্যাসসাধনায় বসে বলে 'কা তব কান্তা' কিন্তু কন্যার কান্না শুনে পরের বাক্য 'কোন্ কান্‌তা হ্যায়'। পালিয়েও উদ্ধার পায় নি ফকির প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে, শেষ পর্যন্ত স্ত্রী হৈম এসে তাকে উদ্ধার করেছে। পুষ্প প্রশ্ন করেছে, 'ফকিরদা তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?' জানা গেল মুক্তি বন্ধনে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের নাট্যঘটনা লোকযাত্রাময় পথের ধারে ঘটেছে। শারদোৎসব নাটকের ঘটনাস্থানও পথ। রাজা নাটকের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে পথ। ডাকঘর নাটকের নাট্যদৃশ্য পথ; পথ দিয়ে নানাজন যায়, অমল বসে বসে দেখে—প্রহরী, দইওয়ালা, মালিনীকন্যা সুধা, ছেলের দল ইত্যাদি। দ্বারে আঘাত দিচ্ছিল রাজদূত, আঘাতশব্দ সহসা থেমে গেল কারণ 'দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে তাই আর শব্দ নেই।' অমলের ঘর ও পথের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান ছিল সেটুকুও লোপ পেল। অচলায়তন নাটকেও পথেরই প্রাধান্য। ফাল্গুনী নাটক বস্তুত পথেরই নাটক—'পথে' তার সূত্রপাত, পরবর্তী দৃশ্যগুলি—ঘাট, মাঠ, গুহাদ্বার—পথেরই নামান্তর। মুক্তধারাও

পথেরই নাটক—নাট্যকাহিনী অভিনীত হয়েছে পার্বত্যপ্রদেশ উত্তরকূটের উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাওয়ার পথে। রক্তকরবীতে ঘটনাবলী ঘটেছে জালাবরণের সামনের পথে। কালের যাত্রার রথের রশি পথেরই নাটক।

এই কারণে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির অন্তত তত্ত্বনাটকগুলির দৃশ্য 'একটি মেলা ও মেলার নিকটবর্তী একটি পথ। এটাই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে ইহার সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে।' এরই ভিত্তিতে শ্রীযুক্ত বিশী, রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়তার নাড়ির যোগ নেই, এই দায়িত্বহীন উক্তি খণ্ডন করে সিদ্ধান্ত করেছেন, 'তাঁহার নাটকগুলির অন্ততঃ তত্ত্বনাটকগুলির টেকনিকের মূলে কোন বিদেশী নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোকজীবনের প্যাটার্ন বা কাঠামোর আদর্শ।' (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ২)। অন্যত্র, 'বাংলা দেশের মেলা ও বাংলা-দেশের পথ—এই দুটি মিলিয়া যে রসের সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পরিণত নাটকের সেই রস।' টমসনও লক্ষ্য করেছিলেন 'More and more, in his later work, he deliberately cultivated the vernacular tradition and drew ever closer to the folk-play'. এবং রবীন্দ্রনাট্যের মধ্যে তিনিও দেখেছিলেন 'the drifting pageant of an Indian road.'

শ্রীযুক্ত বিশী ও টমসনের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে উপরে উল্লিখিত নাটকগুলি অধ্যয়ন করি তাহলে মনে হয় শুধু কলাকৌশল টেকনিকগত কারণে নয়, বিষয়গত-উপলব্ধিগত কারণেও পথদৃশ্য রবীন্দ্রনাটকে এমন প্রাধান্য পেয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করার পূর্বে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার করি। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয়ের কয়েকটি কথোপকথন পাই—

প্রতাপাদিত্য ॥ বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক—আমরা কোথায় লাগি? (৪/৭)

নাটকের শেষে ধনঞ্জয় উদয়াদিত্যকে বলেছে—

ধনঞ্জয় ॥ আজ রাস্তায় মিলন,—আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর

ভণ্ডামির কোন দরকার নেই—আজ আর যুবরাজ নয়।
আজ তো তুমি ভাই! আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। (৫/৪)

রাজা নাটকেও বারবার এই পথের কথা নানাভাবে পাই—

(১) প্রহরী ॥ এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। (২)

(২) ঠাকুরদা ॥ এ কী কাঞ্চীরাজ, তুমি পথে যে!
কাঞ্চী ॥ তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।
ঠাকুরদা ॥ ওই তো তাঁর স্বভাব। (১৮)

(৩) সুদর্শনা ॥ যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। (১৯)

(৪) সুদর্শনা ॥ আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে। (১৯)

বদ্ধদেশের মানুষ যারা তারা রাজার মুক্তিরাজ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে না, অরূপরতনে দেখি তারা তাদের সেই অস্বস্তি ভাষায় প্রকাশ করেছে— 'আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই।—রাম রাম।' আবার অরূপরতনের শেষে ইন্দ্রিয়ময়তার বন্ধন থেকে সম্প্রতিমুক্ত সুদর্শনার সঙ্গে সুরঙ্গমার নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ পাই।

সুদর্শনা ॥ আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না?
সুরঙ্গমা ॥ সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি। (৪)

অচলায়তন নাটকে পাই—

দাদাঠাকুর ॥ ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।
সকলে ॥ হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।
দাদাঠাকুর ॥ আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে। (২)

শেষ দৃশ্যে বর্ষাঘনঘোর দিনে আচার্যের সঙ্গে মিলনকালে দাদাঠাকুররূপী গুরু বলেছে, 'আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।' পরিত্রাণ নাটকের শেষ দৃশ্য 'পথ', এই দৃশ্যে বিভাকে ধনঞ্জয় বলেছে, 'আমি

তাঁর রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল—দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই।' বিভার সম্বন্ধে উদয় মন্তব্য করেছে, 'ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হলো!' পথের নাটক মুক্তধারায় পথের কথা পাই বারংবার। 'যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই'—তাই অভিজিৎ রাজগৃহ ছেড়ে পথে বেরোয়। সে বলে 'উত্তর-কূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।' মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে অভিজিৎ জানিয়েছে—'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।' ফাল্গুনীনাটকে শুনি 'আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই আর-কোথাও যাবার জন্য মন ছটফট করে।'

রাজা॥ সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হলো?

কবি॥ তা নয়তো কী মহারাজ। সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই চলে, সেই-তো বৈরাগী, সেই-তো পথিক, সেই-তো কবি-বাউলের চেলা। (সূচনা)

রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি। পথ সেই মুক্তিস্পৃহার প্রতীক। রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান বিষয় সর্বপ্রকার বন্ধন জড়ত্ব থেকে মুক্তি বলে সেই নাটকের ঘটনাস্থান প্রায় ক্ষেত্রেই পথ। পথ মিলনক্ষেত্র—এখানে যুবরাজে বিষয়বিরাগীতে কোলাকুলি হয়। পথ মুক্তি আনে, তাই প্রাচীর ভেঙে রাজপথ তৈরির প্রস্তাব হয়। পথ ধুলোয় ধুলোময়, পথ চলতে সেই ধুলো পায়ে লাগে গায়ে লাগে—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেখানে ব্যবধান নেই। পথে যেমন প্রকৃতি ও মানুষের কোন ব্যবধান নেই, তেমনি নেই মানুষে-মানুষে ব্যবধান, সেখানে পদমর্যাদার শ্রেণীভেদের কোন 'ভণ্ডামি' মেনে চলতে হয় না। রাজ্য হোক, ধর্ম হোক, প্রেম হোক, যতক্ষণ তা উপায় ততক্ষণ মুক্তি. কিন্তু যখনই তা লক্ষ্য হয়ে ওঠে তখনই বন্ধন। রাজ্যও পথ, ধর্মও পথ, প্রেম বৈরাগ্য সবই পথ—কিন্তু যখন পথ না হয়ে সেগুলি হয় গন্তব্য, তখন নূতন করে মুক্তির আয়োজন করতে হয়। তখন অভিজিৎকে পথ কাটার দায়িত্ব নিতে হয়, উদয়াদিত্যকে সুদর্শনাকে কাঞ্চীরাজকে পথে বেরোতে হয়। বিশ্বচরাচরে যেহেতু 'কেবলি সরা, কেবলি চলা', কখনই থামা নয়, থামলেই যেহেতু 'উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে—তাই এই বিশ্বব্যাপী চলা রূপায়িত হয়েছে পথের উপমায়। তাই রবীন্দ্রনাটকে

অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থান পথ। তাই শুধুমাত্র টেকনিকগত কারণে নয়—বন্ধন থেকে মুক্তির মূল বিষয় রূপায়ণের প্রয়োজনে প্রধানত এই নাটকাবলীতে ঘটনাস্থান হিসাবে পথের সাক্ষাৎ বারবার পাই।

সামঞ্জস্যই সত্য। বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে, সীমা ও অসীমের মধ্যে সামঞ্জস্যের বক্তব্য বারবার এই নাটকাবলীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত—সীমা যে সীমাবদ্ধ নয়, অসীম যে শূন্য নয়, এই উপলব্ধির প্রকাশেই তাদের তৎপরতা। এই সামঞ্জস্যের মূলে আছে মনুষ্যত্বের দাবী। তখনই মেনে নেব যে বিরোধী দাবীসমূহের মধ্যে সত্যকার সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যখন দেখব তা মনুষ্যত্ববিকাশে সাহায্য করে, মানবধর্মকে ব্যাহত না করে বরং পুষ্ট করে। ধর্মগত গোঁড়ামি যদি মানুষের প্রাণধর্মকে খর্ব করে, আধুনিক যন্ত্রবাদ, নিয়মানুগ সমাজব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চা যদি সেই প্রাণধর্মকে উপেক্ষা করে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের নামে বা যে কোন মহৎ ব্রতধারী যদি সেই ব্রতের মহত্ত্বের অজুহাতে মানুষের প্রাণের মৌলিক দাবীকে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধতা ঘটবে। শুধু ঘটবে না, সেই আড়ষ্টতা ও নির্জীবতার বিরুদ্ধে প্রাণের জয় অবশ্যম্ভাবী। যে কোন জড়ত্বের বন্ধন থেকে প্রাণ পরিণামে মুক্তি পাবেই—এই সত্যের প্রকাশে রবীন্দ্রনাট্যাবলী নিরলস।

## দুই

ঋণশোধে কবিশেখর রাজা বিজয়াদিত্যকে বলেছে, 'ওই মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।' জড়ের বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রাণের মুক্তিবার্তা ঘোষণায় প্রকৃতির অবদান সর্বাধিক। তাই রবীন্দ্রনাট্যে সর্বত্র দেখি প্রকৃতির সঙ্গে যাদের যোগ ছিন্ন হয় নি, প্রকৃতির মর্ম থেকে নিগূঢ় প্রাণরস পান করে পুষ্ট হয়ে তারাই জড়ের নির্জীবতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত জয়ী হচ্ছে। 'মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে।... প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবলমাত্র আছি তখন তাহা না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি।... তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ্ না লাগে, কোন গান জাগিয়া না উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

পড়ে।' আধুনিক নাগরিক মানুষ ক্রমে ক্রমে এই যে প্রকৃতি-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জড়ত্বের শাপকে আমন্ত্রণ করে আনছে তার থেকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করা, মানুষের প্রাণে প্রকৃতির সঞ্জীবনী মন্ত্রে সাড়া জাগানো রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির উদ্দেশ্য।

শরীরে জরার সর্বজয়ী চিহ্ন দেখে ফাল্গুনীর রাজা বিশ্বের প্রতি বিমুখ হয়ে বৈরাগ্যবারিধি অধ্যয়নে উৎসুক হয়েছিলেন কিন্তু কবির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন বার্ধক্যের অনিবার্য আক্রমণ থেকে উদ্ধারের উপায় বৈরাগ্যবারিধি গ্রন্থে নেই, আছে আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির উদার গ্রন্থে, যে পড়তে জানে তার অপেক্ষায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে জরার অত্যাচার নিয়ত চলছে, তবু বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হয় না। যেমন প্রত্যেক ফাল্গুনে চরাচর নূতন হয়ে ওঠে তেমনি প্রকৃতির হাতে দীক্ষিত মানুষও প্রত্যহ নবীন হয়ে উঠতে পারে। 'অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব'—এই চলমান, কম্পমান সজীব বিশ্বের সংস্পর্শ থেকেই প্রাণের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হয়। বসন্ত, নটরাজ, শেষবর্ষণ সমস্ত ঋতুনাট্যে গানে-নাচে-আবৃত্তিতে সেই প্রাণময় বিশ্বের বন্দনা করা হয়েছে, যার শক্তিতে সহযোগে মানুষ বারবার জড়ের উপর জয়ী হয়।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির মূল্য নাটক হিসাবে ততটা নয়। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন। প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে সবচেয়ে নাট্যগুণান্বিত যে ফাল্গুনী তাকেও তিনি পুরোপুরি নাটকের মর্যাদা দেন নি, বলেছেন, 'একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার।' এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক—প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, প্রকৃতির প্রতি প্রেম জন্মানো, এই নাটকসমূহ রচনার ও ঋতুতে-ঋতুতে অভিনয় করানোর প্রেরণা। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছেদ আধুনিককালে ক্রমাগত বর্ধিত হতে আরম্ভ করেছে তাকে বিদূরিত করার জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যার্থীদের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঋতু-উৎসবগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। শারদোৎসব প্রভৃতি সেই সব ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা। সেই কারণে শুধু শারদোৎসব নয়, সমস্ত ঋতুনাট্যই বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন আশ্রমের তৎকালীন পরিবেশের জন্য এই নাটকগুলিতে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। বস্তুত আশ্রমের পরিবেশ বাদ দিয়ে তাদের তাৎপর্য পুরো বোঝা যায় না।

ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে শুধু ঋতুনাট্যগুলি নয়, অন্য

নাটকগুলিতেও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সেই সর্বজয়ী অম্লান প্রাণশক্তির উদ্বোধন হয়। ঋতুনাট্যগুলিতে যে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অন্যত্র সে কথা অপরিস্ফুটতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির নানারূপের যে ইমেজগুলি এই সব নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে সেদিকে যদি আমরা মনোনিবেশ করি তাহলে দেখতে পাব প্রকৃতির অমৃতশক্তি কী ভাবে নাটকের ঘটনাপুঞ্জকে কথাপুঞ্জকে গতি ও পরিণতি দান করেছে, কী ভাবে সেই সমস্ত ইমেজের মধ্য দিয়ে বিরোধী শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব ও পরিণামে প্রাণশক্তির জয়ের ইশারা নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকেঁর প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির জন্য নাটকীয় ইমেজগুলি নাটকের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান—নাটককে মণ্ডনকলায় সুন্দর করে তোলার জন্য তাদের ব্যবহার নয়, নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য নিতান্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ইমেজগুলি প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া এই ধরনের ইমেজ একদিকে যেমন নাটকীয় বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে তেমনি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে প্রতিবিম্বিত করে। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে ব্যবহৃত ইমেজের মধ্যে দিয়ে শুধু তাদের জীবননাট্য দেখি না, বিশ্বচরাচরে ব্যাপক যে অভিজ্ঞতা তাকেও প্রতিফলিত দেখি। নাটকে ব্যবহৃত ইমেজগুলির সাহায্যে শেক্সপীয়রের জীবনেতিহাস গড়ে তোলা সম্ভব ক্যারোলিন স্পারজেয়েনের এই দাবী পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না বটে, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর ইমেজসমূহ নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই দেখিয়েছেন যে ম্যাকবেথে বীভৎস কুৎসিত পশুপাখী—লীয়ারে জলাভূমি ঝড়, টিমান রোগের চৌর্যবৃত্তির ইমেজগুলি নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনাকে কীভাবে বুনে-বুনে সার্থক করে তুলেছে। এই ইমেজগুলি আমাদের মনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে গেঁথে যায় এবং যখন সচেতন হই তখন লক্ষ্য করি সেগুলি কী আশ্চর্যভাবে অগোচরে নাটকীয় চরিতার্থতার দিকে নাটকটিকে অগ্রসর করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাট্যে প্রাকৃতিক ইমেজগুলি নাটকের মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনে স্থান পেয়েছে। সংহত নাটকে তারা ব্যাপ্তি দান করে, মানুষের জীবননাট্যের মধ্যে ইমেজগুলির সূত্রে বৃহৎ বিশ্বনাট্য প্রতিফলিত হয় এবং নাটকের মূল তাৎপর্য দ্যোতিত করার ব্যাপারে তাদের অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রধানভাবে বর্ষার কবি নন, তাঁর নাটকের মধ্যেও বর্ষার ইমেজ বারবার আসে প্রাণের বার্তাবহ হিসাবে। জলস্রোত, মেঘ, বর্ষণ—এমনি তার

নানারূপ। তার প্রতিবাদী ইমেজ কঠিন পাথর, বিশুষ্ক মরুভূমি। তার সহযোগী ইমেজ খোলা জানলা, মুক্ত বাতাস, আলো। মানুষ প্রাচীর তৈরি করে, জাল নির্মাণ করে, বাঁধ গড়ে তোলে, প্রকৃতির প্রতি বিমুখ হয়, মানুষের হৃদয় হয় মরুভূমি কিন্তু সব বাধাবন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে, সামান্য কোন সুযোগ তৈরি করে জলরাশি ঢুকে পড়ে, আলো ঢুকে পড়ে, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাস হা হা শব্দে বদ্ধ ঘরে ঢুকে বিপ্লব বাধিয়ে দেয়, সমস্ত জড়ত্ব ও নীতি-নিয়ম নাশ করে।

প্রকৃতির পরিশোধে সন্ন্যাসী বালিকাকে বলেছে—

আয় বাছা বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা!
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে! (১১)

যেখানে বালিকাকে দেখে বাল্মীকির মনে করুণার উদ্রেক হলো বাল্মীকি-প্রতিভার সেই পংক্তিগুলি অনুরূপ—

পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে। (২)

দুইক্ষেত্রেই আমরা একই সঙ্গে নাটকীয় বক্তব্যের অনুকূল ও প্রতিকূল ইমেজ পেলাম। করুণার ধারা সব-ভাসানো জলধারার মতো এল, দস্যুতার সন্ন্যাসের যে নির্মম পাষাণবাঁধ, হৃদয়ের যে মরুভূমি তা প্লাবিত হয়ে গেল তার আবির্ভাবে। গৃহপ্রবেশ নাটকে যতীন ও মাসি মণির সম্বন্ধে বলেছে—

যতীন॥ দাও ছুটি ওকে। কত দিন এ বাড়িতে ওর হাসিই শুনতে পাইনি। ওর স্রোতে নদীর জোয়ার, সে কি ঐ সব ওষুধের শিশি, আর রুগীর পথ্যের বাঁধ বেঁধে আটকে দেবে। আমার মনে হচ্ছে, অন্যায়—ভারি অন্যায়।

মাসি॥ কিচ্ছু অন্যায় নয়, একটুও অন্যায় নয়। যার প্রাণ আছে সেই তো প্রাণ দিতে পারে। বর্ষণ তো ভরা মেঘের। (১)

অন্যত্র যতীন বলেছে—'যখন থেকে শুনেছি মণি কেঁদেছে তখন থেকেই বুঝেছি ওর মন জেগেছে।' সব কয়টি ক্ষেত্রেই জলের ইমেজ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। রুগীসেবার কর্তব্যকর্ম বাঁধের মতো মণির জীবনকে বিশুষ্ক করে তুলেছে, কারণ এখনো মণি ভরা মেঘ হয় নি, যে প্রাণকে সঞ্জীবিত করার জন্য নিজেকে নিঃশেষ করতে পারে, কিন্তু মণির চোখের জল বলছে তার

আত্মকেন্দ্রিকতার পাষাণ গলতে শুরু করেছে। সুপ্রিয় মালিনীকে বলেছে 'যেদিন এ শুষ্কচিত্তে বরষিলে তুমি সুধাবৃষ্টি' সেদিন সে যেন নবজন্ম লাভ করেছে। সুদর্শনা অতৃপ্ত হৃদয়ে রাজাকে কল্পনা করেছে 'ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো'। অচলায়তন ও গুরুতে বারবার এই প্রাণদায়িনী স্নিগ্ধকারিণী বর্ষার ইমেজ পাই। মঠবাসীরা আলোচনা করে, 'বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।' পঞ্চক বলেছে, 'যতদূর শুকোবার শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।' নিষ্প্রাণ জড় নিয়ম-বাঁধা অচলায়তন সে যেন সবুজহীন রুক্ষ পৃথিবী, সমস্ত শুকিয়ে যাওয়া তপ্ত আকাশের মতো— আর প্রাণের বার্তা আসছে নীল মেঘে। নীল মেঘের গর্জন গুরু গুরু—যে পৃথিবীকে সিক্ত করবে, আর পঞ্চক প্রভৃতি গুরু গুরু মন্ত্রজপে গুরুকে আহ্বান করছে—যে গুরু বদ্ধ অচলায়তন ভেঙে মুক্তি আনবে। গুরুর আসন্ন আগমন আর বর্ষার সমাগতরাজবদুন্নতধ্বনি একাকার হয়ে গেছে। আচার্য, যে নিয়ম-বাঁধা মঠের এতদিন অধ্যক্ষতা করেছে, সে বলেছে, 'আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।' আচার্য যখন আবার বলেছে, 'আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে···আমাকে একটু রস দাও।' তখন দাদাঠাকুর-গুরু উত্তরে বলেছে, 'ভাবনা নেই, আচার্য ভয় নেই,— আনন্দের বর্ষা নেমেছে···এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ।' হৃদয়হীন নিয়ম আর শুষ্কতা ও পাথর সমার্থক, যেমন সমার্থক প্রাণ ও বর্ষার ধারা। অচলায়তন থেকে প্রাণদায়ী বর্ষার ইমেজ আরো কয়েকটি উদ্ধার করি—

(১) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় ঝরে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ছুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছো না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্। ( )

(২) মিটল এবার মাটির তৃষা—ঐ যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি। (৪)

(৩) ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—
অরণ্যের কত রাতের স্বপন দেখা বৃষ্টি। (৪)

প্রাণের যারা প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধবাদী তাদের সংলাপের মধ্যে এই বর্ষার ইমেজের সাক্ষাৎ পাই না, প্রাণের যারা স্বপক্ষ স্বাভাবিক কারণে তাদের সংলাপের মধ্যেই পাই। আচার্য অদীনপুণ্য যেহেতু বিচলিত দ্বিধাগ্রস্ত সেই কারণে তার সংলাপে একদিকে পাথরের শুষ্কতার ইমেজ পাই, অন্যদিকে জলের রসের ইমেজ পাই। ফাল্গুনীতে চন্দ্রহাসের হাসি শুনে 'যেন গুমোটের ঘোমটা খুলে গেল।' তার হাসি যেন 'বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি', 'যেন ঝরনার মতো কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।' মুক্তধারার স্রোত সাময়িকভাবে বিভূতির যন্ত্রবিদ্যার কৌশলে বাঁধা পড়ে বটে কিন্তু সেই বাঁধ শাশ্বত নয়, জলস্রোতই শাশ্বত—তাই নাটকের অন্তিমে আবার মুক্ত জলের কলোচ্ছ্বাস শুনতে পাই।

বিভূতি॥ এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়॥ নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।···

বিভূতি॥ হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে?—তার নিস্তার নেই।

নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদায় নায়িকার হৃদয় নৃত্য করে উঠলো অভাবিত আনন্দের সম্ভাবনায় সেদিন, যেদিন—

ওই দেখ, বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা—। (৬)

নৃত্যনাট্যে এই তাৎপর্যময় ইমেজপুঞ্জের অস্তিত্ব আরো প্রকট এবং তাদের ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট যে চোখে না পড়ে উপায় নেই। সখীরা গান গেয়ে বলে প্রেমহীন চিত্রাঙ্গদার জীবনে এতদিন ছিল 'প্রখর রৌদ্রের জ্বালা' আর অর্জুনের প্রতি নবজাগ্রত প্রেম এখন 'বাদল আনে আষাঢ়ের পালা।' চিত্রাঙ্গদা আজ ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান শুনতে পায়, তার শুকনো পাতার ডালে ঝড় নেমে আসুক এই প্রার্থনায় সে আত্ম-উদ্বোধনের নৃত্যে রত হয়।

রক্তকরবীর রাজা তার নিজের যান্ত্রিকতা ও জড়ত্বের স্তূপের মধ্যে সমস্ত প্রাণশক্তি হারিয়ে বসেছে। নন্দিনীকে দেখে তার নিজের বিস্মৃত অবলুপ্ত

প্রাণ ও আনন্দের কথা মনে পড়ে যায়। নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' বাঁধ ভেঙে দেবার অনুরূপ ইমেজ এই নাটকেও পাই—'আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটি সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হতো। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হয়ে পড়লো, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।' এই ধরনের ইমেজ দীর্ঘ যুক্তিপরম্পরার পরিবর্তে বসে অত্যন্ত সংহতভাবে যেন বক্তব্যটিকে সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয়—যেমন জমাজল বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে গেল তেমনি যক্ষপুরীর বদ্ধপ্রাণ রাজাও তার অনুচরবর্গের শাসন ভেঙে বেরিয়ে পড়বে। কে তাকে নেতৃত্ব দেবে? দেবে শহীদ রঞ্জন, কেননা রঞ্জন 'শঙ্খিনী নদীর মত'। নিয়ম-বাঁধা ছক্কা-পাঞ্জার রাজ্যে বিদেশী রাজকুমার প্রাণের বার্তা নিয়ে এল—আলোড়ন দেখা দিল তাসের দেশে, যারা কোনদিন প্রকৃতির দিকে তাকায় নি তারা এখন সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রাণবন্যার ইশারা এখানেও এল বর্ষার ইমেজের মধ্য দিয়ে, 'কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে এমন মেঘের ঘটা,' 'এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনায় নামলো বর্ষা।' নাটকের সমাপ্তি-সংগীতে জানতে পারলাম শুকনো গাঙে জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক এসে সব বিধিবিধান নিয়ম-নিষেধ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির অবহেলিত অবাঞ্ছিত জীবনে যে মনুষ্যত্বের প্রত্যাবর্তন হলো তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ একদিন স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না করে তার কাছে এক গণ্ডূষ জল প্রার্থনা করেছিল। চক্ষে যখন তৃষ্ণা, তৃষ্ণা যখন বক্ষ জুড়ে, যখন নগর প্রান্তে 'ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর,' যখন 'ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকী গাছের ডালে,' তখনই 'জল দাও' প্রার্থনা নিয়ে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। জল চাইল আনন্দ, প্রাণ পেল তাই প্রকৃতি। প্রকৃতির মন ছিল এতদিন 'মরুভূমির মতো; ধু ধু করে সমস্ত দিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া'—কিন্তু এখন, 'নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত—দাও জল, দাও জল।' 'এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে।' নৃত্যনাট্যে চণ্ডালিকা নবজন্মের ইতিহাস একই ইমেজের সাহায্যে জানায়—

শুধু একটি গণ্ডূষ জল
আহা নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হলো অকূল সমুদ্র···। (১)

চিরকুমার সভায় অক্ষয়বাবুর বাড়ি থেকে গান ভেসে এসেছিল 'এ পারেতে ধু-ধু মরু বারি বিনা রে।' এই প্রহসনেও শেষ পর্যন্ত প্রেমের বাদল নামায় সেই মরুভূমি শ্যামল হয়ে গিয়েছিল। গোড়ায় গলদ নাটকের প্রথমে 'সমস্ত কেমন যেন শূন্য—যেন ফাঁকা—যেন মরুভূমি'—পরে প্রেমে ও বিবাহে মরুভূমি হয়েছে নন্দনকানন। যে গানে নাটক শেষ সেই গানে মহিলাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা।' কিন্তু যে পাপের মধ্যে শ্যামা নিমগ্ন, ভালোবাসা ও ঘৃণার যে দ্বন্দ্বের মরুভূমিতে বজ্রসেন দগ্ধ তার থেকে তাদের কোন উদ্ধার নেই—এই নৃত্যনাট্যের ইমেজসমূহই তাদের নিষ্করুণ উপায়-বিহীন অবস্থাকে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলে। উত্তীয় 'মরণমরুর' পায়ে আত্ম-বিসর্জন করল, 'কারাপ্রাচীরের শিলার' মতো শ্যামার হৃদয় কঠিন—'এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়' তাই বজ্রসেন দগ্ধ। ক্ষমা বা অপাপবিদ্ধ প্রেম বর্ষার ধারার মতো নেমে এসে সেই রৌদ্রকে ছায়াস্নিগ্ধ বা সেই তপ্ত বালুকে সিক্ত করে দেয় নি। শ্যামা পৃথক, একমাত্র শ্যামারই কোন উদ্ধার নেই।

শারদোৎসবের লক্ষেশ্বর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কোন যোগ রাখতে চায় না—'ভারী বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতেই কাজে মন দিতে পারি নে।' ডাকঘরের কবিরাজ ও অচলায়তনের মহাপঞ্চক বাইরের জানলাগুলিকে একে একে রুদ্ধ করে দিতে চায়, কিন্তু রাজকবিরাজ, বালক সুভদ্র সেই জানলা খুলে দেয়। রাজ-কবিরাজ প্রবেশ করেই বলে 'এ কী চারিদিকে সমস্তই বন্ধ যে। খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জানলা আছে সব খুলে দাও।' পঞ্চক সুভদ্রকে অভিনন্দন জানায়, 'তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।' নিয়মে অভ্যস্ত সুভদ্রের মনে হয় জানলা খুলে সে বুঝি পাপ করেছে কিন্তু পঞ্চক জানায় সে তো পাপ করেই নি, বরং মহাপুণ্যকর্ম করেছে। সেই জানলা দিয়ে বহির্জগতের ঝড়ো বাতাস আসে। যূনকের দল অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে দিলে মঠবাসী বালকদল পরম খুশি—'দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।' তাসের দেশের 'হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে।' ফাল্গুনীর

দাদা বয়সে নবীন হওয়া সত্ত্বেও বড়ো বেশী প্রবীণ স্বভাবের দিক থেকে—কারণ 'এখনো বাহিরের হাওয়া তাহাকে বেশী করিয়া লাগে নাই।' রাজা নন্দিনীকে বলে 'যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো।' এই উদ্দাম হাওয়ায় অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে গিয়েছিল, চণ্ডালিকাতেও এমনি করে পৃথিবী কাঁপিয়ে তার আগমনীর ঝড় এসেছিল। জানলা দিয়ে শুধু মুক্তির ঝড় আসে না, প্রাণের আলোও আসে। অমল জানলায় বসে শরতের রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে, রক্তকরবীর রাজার জালাবরণের সামনে খেলা করে 'পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য' নিয়ে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গান যক্ষপুরবাসীদের বিচলিত করে। সেই রৌদ্র যে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায়, মুক্তির ইচ্ছা যোগায় তা বোধহয় রাজা অনুমান করতেও পারে না। ফাল্গুনীর চন্দ্রহাসের হাসি শুধু ঝরনার কলোচ্ছ্বসিত জলের মতো নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি 'যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কারাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।'

## তিন

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই চরিত্রগত কাঠিন্য আসে ততই মানুষ প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু শিশু ও বালকেরা সেই কাঠিন্যের দুর্গ্রহ থেকে মুক্ত বলে প্রকৃতির শ্যামবর্ণ জগতের সঙ্গে তাদের কোন বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশু ও বালকেরা তাই মানুষের জগতে প্রকৃতির প্রতিরূপ। তাছাড়া মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ধারা যে প্রতিনিয়ত নবজন্মের মধ্য দিয়ে জরাকে-মৃত্যুকে অতিক্রম করে নবীনত্ব পাচ্ছে তারও স্পষ্ট প্রমাণ শিশু এবং বালকবৃন্দ। প্রকৃতির প্রাণশক্তির মনুষ্যরূপ তাই শিশু, ঋতুতে-ঋতুতে যে প্রাচীন প্রকৃতির নবীনত্ব সেই নবনবীনত্বের মনুষ্যরূপও শিশু, কেননা সে নবজাত। প্রকৃতি প্রতিদিন নূতন বলে গ্লানি কালিমা তাতে জমতে পারে না, সে নিয়ত পরিশুদ্ধ। শিশুও তেমনি মানবজগতে নিত্যনবীনের বার্তাবহ বলে সেও চির-অমল। মানুষের মধ্যে তাই যা শুভ, যা মঙ্গলময়, যা প্রাণমন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত, জীবিত, নিত্যই নবীন, রবীন্দ্রনাটকে তা শিশু, বালকবালিকা বা যুবক-যুবতীর মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে ওঠে। নিয়মবাঁধন তখনও তার উপরে চেপে বসে নি, প্রথাসংস্কার তার স্বতঃস্ফূর্ততাকে

অবরুদ্ধ করতে পারে নি, এখনও সে গাঁইগোত্র জাতিভেদ ইত্যাদি বুঝতে শেখেনি—সুতরাং তার সঙ্গে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দিত জীবনীশক্তির প্রচ্ছন্ন যোগটি নষ্ট হয়ে যায় নি। যাদের চিত্ত কঠিন হয়ে গেছে, হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হয়ে গেছে, মৌলিক মনুষ্যত্ব খর্ব হয়ে গেছে, তারা সহসা তাই বালক-শিশুর সাহচর্যে এসে নূতন অকলুষ দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখার সুযোগ পায় এবং যে জীবনধারাকে এতদিন তারা স্বাভাবিক ও সংগত বলে মনে করে এসেছিল আজ তার পরিবর্তন-সাধন প্রয়োজন বলে অনুভব করে।

'বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হলো তার অন্তর্গূঢ় করুণা'—এ কাহিনী রামায়ণেরই কাহিনী কিন্তু রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণ সরে এসে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্য দিয়েই বালক-বালিকা-শিশুচিত্তের উপর রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেন তা বোঝা যায়। ব্যাধ-কর্তৃক ক্রৌঞ্চবধের পূর্বেই বাল্মীকির অবরুদ্ধ হৃদয়ে করুণার স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে অরণ্যে পথভ্রান্ত বালিকাকে দেখে। দস্যুদল যখন সেই ত্রস্ত বালিকাকে কালীপ্রতিমার সামনে বলিদানের জন্য নিয়ে এল তখন বালিকার অকলুষ মুখের দিকে তাকিয়ে বাল্মীকির প্রস্তরীভূত হৃদয় আজ প্রথম দ্রবীভূত হলো। উদ্বোধন হলো অপত্যস্নেহের, জাগ্রত হলো প্রচ্ছন্ন পিতৃহৃদয়, বাল্মীকির পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটল বালিকার আবির্ভাবের ফলে। বাদুড় ও প্রাচীন ভেকে পরিপূর্ণ গুহার অন্ধকারে বাসী সন্ন্যাসীও উদ্ধার পেয়েছিল এক বালিকার সংস্পর্শে এসে। জ্ঞান-চিতানলে সে বিশ্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, মনে হতো তার আলোক তো কারাগার; সেই সন্ন্যাসী ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর অস্পৃশ্যা কন্যাকে নিয়ে এল ঘরে নগরবাসীদের ঘৃণার হাত থেকে উদ্ধার করে। ধরা পড়ল সন্ন্যাসী তার স্নেহের বাঁধনে। বারংবার অন্তর্দ্বন্দ্বে সে পীড়িত হয়েছে, বালিকা তাকে পিতা বলে সম্বোধন করলে সে বালিকাকে 'প্রকৃতির গুপ্তচর তুইরে রাক্ষসী' বলে দূর করে দিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর ব্রত রসাতলে দিয়ে নয়ন-আনন্দ হৃদয়ের ধন বালিকার কাছে তাকে ফিরে আসতে হলো। রাজর্ষি উপন্যাসে দেখি গোবিন্দমাণিক্য ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে বলিদান-প্রথাকে মেনে এসেছে, কোনদিন বাধা দেবার প্রশ্ন তার মনে দেখা দেয় নি, কিন্তু হাসি আর তাতা যেদিন মন্দির সোপানে রক্তের দাগের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিন রাজা শিউরে উঠল; নিরন্তর এই মৌলিক প্রশ্ন চিত্তে তার ধ্বনিত হতে

থাকল 'এত রক্ত কেন'। রাজা সেদিন থেকে রক্ত মুছবার ব্রত গ্রহণ করল। বিসর্জন নাটকে বালিকা অপর্ণার মুখ থেকে ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বালিকার স্নেহের ছাগশিশুকে বলিদানের জন্য ছিনিয়ে নেওয়া, মন্দিরসোপান রক্তের বন্যায় প্লাবিত করে দেওয়া, এর মধ্য দিয়ে কোন্ পুণ্য অর্জিত হতে পারে এই প্রশ্ন অপর্ণার আবির্ভাবের ফলে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে। নিদ্রিত বালক ধ্রুবের মুখের দিকে তাকিয়ে সংস্কারের পাষাণভারে কঠিনহৃদয় রঘুপতির মনে পড়ে যায় জয়সিংহের শিশুকালের কথা, কেননা পিতৃমাতৃহীন জয়সিংহ এমনি শৈশবে একদিন তার কাছে এসেছিল। জয়সিংহ সম্বন্ধে রঘুপতির এই স্নেহস্মৃতিরোমন্থন নাটকের পক্ষে মূল্যবান, কেননা অপর্ণার প্রশ্নে যেমন গোবিন্দমাণিক্যের চৈতন্য দেখা দিয়েছিল, তেমনি স্নেহভাজন জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে রঘুপতির চেতনা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং বালক ধ্রুবের মুখের দিকে তাকিয়ে যে স্নেহকরুণার উৎসমুখের সামান্য উদ্‌ঘাটন তা রঘুপতির পরবর্তী পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করে।

বালক সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে দিয়ে সহসা বদ্ধ পরিমণ্ডলে বহির্জগতের ঝড় ডেকে নিয়ে এল। অচলায়তনের শিক্ষার অবশ্য মহিমা আছে—কৌতূহলের বশে সুভদ্র জানলা খুলেছে বটে কিন্তু সেই কর্মের ফলে পাপের আতঙ্কে সে মুহ্যমান, স্বেচ্ছায় সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। মূঢ় অভ্যাসের কাছে তার আত্মবলিদানে বাধা দিয়েছে আর এক বালক, যে গুরুর সত্যকার শিষ্য, যে পাহাড়মাঠে পালিয়ে বেড়ায় এবং শোণপাংশু বা যূনকজাতির সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠাবোধ করে না। পঞ্চকও প্রায়-শিশু, সে মঠবাসী সুভদ্র প্রভৃতি শিশুদের সম্বন্ধে বলে, 'এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড়ো হলেই আর তখন—।' যে আচার্যের ক্ষুধা পুঁথির শুকনো পাতা মেটাতে পারে নি সেই আচার্যের পরিবর্তন আরম্ভ হলো সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে। সে নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করবে কেননা সুভদ্রের মতো বালককে মহাতামসব্রত পালনে বাধ্য করে যে নিয়ম সেই নিয়মের যে নিয়ন্তা সেই আসলে পাপী। সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার অবলম্বন করে একদিকে বিধানরক্ষক মহাপঞ্চক, অন্যদিকে নিজ বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আচার্য অদীনপুণ্য—এই বিরোধের মধ্য দিয়েই ভেঙে পড়ল অচলায়তনের সমস্ত প্রাচীর, সমস্ত মূঢ়ত্ব ও জড়ত্বকে অতিক্রম করে জয়ী হলো অপরাজেয় প্রাণশক্তি। সুভদ্রের ব্যাপার এবং

বালক পঞ্চকের সান্নিধ্য আচার্য অদীনপুণ্যকে উৎসাহিত করেছিল বিদ্রোহে। তিনি পঞ্চককে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতে মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, মানুষের মন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি-প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।' শারদোৎসব-ঋণশোধের ছেলের দল প্রকৃতির প্রাণশক্তির প্রতীক। উপনন্দ পুঁথি চিত্র-বিচিত্র করে তার প্রভুর ঋণ শোধ করে আর 'প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানারূপে নানারসে শোধ করিয়া দিতেছে।' নির্বাক যে প্রকৃতি তার সত্তার নিয়ে শরৎচরাচরকে প্রভাত-স্বপনে মুগ্ধ করে রাখে, উপনন্দ ও অন্যান্য বালক সেই প্রকৃতিরই মানবরূপ। প্রাচীন সাহিত্যের শকুন্তলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে।' শারদোৎসব-ঋণশোধ বা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটক সম্বন্ধে এই অভিযোগ খাটে না। ফাল্গুনীর গুহা থেকে বেরিয়ে এল জীবনসর্দার, যে গুহায় নবীনের দল গিয়েছিল জরাবুড়োকে বন্দী করার জন্য। জীবনসর্দারকে বেরিয়ে আসতে দেখে মন্তব্য করা হলো 'এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।' বালক অমলের আগমনে মাধব দত্তের ঘর সত্যকার ঘরে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ঘরের বাইরের টান, প্রকৃতির সজীব রোমাঞ্চকর হাতছানিও অমল জানে। সমুদ্র পাহাড় অরণ্যে কোথায়ও কিছু আর বহির্মুখী মনকে বাধা দিতে পারে না সমুদ্রের ধারে ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ণনা তাকে উদাস করে দেয়, মুক্তির সংবাদ নিয়ে যে ডাকহরকরা আসছে তার পদধ্বনি সে যেন শুনতে পায় 'কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে'। যে পৃথিবী কথা কইতে পারেনা তার কথা সে শুনতে পায় বলেই দইওয়ালা লাভক্ষতির হিসাব ভুলে যায় তার সান্নিধ্যে এসে, এমন কি মোড়লের পর্যন্ত পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়, নিদ্রাগত বালক অমলের পাশে বালিকা সুধা বিনা দামে ফুল রেখে যায়। সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোর নন্দিনীর নাম মন্ত্রজপের মতো উচ্চারণ করে রক্তকরবীর বদ্ধ মৃত্তিকাপ্রোথিত গৃধ্নু আবহাওয়ায় যেন প্রাণবন্দনাগান গায়। জঞ্জালের পিছনে এই বালক একটি রক্তকরবীর গাছ পেয়েছে তারই ফুল সে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নন্দিনীকে নিত্য যোগান দেয়। যক্ষপুরীতে রক্তকরবী পিতৃমাতৃহীন থাকা যেমন আশ্চর্যের, তেমনি সুড়ঙ্গ খোদাইকরদলের মধ্যে কিশোরের

বেঁচে থাকাও পরমাশ্চর্যের। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও প্রাণ বেঁচে থাকতে পারে বলেই প্রাণ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, যক্ষপুরীর কৃত্রিমতা ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে যায়।

এই বালকেরা সকলেই পরিবার-পরিচয়হীন। বাল্মীকি বালিকাকে পায় গভীর অরণ্যে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী বালিকাকে পায় পথের প্রান্তে। যদিও এই বালিকার পিতৃপরিচয় জানি, কিন্তু সংসারে সে নিরাশ্রয় যতক্ষণ সন্ন্যাসী তাকে আশ্রয় না দেয়। বিসর্জনের ভিক্ষুক বালিকা অপর্ণার পূর্ব-পরিচয় কেউ জানে না। সে জয়সিংহকে বলে

জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। (১।৩)

অপর্ণার কেউ নেই, অনাথ বালক জয়সিংহ একদিন ত্রিপুরেশ্বরীদেবীর মন্দিরে রঘুপতির কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। নাটকের শেষে জয়সিংহ রাজবংশের সন্তান একথা জানা যায় বটে, কিন্তু আশৈশব সে ছিল সংসার-সমুদ্রে ভাসমান একজন মূলহীন মানুষ। কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে ধ্রুব, যে ধ্রুব রাজার হৃদয়ে স্নেহের আসন পেতেছে, যে ধ্রুবের ঘুমন্ত মুখ সিক্ত করে দিয়েছে রঘুপতির পাষাণহৃদয়। মুক্তধারার ঝরনাতলায় কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে অভিজিৎ, যে বাঁধ-মুক্ত ধারার সঙ্গে পুনরায় ভেসে চলে গেল। উপনন্দ ও সুভদ্রের পরিচয় অজ্ঞাত। উপনন্দের মাতৃপিতৃহীন অসম্পৃক্ত অবস্থার পরিচয় পাই নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিতে—'ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্যদেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলাম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচজাতি মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো।' সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন; লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি।' ডাকঘরের অমল মাধব দত্তের সংসারে অল্প দিনের অতিথি। মাধবের কথায় তার পরিচয় জানি, 'আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।' শুধু অমল

নয়, এই বালকেরা সকলেই যেন গল্পগুচ্ছের অতিথি গল্পের তারাপদর মতো সংসারস্রোতে নির্লিপ্ত ভাসমান, সংসারের পঙ্ক তাদের স্পর্শ করে না। ক্ষণস্থায়ী তাদের আবির্ভাব অথচ সেই ক্ষণকালীন প্রভাবেই পারিপার্শ্বিকে বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। তারপর তারা আবার কোন্ আহ্বানে কোথায় চলে যায়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল প্রকৃতির উপর যেমন কোন আধিপত্য খাটে না তেমনি এইসব ক্ষণিকের অতিথির উপরেও কোন আদেশ-নিয়ম-বন্ধন খাটে না—প্রকৃতির মতো তারা চিরমুক্ত চির-উদাসীন। রবীন্দ্রনাট্যে যে কারণে ঘটনাস্থান প্রধানত পথ, সেই কারণে এই জাতীয় নিরুপাধি নির্লিপ্ত বালকবালিকার তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ। বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা দুই-ই দ্যোতিত করে। পথ যেমন থামে না, কোন মহত্তর পরিণামের দিকে ক্রমাগত নিয়ে যায়, তেমনি এই নির্লিপ্ত বালক-বালিকার দল বন্ধন খুলে খুলে দেয়—নিজেরা মুক্ত, পরিবেশকেও তারা মুক্তি দেয়।

কখনও যেমন পবিত্রতা-প্রতীক প্রকৃতিসহচর শিশু বা বালকবালিকার মধ্য দিয়ে জড়ত্বশাপগ্রস্ত পরিবেশের মধ্যে প্রাণের নূতন উদ্বোধন ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ হয় তেমনি রবীন্দ্রনাট্যে কখনও কখনও যুবকযুবতীর প্রেমের মধ্য দিয়ে সেই প্রাণশক্তির আবির্ভাব ঘটে। প্রেমহীন মানুষের বিরস দিনে যখন মহাসমারোহে প্রেম আসে তখন তার অভ্যস্ত চতুষ্পার্শ্ব সম্বন্ধে নূতন করে সে সচেতন হয়ে ওঠে; যা সেই নবোন্মেষিত প্রেমের বিরোধী তাকে অস্বীকার করে, যা সেই প্রেমের স্বপক্ষ একমাত্র তাকে সে সত্য বলে জানে। শিশুর উপস্থিতি যেমন বিধি-বিধানের কঠোরতাকে শিথিল করে দেয় প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ততাও তেমনি নীরস বিধি ও বিধানের মধ্যে প্রাণের ও মঙ্গলের উদ্বোধন ঘটায়। যে জয়সিংহ এত দিন রঘুপতির নিঃসংশয় শিষ্যত্ব করে এসেছে তার মধ্যে আজ যে দেবীপূজায় পশুবলিদান বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় তার অন্যতম প্রধান কারণ অপর্ণার প্রতি তার প্রেম। অপর্ণার প্রতি প্রেমের পরম সাহসেই রঘুপতির বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি জয়সিংহ পায়। রঘুপতিও বুঝতে পেরেছে জয়সিংহের আনুগত্য বিষয়ে ঐ ভিখারিণী বালিকাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শেষাবধি জয়সিংহ এই দুই জনের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোন মীমাংসা করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় জ্ঞান করেছে। মহিষীর মতে সুরমা উদয়াদিত্যকে 'জাদু করে রেখেছে' এবং সেই সুরমার প্রেমের জোরে প্রায়শ্চিত্তে উদয় পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রতাপাদিত্য বোঝে সুরমাও তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই উদয়কে বলে 'তিনি ( অর্থাৎ সুরমা ) মনে রাখেন

যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।' রাজা ও রানী নাটকে কুমারের ছিন্ন মুণ্ড আনয়ন এবং সুমিত্রার মৃত্যুর ঘটনার পূর্বে কুমারের প্রতি ইলার অতিতীব্র অনুরাগ বিক্রমদেবের পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সত্যধর্ম কাকে বলে পূর্ব থেকে তা জানলেও, মালিনীর প্রতি ভালোবাসার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতা ক্ষেমংকরের প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয় ধর্মগত গোঁড়ামির শাপ এবং ক্ষেমংকরের ব্যক্তিত্বের চাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। মালিনীর প্রতি অনুরাগে যেমন সুপ্রিয় নিত্যধর্মকে চিনতে পেরেছে, তেমনি সুপ্রিয়ের প্রতি নবজাগ্রত অনুরাগে যে মালিনী ইতিপূর্বে দেবীরূপে বন্দিত হচ্ছিল সে মানবী হয়েছে—দেবীত্বের নীরক্ত সুদূরতার বন্ধন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। যক্ষপুরীর বদ্ধ পরিবেশে আলোর ফোয়ারার মত আবির্ভূত হবার, রাজার বদ্ধ জানলায় করাঘাত করার সাহস নন্দিনীকে যুগিয়েছে প্রেম। রঞ্জনের প্রেমের বলে বলীয়ান নন্দিনী যক্ষপুরীর পাথর-চাপা পরিমণ্ডলের মধ্যে বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে, যে ছন্দে বস্তুর বিপুলভার লঘু হয়ে যায়, সেই ছন্দোময় প্রাণবাঁশি বাজাতে সাহস পায়। বিশু একদিন অভিমানে নিজের হৃদয়ের আকাশখানাকে হারিয়ে পিণ্ড-পাকিয়ে-যাওয়া যক্ষপুরীর অভিজাতদলে নিজেকে উন্নীত করেছিল কিন্তু দুখজাগানিয়া নন্দিনীর আবির্ভাব তার হৃদয়ে লোনাজলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিল—নূতন প্রেমে সে তার পিষ্টপ্রায় মনুষ্যত্ব আবার ফিরে পেল। রাজা যে পরিণামে জাল ভেঙ্গে বেরিয়ে এল নিজের ব্যবস্থা ও বিধির উপর বিদ্রোহ করে তারও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে নন্দিনীর প্রতি রাজার প্রেম। যে নন্দিনীর চুলের কালো ঝরনার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রাজা শান্তি পায় সেই নন্দিনীকে সাথী করে তারই হাতে হাত রেখে রাজা নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি নিজের উদ্ধত আরক্তিম প্যাশনে বন্দী হয়ে বসুন্ধরামন্ত্রে বন্দী করতে চেয়েছিল আনন্দকে, টলিয়ে দিতে চেয়েছিল পুণ্যবানদের স্বর্গলোক কিন্তু পরিণামে প্রেমের মহত্ত্বে চণ্ডালিকা প্রাকৃতিক তথা জৈবিক প্যাশনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল মন্ত্রে-বন্দী আনন্দকে দেখে। এখন তার উদ্দেশ্য পুণ্যবানদের স্বর্গলোক টলিয়ে দেওয়া নয়, নিজের উদ্ধার—'টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে।' পরিণামে প্যাশনের রক্তিম চাঞ্চল্য নয়, আত্মনিবেদনের নম্র স্বর ধ্বনিত হলো—'জয় হোক তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।' প্রহসনের মধ্যে একই কথা লঘুভাবে উচ্চারিত। গোড়ায় গলদ-শেষরক্ষায় ইন্দুমতীর প্রেমে নিমাই-গদাইয়ের

পরিত্রাণ। প্রেমের স্পর্শে পরিত্রাণ পায় নি শ্যামা ও বজ্রসেন। অন্য সমস্ত নাটকে প্রেম যেদিকে সত্য ও ধর্ম সেই দিকে, কিন্তু শ্যামা নাটকে প্রেম ও ধর্ম সুহৃৎ নয়, তারা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার তুলনামূলক আলোচনা কালে প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন শ্যামা সম্বন্ধে সেই মন্তব্য খাটে—'যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; সেইজন্যই সেই প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া ওঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।' কালিদাসের কাব্যে অবশ্য আদর্শলোকে ঔচিত্যের জগতে প্রেম ও ধর্মের সামঞ্জস্যের দ্বারা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু শ্যামা ও বজ্রসেনের জীবনে প্রেম ও ধর্মের কোন সামঞ্জস্য ঘটে নি, তাই প্রেম একমাত্র তাদেরই পরিত্রাণ দিতে পারে নি।

শিশুরা বালকেরা প্রেমিকেরা প্রকৃতিজগতের সঙ্গে প্রাণসত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণসত্তার মানবরূপ। আগেই বলেছি বয়স্ক মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের এই কাব্যধারাটি ক্রমে বিশুষ্ক হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন বয়স্ক মানুষ বয়সের পাথরের তলদেশে সেই সজীবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। তারা বয়স্ক শিশু, সাংসারিক বুদ্ধি তাদের শিশুচিত্তকে কলুষিত করতে পারে নি। রবীন্দ্ররচনায় এই ধরনের চরিত্রের আদিপুরুষ সম্ভবত বউঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায় এবং রাজর্ষির বিল্বন। যে পাঠান বসন্ত রায়কে হত্যার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, তাকে সে বয়াৎ শোনায়, সেতারের ঝংকার শোনায়। সে সুরমাকে বলেছে, 'গোটা পনেরো নতুন গান আর এক মাথা পুরোনো পাকা চুল এনেছি—সমস্ত নিকেশ না করে নড়ছিনে।' এই জাতীয় বৃদ্ধ-বালকের সঙ্গে তরুণের মিল বেশি—তাই বসন্ত রায় ও উদয়াদিত্য দুইজন দুইজনের বন্ধু। কতিপয় বালককে বসন্ত রায় গান শোনায়, আসন্ন রাসলীলায় ধুম হবে তাই। তারা বয়সনির্বিশেষে সর্বজনের বয়স্য, তারা না থাকলে পৃথিবীর অস্তিত্ব লবনহীন হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাট্যে বারংবার এই ধরনের বয়স্ক শিশুর সাক্ষাৎ পাই—তাদের কখনও নামকরণ হয়েছে, কখনও তারা সর্বজনের কাছে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর বলে পরিচিত। তাদের চর্ম লোল হতে পারে, কেশ ধূসর এবং চক্ষু-জ্যোতি স্তিমিত হতে পারে কিন্তু প্রাণের শৈশব-উৎসাহ তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। কোন্ খ্যাপা যেন তাদের পাড়ায় পাড়ায় প্রাণের আতিশয্যে খেপিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাহ্য-

বার্ধক্যের অন্তরালে যে নিত্যবালকত্ব তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একথা নাটকগুলিতে বারবার বলা হয়েছে। ঋণশোধে কবিশেখর বলে, 'এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওর সাজমাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।' শারদোৎসবে ঠাকুরদাদা বালকদের সম্বন্ধে বলে, 'হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়।' ফাল্গুনী নাটকে এই সত্যকেই প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বপৃথিবীর জরার মধ্যে তার যৌবন যেমন অক্ষুণ্ণ, তেমনি বার্ধক্য সত্ত্বেও মানুষ তার অন্তরের যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে—'বুড়ো হয়ে মরব, তবু বয়েস হবে না' এবং 'প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন'। শারীরিক জরা এই ঠাকুরদা জাতীয় চরিত্রের মনকে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। চিরকুমার সভার রসিকও এই জাতীয় চরিত্র—বয়সলিঙ্গ নির্বিশেষে সে সকলের বন্ধু এবং রসিকের নবীনতা বাহির থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়, তিনি 'অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য-প্রবীণতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন'।

পুরবালা ॥ আজ যে রসিকদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।
রসিক ॥ ভাই, তোর রসিকদার মুখের ওই রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে। ( ১/২ )

রাজার ঠাকুরদা বলে, 'আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।' ডাকঘরে ঠাকুরদা নিজের পরিচয় দেয়, 'ছেলে খেপাবার সর্দার'। সংসারী মানুষেরা, যারা জন্মপ্রবীণ, তারা ঠাকুরদাকে ভয় করে চলে, 'ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।' 'অচলায়তন নাটকে দাদাঠাকুর যখন গুরুরূপে মঠপ্রাচীর ভেঙে প্রবেশ করে তখন মঠবাসী বালকদের সঙ্গে সে খেলার প্রস্তাব করে—'আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব', 'নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের', 'আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।' পৃথিবী বাইরে প্রবীণ, কত কোটি বর্ষ তার বয়স, অথচ ঋতুপরিক্রমায় অন্তরের সঞ্চিত রসে সে নিত্যই নবীন হয়—রবীন্দ্রনাট্যের এই সব দাদাঠাকুর-ঠাকুরদা চরিত্রও বাইরে প্রবীণ কিন্তু জীবনকে ভালবেসেছে বলে তাদেরও নবীনতার শেষ নেই। ঠাকুরদা-জাতীয় চরিত্র শুধু বয়স্ক শিশু বা ছেলে-খেপাবার সর্দার নয়, সে যে নিত্যনবীভূত প্রকৃতির প্রতিকল্প একথা ডাকঘরের ঠাকুরদা নিজেই বলেছে, 'একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো।'

প্রাণশক্তিকে কল্যাণকে তারা অন্তরে সজীব রেখেছে বলেই এই ঠাকুরদা-জাতীয় চরিত্র শুধু প্রকৃতিজগৎ নয়, অধ্যাত্মজগতের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত, তারা যেন ঈশ্বরের বান্ধব, ঈশ্বরের মুখপাত্র। রাজা নাটকে ঠাকুরদা যেমন বলেছে—'আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ', তেমনি শারদোৎসবে সন্ন্যাসী-বেশী বিজয়াদিত্য বলেছে, ঈশ্বর সকলের সঙ্গে ঠাকুরদার মত হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে বসেছেন। এই হাসি ও আনন্দের সম্বন্ধেই ঠাকুরদা ঈশ্বরের মানুষকে একদিকে প্রকৃতিজগতের দিকে অন্যদিকে অধ্যাত্মজগতের দিকে আহ্বান করেছে। শারদোৎসবে সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরদা তার বন্দনাকারী, পরে তার ব্যাখ্যাতা এবং ভক্ত। ডাকঘরের ঠাকুরদা ক্রৌঞ্চদ্বীপের যে বর্ণনা দেয় তার মধ্যে একদিকে যেমন প্রকৃতির আনন্দসৌন্দর্য-লোক উদ্‌ঘাটিত, অন্যদিকে তেমনি তার অধ্যাত্মব্যঞ্জনাও সুস্পষ্ট। এই ঠাকুরদা অন্ধকারের রাজাকে জানে—'ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত'—তবু সেই কঠিন পথের সন্ধানী—এই সব বয়সে প্রবীণ আসলে নবীন ঠাকুরদা এবং দুই দিক থেকেই নবীন অমলের দল। অন্ধকারের রাজা অন্ধকারে থাকে বটে কিন্তু ঠাকুরদা জানে 'সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা।' রাজার তথা ঈশ্বরের অস্তিত্বে যারা অবিশ্বাসী, ছদ্মরাজা দেখে যারা আসল রাজা বলে ভুল করে, এই ঠাকুরদা তাদের সংশয় দূর করার ব্রত গ্রহণ করে—এমন কি কখনও রুদ্ররূপে যোদ্ধবেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। অচলায়তনের দাদাঠাকুর স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার করে না, পাহাড়মাঠের উদারক্ষেত্রে সে বিচরণ করে, নিজেও সে স্থির নয় বলে সর্বজনের মধ্যে অস্থিরতার চাঞ্চল্য সে জাগিয়ে তোলে—সেও কোন এক অদৃশ্য রাজার আদেশের ব্যাখ্যাতা, সেই রাজাদেশ সে প্রচার করে 'ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।' ঈশ্বরের যেহেতু একই সঙ্গে বাম ও দক্ষিণ মুখ সেইজন্য প্রয়োজনমতো ঈশ্বর-প্রতিনিধি ঠাকুরদাও রুদ্ররূপ ধারণ করে, সেনাপতি হয় রাজা নাটকে, প্রাচীর ভেঙে দেয় অচলায়তনে। ধনঞ্জয় বৈরাগী যেমন একদিকে একতারা বাজিয়ে গান গায়, অন্যদিকে তেমনি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহে নেতৃত্বদান করে।

আরো একজন আছে যে ঠাকুরদার মত চিরনবীন, সে কবি। দেহে জরার প্রথম চিহ্ন দেখে ফাল্গুনীতে বিচলিত রাজা বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি পড়তে

চেয়েছিলেন, শ্রুতিভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এল কবি—কারণ কবির হাতে নবীনতার মন্ত্র আছে। প্রকৃতিজগতের সঙ্গে কবির অত্যন্ত নিবিড় আত্মীয়তা, কেননা শৈশবের অকলুষ দৃষ্টি ও কল্পনা সে কোনদিন হারিয়ে ফেলে না, আর দৃষ্টির এই পবিত্রতাই তার কবিত্বের উৎস। বৃদ্ধের অভ্যস্ত দৃষ্টি যে প্রকৃতির মধ্যে কোন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পারে না সেখানে অভ্যাস-মুক্ত চোখ নিয়ে কবি প্রকৃতির ভাঁজে ভাঁজে অপূর্ব সৌন্দর্য আবিষ্কারে সক্ষম। কবি যেহেতু শুধু ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষের জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত নন, তাঁর কল্পনায় যেহেতু সুদূর অলৌকিক দিব্যলোক মাঝে মাঝে ছায়াপাত করে সেই কারণে এই ভুবনের সঙ্গে দ্বিতীয় ভুবনের, স্থূলজগতের সঙ্গে অধ্যাত্মজগতের সেতুবন্ধরচনাতেও তিনি সব চেয়ে পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্য ও নাটকের মধ্যে, যখন কবি হৃদয়ারণ্যের মধ্যে বন্দী ছিলেন, যখন চরিত্রগুলি ছিল নিজেরই অপরিস্ফুট ব্যক্তিত্বের ছায়া, তখন নিষ্ঠুর পরিবেশে প্রেমে জাগ্রত হয়, করুণায় প্লাবিত হয় যে নায়ক সে সর্বদাই কবি—রুদ্রচণ্ড, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় এবং বাল্মীকিপ্রতিভায়। শারদোৎসবে ঠাকুরদা ছিল একা, ঋণশোধে তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে সন্ন্যাসীরাজার সঙ্গী কবিশেখর। এই কবিশেখর প্রাণবন্ত ঠাকুরদার দ্বিতীয়রূপ। কবি বৃদ্ধ হলেও তার কাব্যের মধ্য দিয়ে সে ঠাকুরদার মত চিরনবীন থাকে। কবিশেখর বলে, 'বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে'—কবি চির-নবীন কাব্য রচনার দ্বারা চির-নূতন পৃথিবীর অমৃতের ঋণ শোধ করে। বসন্ত চির-পলাতক, কবিও নিয়ম-বাঁধা রাজ্য থেকে চির-পলাতক ; বসন্ত আর কবি দুইজনেই চিরপুরাতন-চিরনবীন এবং বসন্ত ঋতুনাট্যের 'জন্মপলাতক' কবি যখন বলে 'ঋতুরাজ রা জবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী' হয়েছে তখন আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই রাজার কথা যে বলে রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হতে হয় এবং মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ের কথা কবিমাত্রেই নটরাজ শিবের মত বৈরাগী। কালের যাত্রার কবির দীক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।' কবি ক্রান্তদর্শী—ভবিষ্যতের পথকে বর্তমানের বন্ধন থেকে সে মুক্ত করে। রথের রশির শেষে পুরোহিত কবির অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করলে কবি উত্তরে বলেছে—

> নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর !
> রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে,
> কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌছতে।

অন্যত্র যেমন ঠাকুরদা রাজার তথা ঈশ্বরের আদেশ ব্যাখ্যার দায়িত্ব নেয়, তেমনি শেষবর্ষণে বিপরীতভাবে স্বয়ং স্রষ্টা নটরাজ কবির পালাগান ব্যাখ্যার দায়িত্ব নেয়। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে নিত্য বাঁধন পরান, বাঁধন খোলান, কবি ক্রমাগত নিজের সৃষ্টিকে পরবর্তী সৃষ্টির দ্বারা অতিক্রম করে যায়। তাই কবির সঙ্গে প্রকৃতির ও ঈশ্বরের যোগ এত ঘনিষ্ঠ। ডাকঘর নাটকের রাজকবিরাজ যত না চরকশুশ্রুত-আওড়ানো কবিরাজ তার চেয়ে সে বেশি কবি, তাই সে রুদ্ধ জানলা খুলে দিয়ে প্রকৃতিকে ঘরে আমন্ত্রণ করে আনে এবং অর্ধরাতে যে রাজা আসবে তার আগমনসংবাদ ও অভ্যর্থনাবিধি জানায়। মুক্তধারার বাঁধকে খুলে দেবার পক্ষে অভিজিৎ উপযুক্ত লোক, কারণ তার মন কবির মন; ঐ মুক্তধারার মধ্যে সে তার অন্তরের রহস্য শুনতে পায়। কবির মতো সে অনুভব করে, পৃথিবী সুন্দর তার 'হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী'—সেই উপলব্ধিকে সে প্রকাশ করে কাব্যরচনার দ্বারা নয়, মুক্তধারার রুদ্ধগতিকে পুনর্মুক্ত করে। যক্ষপুরীর হাওয়া সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু সেই দূষিত হাওয়ায় কবিপ্রাণ বিশুপাগল একমাত্র সুন্দরের পূজারী। সে একদিন পুঁথি পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিল, আজ সে গান গাওয়ার অনুকূল পরিমণ্ডল রচনার জন্য নন্দিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভালবাসার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। কবির কবিতা প্রাচীন বিশ্বকে নূতন রূপে উপলব্ধি করায়, প্রাচীনতম কবিতাও নবীনতম থাকে কবিত্বের গুণে; প্রাচীন পৃথিবীরও নবীনত্বের অন্ত নেই—তাই কবি পৃথিবীর প্রাণের ব্যাখ্যাতা, বন্দনাকার এবং যথার্থ প্রতিনিধি।

কবিত্ব আর মর্ত্যের প্রতি ভালোবাসা এক হয়ে যায়। কবির চোখ দিয়ে দেখলে পরিচিত পৃথিবী প্রণয়ের সামগ্রী হয়ে ওঠে, আর পৃথিবী কবিকে সঞ্জীবিত করে, অনুপ্রাণিত করে। মালিনী কবি নয় কিন্তু যেদিন বিলাসের কারাগার থেকে সে প্রথম বাইরে এসেছিল সেদিন এই মর্ত্যের অমর্ত্য সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ অভিভূত করেছিল। সেই অভিভূত মুগ্ধতার প্রকাশে সে সেই মুহূর্তের জন্য যেন কবি হয়ে উঠেছিল—

দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ

ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধ ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে। (২)

যতই পৃথিবী থেকে বিদায়ের লগ্ন নিকটে আসে ততই মর্ত্যের আকর্ষণ নিবিড়তরভাবে অনুভূত হয়। প্রকৃতিকে এবং জীবনকে ভালোবাসার মধ্যেই আমরা জীবিত, পৃথিবী সেই প্রাণদায়ী প্রকৃতি ও জীবনের আশ্রয়। যার প্রাণ কবির প্রাণ, বিশ্বের প্রাচীনতার মধ্যে যে নিত্যনবীনতার উপকরণ খুঁজে পায়, এই পৃথিবী থেকে বিদায় তার কাছে তাই বিশেষ বেদনার। পৃথিবী থেকে বিদায় অর্থ জীবন থেকে বিদায়, তাই বিদায়কালে নাড়িতে বড় মর্মান্তিক টান লাগে। ফাল্গুনীতে চতুর্থ দৃশ্যে যুবকের দল বলে, 'বিদায়ের বাঁশীতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি। আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবই চলে চলে না যেত তাহলে কি কোন মাধুরী চোখে পড়ত।···প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই—আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—।' পৃথিবীর বন্ধন আমাদের বাঁধে না, মুক্তি দেয়; এবং মুক্তি দেয় বলেই, 'সবই চলে চলে' যায় বলেই পৃথিবীর মাধুরী এমন করে ধরা পড়ে। রাজা ও রানীতে কুমারসেন মৃত্যু আসন্ন জেনে পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকিয়েছে।

ওই দেখো পল্লব ভেদিয়া পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে,
স্নানসন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে ওই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড়-প্রমোদবন দিয়ে······ওই শোনো চারিদিকে
অরণ্য উঠিছে জেগে বিহঙ্গের গানে। (৫।৬)

মুক্তধারায় অভিজিৎ যখন নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলে তখন সে বাঁধ খুলে দিয়ে মৃত্যুবরণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে—'চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে, ওকি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু

ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।' পাখিটি যেমন উড়ে যাবার পূর্বে ভাবছে সুন্দর এই পৃথিবী, তেমনি ঝরনাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে ঝরনাস্রোতে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার পূর্বে ভাবছে, সুন্দর এই পৃথিবী। ফাল্গুনীর যুবকেরা বলেছিল 'প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া'; গুরুর আদেশ ও বিবেকের নির্দেশের মধ্যে মীমাংসা করতে না পেরে যখন জয়সিংহ আত্মবলিদানের সংকল্প নিয়েছিল মনে মনে তখন নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় সে প্রিয়া এবং পৃথিবী দুইয়ের কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছিল।

দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ···
অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাতে রজনীগন্ধার গন্ধময়। (৪।৪)

উদ্ধৃতিগুলি তুলনা করলে দেখি, মালিনী বলছে 'দেখো দেখো', অভিজিৎ বলছে 'চেয়ে দেখো', কুমারসেন বলছে 'ওই দেখো' আর 'দেখ্ চেয়ে' বলছে জয়সিংহ। হয় নিজেকে নতুবা অপরকে ডেকে তারা দেখিয়েছে পরমরমণীয় পৃথিবীর শোভা। যেন, পৃথিবীকে তারা এই প্রথম দেখল।

এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হই যে, মানুষকে শিশু হতে হবে, প্রেমিক ও কবি হতে হবে— জীবনের প্রেমিক পৃথিবীর কবি,—যে-পৃথিবীতে নিজভূমে সে পরবাসী সেই পৃথিবীতে নির্বাসিতের জীবন ত্যাগ করে মর্ত্যের প্রতি অনুরাগের মধ্য দিয়ে তার স্বাধিকার ফিরে পেতে হবে। সৃষ্টির আনন্দে স্রষ্টা নটরাজ যেমন নৃত্যের তালে-তালে বিশ্বচরাচরকে উল্লসিত করে তোলেন, ভিখারী নটবালকের মতো

গ্রহ নক্ষত্র আনন্দে ভ্রাম্যমান হয়, কবি যে সৃষ্টির আনন্দে কাব্য জন্মদানের বেদনার ঘর্মাক্ত দিন-রাত্রিগুলিকে অঙ্গীকার করেন, ঠাকুরদা যে আনন্দের আতিশয্যে ছেলেযুবার দলকে মাতিয়ে নিয়ে বেড়ায়—আমাদের কাজকর্মে সমাজে-সংসারে সেই সৃষ্টির আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশু খেলার মধ্যে যে আনন্দ পায় তা ফিরিয়ে আনতে না পারলে মানুষের নিজের রচিত পাষাণ-নির্মম নিয়মের হাত থেকে উদ্ধার নেই। রবীন্দ্রনাট্যে এই উপলব্ধি বারংবার প্রকাশ পেয়েছে ; তাই এই নাটকাবলীতে কাজ ও খেলা সমার্থক। শারোদৎসবে প্রভুর ঋণশোধের দায়িত্ব নিয়ে পুঁথি নকল করতে বসেছে উপনন্দ, কিন্তু ছেলের দল সে কাজকে কাজ বলে মানতে চায় না। উপনন্দর কাজই তার কাছে খেলা কেননা সেই কাজের মধ্যে স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব পালনের তৃপ্তি আছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরদাও তার সঙ্গে পুঁথি নকল করতে বসে যায়, ছেলের দল নূতন ধরনের খেলা পেয়ে পরম আমোদে তাতে যোগ দেয়। ঋণশোধ নাটকের সন্ন্যাসী যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছে, সে বলে 'আমি একদল ছেলে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।' অচলায়তনের দাদাঠাকুর যে শোণপাংশুদের সঙ্গে খেলে বেড়ান সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন—'আমি যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।' শোনপাংশু-যুনকের দল আনন্দে চাষ করে, চাষ করার মধ্যে যে কাজের বোঝা আছে তা তারা উপলব্ধি করে না, তারা তার মধ্যে পরম তৃপ্তি পায়। তাদের মধ্যে যারা কামার তারা যে 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন' তার ঘুম ভাঙিয়ে যেন সোনার কাঠির অধিকারী রাজপুত্র হয়ে ওঠে। 'এমন হাসতে খেলতে মিলতে মিশতে কাজ করতে কাজ ছাড়তে' পারার আনন্দ অচলায়তন-গুরুর পাহাড়-মাঠের দিগন্তে দিগন্তে ধ্বনিত হচ্ছে। রাজা নাটকে বসন্ত উৎসবে কুঞ্জবনের দ্বারের কাছে ঠাকুরদার যে কাজ সে কাজও খেলার সমর্থক, কেননা সেই কাজ খেলার মতই কর্মীকে আনন্দ দেয়, বিমর্ষ করে না। দইওয়ালার কাছে যা নিতান্ত নিরেট কাজ অমলের কাছে তাই খেলা ; আর অমলের কাছে খেলা বলেই দইওয়ালার মনে হয় সহসা আরও যেন কাজের ভার লঘু হয়ে গেল। প্রহরীর প্রহরে-প্রহরে ঘণ্টা বাজানো, ডাকহরকরার চিঠি বিলি করে বেড়ানো, অমলের চোখ দিয়ে দেখলে, সব কিছু খেলা হয়ে যায়, আনন্দের হয়ে ওঠে। একদল ছেলে অমলের জানলার সামনে দিয়ে যাবার সময় বলে তারা চাষ-খেলা খেলবে। খেলা হয়ে ওঠে কাজ, কাজ হয়ে

ওঠে খেলা—নিরানন্দ কাজ যেদিন আনন্দময় খেলা হয়ে ওঠে সেই দিনই উদ্ধার, সেই দিনই প্রাণের জড়ত্বমুক্তি। যেদিন সে পার্থক্য লোপ পায় সেদিন বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গভীর হয়ে ওঠে। ডাক-হরকরা চৌকো চিঠিতে একদিকে প্রকৃতির অন্যদিকে ঈশ্বরের নিমন্ত্রণপত্র আনে। ফাল্গুনী নাটকে কবি রাজাকে বলেছে, 'মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে বলে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি বলে কাজ করি—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।' প্রাণকে ভালোবাসে বলে কাজ করে যেহেতু, তাই 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ।' ফাল্গুনীতে নবযৌবনের দল অত্যন্ত জরুরি বিশেষ কাজে বেরিয়েছে। কী সেই কাজ? 'বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।' প্রবীণ দাদা বিরক্ত হয়ে বলে 'খেলা? দিনরাতই খেলা?' কিন্তু নবযৌবনের দলের যেমন খেলা তেমনি কাজ, কেননা প্রকৃতিও খেলতে খেলতে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, জলস্থলে ঢেউ ওঠায়। এই মতে বিশ্বাস করে রক্তকরবীর রঞ্জন। সর্দার আর মোড়লের কথোপকথন থেকে জানতে পারি, খোদাইকরদলে রঞ্জনকে ভর্তি করলে রঞ্জন খোদাইকাজকে পরিণত করেছিল খোদাই নৃত্যে, তাতে অন্য খোদাইকরদের উপর থেকেও নেমে গিয়েছিল কাজের নির্বোধ চাপ। 'রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে 'মাদল পাই কোথায়?' ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।' রঞ্জন কাজকে খেলা করে তুলেছিল বলেই বোঝা যায় যক্ষপুরীর গহ্বর-খোঁড়া কাজ কী বীভৎস কী কুৎসিত।

## চার

রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে যে দ্বন্দ্ব পরিণামে শান্তি লাভ করে প্রায় ক্ষেত্রে সেই দ্বন্দ্ব ঘটে আত্মজন-প্রিয়জনের মধ্যে। অনাত্মীয়ের বিরোধিতা তত অসহনীয় নয়, কিন্তু নিকট আত্মীয় ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন যখন শত্রু হয়ে ওঠে তখন অপ্রত্যাশিত আঘাতের তীব্রতায় নিজের মত-উপলব্ধি সম্বন্ধে চিন্তা করার, প্রশ্ন উত্থাপন করার সম্ভাবনা বেশী দেখা দেয়। এতদিন যে দস্যুদলের

নেতৃত্ব বাল্মীকি করে এসেছে, বালিকার আবির্ভাবে তার অন্তরে করুণা জাগ্রত হওয়ায়. সেই দস্যুদলের সঙ্গে বাল্মীকির বিরোধ দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে দ্বন্দ্ব বাইরের নয়, অন্তরের। রঘুর পরিত্যক্তা বালিকাকে পেয়ে আজ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে সন্ন্যাস এবং পিতৃস্নেহের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দিয়েছে। বিসর্জন নাটকে একই সঙ্গে বহির্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব পাই। বাইরে অধিকার নিয়ে বিরোধ বেধেছে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং পুরোহিত রঘুপতির মধ্যে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর বিরোধ রঘুপতি এবং জয়সিংহের মধ্যে। গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এবং অপর্ণার প্রেমে জয়সিংহ বাহ্যত না হোক মনে মনে পিতৃকল্প গুরু রঘুপতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অন্যের বিরুদ্ধতা রঘুপতির পক্ষে সহ্য করা কঠিন নয় কিন্তু স্নেহাস্পদ শিষ্য জয়সিংহের বিরুদ্ধতা তাকে কঠিনভাবে বেজেছে—এবং এই শত্রুতা প্রিয়জনের কাছ থেকে এসেছে বলেই নিজের মতাদর্শ সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং জয়সিংহের মৃত্যুতে এতদিনের পোষিত বিশ্বাস সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বিরোধ গোবিন্দমাণিক্য-গুণবতীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সংস্কারাচ্ছন্ন সন্তানকামী গুণবতী বলিদান প্রথা অব্যাহত রাখতে চায়, জাগ্রত বিবেক গোবিন্দমাণিক্য সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করতে চায়। স্ত্রীর বিরোধিতার ফলে গোবিন্দের কর্তব্যের পরীক্ষা বহু গুণে কঠিন হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব জয়সিংহের হৃদয়ক্ষেত্রে। একদিকে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি শ্রদ্ধায়, অপর্ণার প্রতি প্রেমে সত্যোপলব্ধি, অন্যদিকে গুরুর প্রতি আনুগত্য, গুরুর কাছে সত্যরক্ষার দায়। এই বিরোধী টানে জয়সিংহের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা সে খুঁজে পেয়েছে আত্মবলিদানে। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণে প্রতাপাদিত্য ও পুত্র উদয়াদিত্যের মধ্যে বিরোধ, মুক্তধারায় সেই বিরোধই রণজিৎ-অভিজিতের সম্পর্কের মধ্যে রূপায়িত। রাজার আদর্শ, রাজার ধর্ম, রাজা-প্রজার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মতাদর্শের পার্থক্য একদিকে, অন্যদিকে রাজার রাজত্ব এবং পিতৃত্বের মধ্যে বিরোধ—পিতাপুত্রবিরোধের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বিরোধ পাই মালিনী নাটকে। মতবাদগত পার্থক্য সুপ্রিয়ের সঙ্গে ক্ষেমংকরের পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু ক্ষেমংকরের প্রবলতর ব্যক্তিত্বের চাপে সেই পার্থক্য এতদিন প্রকাশ পায় নি। মালিনীর প্রেম সুপ্রিয়কে শক্তি দিয়েছে ক্ষেমংকরের বিরুদ্ধাচরণের, এমন কি বন্ধুর জয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনা জেনে বন্ধুর গোপন সংবাদ রাজার কাছে উদ্ঘাটন করতে সে দ্বিধা করে নি। ক্ষেমংকরের শৃঙ্খলবদ্ধ বজ্রমুষ্টি যখন তার শিরে নেমে এল যমদণ্ডের

মতো তখন বুঝলাম প্রাণের বান্ধবের সঙ্গে বিরোধ বলেই বিরোধের এই প্রচণ্ড তীব্রতা। প্রিয় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সুপ্রিয় আত্মপীড়ায় কম পীড়িত হয় নি। তার প্রতি ভালোবাসায় শ্যামা উত্তীয়কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে শুনে বজ্রসেন শ্যামার ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারে নি, কিন্তু মালিনীতে দেখি, সুপ্রিয়ের কাছে যে প্রেম ও ধর্ম আজ একাকার তার জন্য সুপ্রিয় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এ কথা শুনে মালিনী বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

ভ্রাতায়-ভ্রাতায় এমন আদর্শগত বিরোধ পাই অচলায়তন-গুরুর মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের মধ্যে। নাটকের আরম্ভেই এই বিরোধের ইঙ্গিত পাই। পঞ্চকের গান শুনে মহাপঞ্চক তিরস্কার করে, 'গান! আবার গান!' পঞ্চক উত্তরে বলে, 'একমাত্র ওইটেই যে পারি।' মহাপঞ্চক নিয়ম অনুশাসন অক্ষরে-অক্ষরে মেনে সমস্ত প্রাণের চাঞ্চল্যকে অচলায়তন থেকে নির্বাসিত করে দিতে চায়, অন্যদিকে পঞ্চক শাস্ত্রের বচন এক বর্ণ মুখস্থ করতে পারে না, পাহাড়-মাঠের মুক্তিতে তার আনন্দ। একজন সুভদ্রকে মহাতামসব্রতে বসায় অন্যজন তাকে মহাতামস থেকে ছিনিয়ে আলোর দিকে নিয়ে যায়। গুরু যেদিন এল সেদিন প্রমাণ হলো দুই ভাইয়ের মধ্যে, কোন্ জন গুরুর সত্যকার শিষ্য। একদিকে যেমন বাইরে বিরোধ দুই ভাইয়ের মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি আত্মবিরোধ আচার্য অদীনপুণ্যের অন্তরে। 'কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত।' কিন্তু শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বের বোঝা তাকে বহন করতে হয়েছে তাই নয়, তার এতদিনের অধীন অনুগত উপাচার্য এবং মহাপঞ্চকের বিরুদ্ধতা করে তাকে আদেশ দিতে হয়েছে, 'সুভদ্রকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।' স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ রূপায়িত হয়েছে রাজা ও রানী এবং তার রূপান্তর তপতীতে। রাজা বিক্রমদেব সুমিত্রাকে দেখে প্রেয়সীরূপে, সুমিত্রা নিজেকে দেখে শুধু রাজার স্ত্রী হিসাবে নয়, রাজ্যের রাজ্ঞী হিসাবে। পত্নীর আদর্শ সম্বন্ধে রাজা ও রানীর মধ্যে এই যে বিরোধ তাই ব্যাপক হয়ে রূপ নিল কুমারসেন ও বিক্রমদেবের মধ্যে লোকক্ষয়কারী রক্তাক্ত যুদ্ধে। সেই প্রেমশিখা এবং যুদ্ধাগ্নি অবশেষে একই সঙ্গে নির্বাপিত হলো সুমিত্রার আত্মত্যাগে। নিষ্প্রাণ যক্ষপুরীর রাজা নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তীব্র সেই আকর্ষণ। কিন্তু সেই নন্দিনীর সঙ্গেই লাগল তার বিরোধ—রঞ্জনের

মৃত্যুর পর নন্দিনী বলেছে, 'আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।' কিন্তু রাজা নিজেই 'ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত।' নেপথ্যবাসী রাজার নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ—একদিকে সে বৃহৎ যক্ষপুরীর পাতাল-যজ্ঞের শবসাধনার নিয়ামক, অন্যদিকে তার মধ্যে এমন এক বিরাটত্ব মহত্ত্ব আছে যা নন্দিনীকে মুগ্ধ করে। আত্মবিরোধে ক্ষতবিক্ষত বলেই নন্দিনীকে ডাক দিয়েছে রাজা 'আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে।' জালাবরণের অন্তরালে রাজার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিতুলনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন রামায়ণের রাবণ ও বিভীষণের সঙ্গে।

অধর্মাচারীর সঙ্গে রাবণের ও ধর্মাচারীর সঙ্গে বিভীষণের যখন তুলনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তখনই তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে নাটকীয় চরিত্র হিসাবে অন্তত অধর্মাচারী চরিত্র ধর্মাচারী চরিত্রের চেয়ে প্রবলতর বিশালতর। ধর্মের শক্তি হয়তো বড়ো কিন্তু নাটকগুলির মধ্যে ধর্মশক্তি যে চরিত্রগুলির আশ্রয় নেয় তারা অধার্মিক চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশী দুর্বল মনে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের 'রবীন্দ্রনাটকের নায়ক' প্রবন্ধটি (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩) উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে 'শেকসপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ' মনে করতেন তারই উত্তরাধিকার রয়েছে এই প্রবলতর চরিত্রগুলির মধ্যে, তুলনায় দুর্বলতর চরিত্রগুলি কবির উপলব্ধ সত্যকে ধারণ করে। তিনি বলেছেন, 'সত্যবোধের প্রতীক অন্য যে প্রধান চরিত্র, তারই আদর্শে ফিরে এসে প্রমত্ত দ্বিতীয় নায়ক শান্ত হয়। এইজন্যেই পাঠক স্থির করে উঠতে পারে না—নাট্যকারের অভিপ্রেত নায়ক কে? একজন কবির সত্যের আদর্শকে বহন করছে; শেষ পর্যন্ত তারই আদর্শ বিজয় লাভ করছে। আর একজন শেকসপীয়রীয় নাটকের নায়কের মতোই শক্তিমান অসাধারণ ও বিস্ময়োদ্দীপক। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যজনকে কবি জয়ী করেছেন বটে, কিন্তু এর প্রতি কবির আকর্ষণ যে কিছু কম তা তো মনে হয় না।' অন্যত্র বলেছেন, 'যে ভ্রান্ত আদর্শের তিনি পরাজয় দেখিয়েছেন, সেই আদর্শের প্রতিনিধি একটা আশ্চর্য বীর্যবত্তার অধিকারী হয়ে আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে।' 'রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল থাকলেও দুই নায়কের মধ্যে একজনের কল্পনায় শেকসপীয়রীয় নায়ক-লক্ষণ তীব্রতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে।' কৌশল ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়ে যদিও রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির চরিত্র-মহিমাকে অনেক ক্ষুণ্ণ করেছেন তবু যে-কোন বাতাসে-তাড়িত দ্বিধাগ্রস্ত

সংশয়ান্বিত জয়সিংহের চেয়ে বা গোবিন্দমাণিক্যের তুলনায় তার প্রচণ্ডতা ও বিশালত্ব অনেক বেশী। অপর্ণা যখন রঘুপতি সম্বন্ধে বলেছিল—

ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট—
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের। (১।৩)

তখন তার গুরুদেব সম্বন্ধে জয়সিংহ বলেছিল—

কঠিন? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর। (১।৩)

মালিনী নাটকে দুর্বল কোমলস্বভাব বন্ধু সুপ্রিয়ের পাশে ক্ষেমংকর উদ্যত বজ্রের মত ভীষণ, অশনিপতনের মত প্রচণ্ড। নাট্যশেষে তাকে দেখি—

নেত্রস্থির, উর্ধ্বশির ভ্রূকুটির পরে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড, হিমাদ্রিশিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণসম। (৪)

রাজা ও রানী এবং তপতীর বিক্রমদেব অপরাধী হতে পারে, তার সর্বগ্রাসী প্রেমের অনলে নগরকান্তার জ্বলে যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যে কোন ক্ষুদ্রতা নেই। তপতীতে সুমিত্রা নিজেই বিক্রমদেব সম্বন্ধে বলেছে—'ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি—সে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূলভাঙ্গা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম তাহলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা।' রক্তকরবীর রাজা যতক্ষণ নেপথ্যবাসী অগোচর ততক্ষণ সে অতিকায় শক্তিধর, মানুষেরা তার হাতের মুঠোয় বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়, তার কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার, বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। সেই রাবণরূপী রাজা যখন দ্বার উদ্ঘাটন করে বিভীষণরূপে বেরিয়ে এল তখন তার বিরাটত্ব খর্ব হয়ে গেছে, ফাগুলালদের সঙ্গে তার বিশেষ কোন স্তর পার্থক্য থাকল না। অচলায়তনের পঞ্চকের তুলনায় মহাপঞ্চক প্রবলতর বিশালতর চরিত্র। যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে দৈবশক্তির লড়াই তাই মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে না। সে বলে, 'যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর।' অভিজিৎ শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও তার তুলনায় বিভূতির মধ্যে চরিত্রগত প্রচণ্ডতা যে বেশী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জাতীয় চরিত্রদ্বৈত আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও

পাই—বিনয়ের তুলনায় গোরা, নিখিলেশের তুলনায় সন্দীপ, বিপ্রদাসের তুলনায় মধুসূদন।

সাময়িক অমঙ্গল. ক্লেদমালিন্যের পর শুচিতায় মঙ্গলের পুনরুত্থান দেখাতে রবীন্দ্রনাট্যে আরো একটি মোটিফের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ঘটে। যে তথাকথিত দেবতা ভয়ংকর ভীষণ, পরিণামে তার প্রভাব দূরীভূত হয় এবং সেই সাময়িক বামাচার ভ্রষ্টাচারের পর শাশ্বতধর্মের মঙ্গলময় সত্যদেবতা প্রতিষ্ঠিত হন। শুধু ভীষণ-ভয়ংকর দেবতা নয়, যে দেবতা পৌরুষনাশী মেরুদণ্ডহীন লালিত্য বা মাঙ্গল্যবিবর্জিত সৌন্দর্যের প্রতীক সেই দেবতারও স্থায়িত্ব নেই। ভীষণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করেন, ললিতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অরণ্যবাসী বাল্মীকি কালী কপালিনী মহাকাল-সীমন্তিনীর পূজারী ছিল, যে কালী ঘূর্ণ্যমান তড়িৎ-অসির দ্বারা বিপুল ধরণীতে রক্তস্রোতধারা প্রবাহিত করে। কিন্তু বালিকার আবির্ভাবে, ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে করুণা-প্লাবিত হৃদয় বাল্মীকি সেই কালিকাকে এবং এমন কি ধনদা লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করল, বন্দনা করল ঊষারূপিণী দেবী ভারতীকে। বিসর্জনে রঘুপতি দেবীরূপে যাকে বন্দনা করে সেও করালকালিকা।

> উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
> আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
> দশ দিক আঁধার করে মাতিল দিক্‌বসনা,
> জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
> দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।...
> রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে
> ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে। (১।৫)

এই দেবী মহামায়া রঘুপতির ব্যাখ্যায় 'মহামিথ্যা'—এই কালস্বরূপিণী তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলে বিশ্বের রক্তধারা পান করছে। অন্যদিকে জয়সিংহের কল্পনায় দেবী দয়াময়ী মাতৃস্বরূপিণী। এই দুই দেবীকল্পনার দ্বন্দ্বই এই নাটকে ঘোরতর হয়ে উঠেছে এবং জয়সিংহ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার ধ্যানের মঙ্গলময়ী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে। অপর্ণা তার ছাগশিশুর সন্ধানে এলে জয়সিংহ বলেছিল মা তাকে নিয়েছে, কিন্তু অপর্ণা উত্তরে বলেছিল যে মা সন্তানবলি গ্রহণ করে সে মা নয় 'রাক্ষসী', নাটকের অন্তে সেই মহাকালীর

উপাসক রঘুপতিও উপলব্ধি করলো 'দেবী বল তারে? পুণ্যরক্ত পান করে সে মহারাক্ষসী ফেটে মরে গেছে', এবং

দূর করে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক
জগতের বক্ষ। (৫।৪)

বলে, দূরে গোমতীর জলে সে প্রতিমা নিক্ষেপ করেছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-ধর্মের প্রতিনিধি ক্ষেমংকরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণগণ আহ্বান করেছিল মালিনী নাটকে সেই মহাকালীকে

সংহারের বেশে সাজি
এখনি দাঁড়াও সর্বসম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খড়্গহস্তে, অট্টহাস হাসি
পাষণ্ড-দলনী। (২)

প্রার্থনাকালে মালিনী সামনে দাঁড়ালে মালিনীকে দেবী বলে ভুল করে ক্ষেমংকর ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণগণ সত্যদেবীকে চিনেছিল—

এ কী অপরূপ রূপ! এ কী স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে! এ তো নহে সংহারমূরতি। (২)

নাটকের পরিণামে 'সংহারমূরতি' দেবীর পরিবর্তে শান্ত-নম্র করুণাদ্রব বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বিশেষত ক্ষেমংকরের পক্ষ হয়ে মালিনীর ক্ষমা-প্রার্থনায়। সন্তান সত্ত্বেও সন্তানহারা, স্বামী সত্ত্বেও স্বামীহীনা রাজ্ঞী লোকেশ্বরী এত দীর্ঘকালের পূজিত বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল, পৌরুষের অভাব দেখে ধিক্‌কার দিয়েছিল সেই ধর্মকে, সে ভেবেছিল নূতন মন্ত্র নেবে। সে মন্ত্র 'নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়।' সে ভেবেছিল 'অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে।' কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্মবিরোধী দেবদত্তের দলের কণ্ঠে নমঃ পিনাকহস্তায়, জয় জয় করালী শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হলো তখন লোকেশ্বরী দেবদত্তকে ক্রূর সর্প, নরকের কীট বলেছে এবং মরণের মুখে দাঁড়িয়ে উন্মত্তের মতো নটী শ্রীমতী যখন তার নৃত্যের পূজা আরম্ভ করল, নটীবেশের অন্তরাল থেকে প্রকাশমান হলো ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র, তখন লোকেশ্বরী আবার মঙ্গলমন্ত্র মৈত্রীক্ষমামন্ত্র উচ্চারণ করেছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...।

মুক্তধারায় যন্ত্রদৈত্যই দেবতার স্থান নিয়েছে। যন্ত্ররাজ বিভূতি বলেছে সে যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেবে। অসুরের মাথার মতো, দানবের

উদ্যত মুষ্টির মতো, আকাশের বুকে যেন শেলের মতো সেই যন্ত্রটি উদ্ধত মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।' 'সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের এই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।' নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলময় রুদ্রদেবতা ভৈরব শংকরের বন্দনাগান ভৈরবপন্থীদের মুখে শুনি, কিন্তু সে গানকে ছাপিয়ে ওঠে চক্রমুখরমন্দ্রিত বজ্রবহ্নিবন্দিত ভীষণ যন্ত্রের স্তব গান। নাটকের পরিণামে অবশ্য ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অভিজিতের যৌথ প্রচেষ্টায় বদ্ধ ঝরনা মুক্তি পায় এবং অন্তিমে পরাস্ত যন্ত্রদেবতার বন্দনাগান স্তব্ধ হয়ে যায়, ধ্বনিত হতে থাকে মঙ্গলময় সংশয়ভেদন বন্ধনছেদন সংকটসংহারকারী রুদ্রদেবতার বন্দনা। বাঁধ ভেঙে মুক্ত ঝরনার স্রোতের শব্দ শুনে ধনঞ্জয়ের মন্তব্যের মধ্যে নটরাজ শিবের জয়ের ইঙ্গিত পাই—'নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি'। যার অজেয় শল্যের একদিক পৃথিবীকে অন্যদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে, সেই ধ্বজাও গ্রহণ-লাগা যক্ষপুরীর ভীষণ দেবতার ধ্বজা। রঘুপতির কালিকার মুখে যেমন নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতো রক্তধারা ফেটে এসে পড়ে, তেমনি সেই ভীষণপূজারী রাজা, 'দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে' তেমনি, নন্দিনীকে তার দুই হাতে পিষ্ট করে নষ্ট করে দেবার তীব্র বাসনা বোধ করে। কিন্তু সেই রাজা শেষে মহাপবিত্র ধ্বজার দণ্ড ভেঙে ফেলল, তার কেতন ছিঁড়ে ফেলতে আমন্ত্রণ জানাল নন্দিনীকে।

এই নাটকাবলীতে যেমন দেবতার নামে রক্তলোলুপ হিংস্রতা প্রশ্রয় পায় নি, তেমনি প্রশ্রয় পায় নি দেবতার নামে পৌরুষনাশী অতিলালিত্য। রাজা নাটকে বসন্তোৎসবে যাবার সময় পতাকায় যার কিংশুক ফুল আঁকা তাকেই কুম্ভ রাজা বলে মনে করেছিল কিন্তু ঠাকুরদা তার ভ্রম ভাঙিয়ে দিল —'আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা'—তিনি একই সঙ্গে মঙ্গলময় ও রুদ্রভৈরব। তপতীতে রাজা বিক্রম মীনকেতুর পূজার আয়োজন করেছে, অথচ দেবদত্ত সেই পূজার ভূমিকা করল পঞ্চশরদগ্ধকারী ভৈরবের স্তবগান দিয়ে। রাজাদেশে সুমিত্রা সেই উৎসবে যোগদান করেছে বটে কিন্তু মীনকেতুর পূজায় সমস্ত কিছু যখন আবিল হয়ে উঠল তখন আনন্দদেবের পূজা ত্যাগ করে তপতী সুমিত্রা চলে গেল রুদ্রভৈরবের মন্দিরে,

যে রুদ্রভৈরবের বন্দনা দিয়ে নাট্যারম্ভ হয়েছিল। রাজা ও রানীর বিরোধ আসলে এই দুই দেবতারই বিরোধ। মোহিনীমায়া প্রার্থনা করেছিল অর্জুনের প্রণয়প্রার্থিনী চিত্রাঙ্গদা, তার আবেদনে সন্তুষ্ট হয়ে মদন তার সহায় হয়েছিল; অর্জুনও মুগ্ধ হয়েছিল 'শুধু এক পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি।' কিন্তু

এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ ·····(৯)

নারীর এই মদন-অর্পিত লোভনলীলায় ক্লান্ত অর্জুন একদিন অন্য চিত্রাঙ্গদাকে কল্পনা করল—

সিংহিনীর মতো চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী
বীর্যসিংহ পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া। (৯)

কালের যাত্রা নাটকের কবির দীক্ষা গদ্যনাট্যকবিতায় বলা হয়েছে—

দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

## পাঁচ

রাজা-অরূপরতনের রাজা, ডাকঘর ও রক্তকরবীর রাজা নাটকের অধিকাংশ সময় নেপথ্যচারী। অন্ধকারের নেপথ্যে বা জালাবরণের অন্তরালে সে আত্মগোপন করে থাকে। রাজা-অরূপরতনের এই অন্ধকারের রাজার সত্য পরিচয় সুরঙ্গমা জানে—'একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর বলে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।' রাজা-অরূপরতনের অন্তিমে রাজা অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন সুদর্শনাও বোঝে অরূপ রাজাই সর্বরূপের আকর—যে ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে কুরূপ বা সুরূপ, সেই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে সর্বরূপের আশ্রয়। ডাকঘরের শেষেও রাজা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হলো মাধব দত্তের গৃহে অমলের

শয্যাপার্শ্বে। বেরিয়ে এল রক্তকরবীর ভয়ংকর রাজা, 'মানুষ ছাঁকা' রাজা যার 'ভয়ংকর প্রতাপ', দ্বার উদ্ঘাটন করে, জাল ছিন্ন করে। তখন জানতে পারলাম সে তার নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী—যে একদিন প্রাণহরণের পালার অধিকারী ছিল সেই আজ প্রাণবন্যার বিদ্রোহে নায়কত্ব গ্রহণ করেছে। এই যে আত্মগোপন এবং পরিণামে আত্মপ্রকাশ, একরূপে আত্মগোপন অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ, এও রবীন্দ্রনাট্যের একটি সাধারণ মোটিফ্।

বাল্মীকি-প্রতিভায় যে বালিকার উপস্থিতিতে বাল্মীকির পাষাণ-হৃদয় করুণায় দ্রব হয়েছিল সেই বালিকা পরে আত্মপরিচয় দান ক'রে বলল সে সরস্বতী, 'দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিনু ঘোর বনমাঝে, গলাতে পাষাণ তোর মন।' যদি অপর্ণার মানবতা সুপরিস্ফুট না হতো, যদি অপর্ণা-জয়সিংহের প্রেমের স্তরগুলি প্রদর্শিত না হতো তাহলে সহজেই সন্দেহ করা যেত যে ত্রিপুরেশ্বরী দেবী স্বয়ং অপর্ণার রূপ ধরে বলিদানের বিরুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যকে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিল, পূজারীদের পাষাণমন গলাতে এসেছিল। অপর্ণা নাম-করণের মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে। একই ইঙ্গিত আছে গোবিন্দমাণিক্যের উক্তিতে—

বালিকার মূর্তি ধরে<br>
স্বয়ং জননী মোরে, বলে গিয়েছেন,<br>
জীবরক্ত সহে না তাঁহার। (১/২)

জয়সিংহ ও গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে মহাকালীর এই যে হিংস্রমূর্তি এ আসলে জগজ্জননীর ছদ্মবেশ, এই ভীষণা মূর্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে চিরদিনের চিরপরিচিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি। রঘুপতি যখন 'মহামায়া' নামকে ব্যাখ্যা করে বলেছিল 'মহামিথ্যা' তখন জয়সিংহের মনে হয়েছিল এই দেবীকে যদিও মা বলে ডাকা হয় সে 'রাক্ষসী' আসলে,

মায়াবিনী, পিশাচিনী,<br>
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই<br>
মার ছদ্মবেশ ধরে রক্তপান লোভে ? (২/১)

অপরপক্ষে বিবেক-উদ্বুদ্ধ গোবিন্দমাণিক্য দেবীর সত্যরূপ জেনেছে,

কী বেদনা<br>
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,<br>
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল<br>
নেত্রে তাঁর। (৩।১)

তাই সে দেবী ত্রিপুরেশ্বরীকে রক্তবর্ণ জবা দিয়ে পূজার সময় সম্বোধন করে বলে—

আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব? (২।৪)

ধনঞ্জয় বৈরাগীর গেরুয়া বস্ত্রের অন্তরালে প্রজাবিদ্রোহের নায়ক আত্মগোপন করে থাকে, তার ঈশ্বরে সমর্পিত বাউলগানগুলির অন্তরালে প্রতিবাদের বিদ্রোহের সংগীত আত্মগোপন করে থাকে—উপযুক্ত পরিবেশে স্বরূপে সে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা নাটকে শুধু রাজা নিজেই যে অন্ধকারের আবরণে নিজেকে গোপন করে রাখে তাই নয় তার অন্যতম প্রধান শিষ্য অন্যতম সেনাপতি ঠাকুরদাও আত্মগোপন করে থাকে কিন্তু যেদিন প্রয়োজন দেখা দেয় সেদিন যোদ্ধবেশে ক্রুসেডারের মতো ঠাকুরদা প্রবেশ করে, তার হাতের তলোয়ার জানিয়ে দেয় সত্যিই তার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। সে বলে, 'আমার মতো অক্ষম কে আছে। তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।' বিপরীতধর্মী ছদ্মবেশের ঘটনাও এই নাটকে পাই। সুদর্শন চেহারা রাজবেশী, যাকে অনেকেই রাজা বলে মনে করেছে সে মিথ্যা রাজা। সংকটের দিনে তার পরিচয় গোপন থাকল না; অগ্নিবেষ্টিত প্রাসাদে যখন সুদর্শনা রাজবেশীকে দেখে বলেছে 'রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।' তখন দুইজনের সংলাপে সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

রাজবেশী॥ কোথায় রাজা। আমি রাজা নই।
সুদর্শনা॥ তুমি রাজা নও!
রাজবেশী॥ আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। ( মুকুট মাটিতে ফেলিয়া )
আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক। (৭)

অচলায়তন-গুরুতে দাদাঠাকুর রাজার সেনাপতি নয়, সে নিজেই গুরু। যে দাদাঠাকুর শোণপাংশু-যূনকদের সঙ্গে পঞ্চকের সঙ্গে গানের উৎসবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে সেই আবার অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার জন্য পূর্ববেশ পরিত্যাগ করে 'একেবারে চোখ ঝলসে যায' এমন যোদ্ধবেশ ধারণ করে আসে। মহাপঞ্চক বিশ্বাস করতে পারে না সে-ই গুরু, পঞ্চক বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে 'এ যে দাদাঠাকুর। গুরু কোথায়?' শারদোৎসবে সন্ন্যাসী অপূর্বানন্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে রাজা বিজয়াদিত্য।

সন্ন্যাসী যখন বালকদের সঙ্গে খেলায় মত্ত, রাজা এবং লক্ষেশ্বর যখন তার কৃপাপ্রার্থী তখন মন্ত্রী এসে সন্ন্যাসীকে 'জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য' বলে সম্ভাষণ করেছে এবং রাজার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। ফাল্গুনীতে গুহার মুখে নবযৌবনের দল গিয়েছিল জরাবুড়োকে ধরে আনার জন্য 'যে বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায়', অথচ সেই গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল জীবন সর্দার, ধুলোর মধ্যে যাকে বুড়ো বলে মনে হয়েছিল এখন তাকেই মনে হচ্ছে বালক। জরার ছদ্মবেশের মধ্যে লুকিয়ে ছিল জীবন নামক এই চির-বালক। ডাকঘরে অমলের ফকির জানলার কাছে এসে রোজ তাকে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায় আর সেই ফকির যখন সশরীরে প্রবেশ করে তখন দেখি সে ফকিরের বেশে ঠাকুরদা ছাড়া আর কেউ নয়। ফকিরবেশী ঠাকুরদা অমলের ঘরে প্রবেশ করলে—

অমল ॥ এই যে, এই যে ফকির—এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত ॥ এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা ॥ ( চোখ ঠারিয়া ) আমি ফকির।

মাধব দত্ত ॥ তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে। (৩)

ঋতুরাজ বসন্তের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার এক পিঠে নূতন, অন্যপিঠে পুরাতন—শারদোৎসবে যেমন সন্ন্যাসীর ভেতর থেকে রাজা বেরিয়ে আসে, তেমনি বিপরীতভাবে বসন্তঋতুনাট্যে ঋতুরাজ রাজবেশ খসিয়ে বৈরাগী হয়ে চলে যায়। শেষবর্ষণে নটরাজ অবগুণ্ঠন খুলে দিতে বলল, 'এইবার বাদল-লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা।'

এই আত্মগোপন এবং আত্মপ্রকাশের মোটিফ্ দুইভাগে রক্তকরবীতে বর্তমান। নেপথ্যবাসী রাজা, যার স্বর শোনা যায় অথচ যাকে দেখা যায় না, সে নাটকের শেষভাগে জালাবরণ ছিন্ন করে বাহিরে সশরীরে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরপক্ষে, জালাবরণ মুক্ত হলে মৃত রঞ্জনকে দেখে নন্দিনী হাহাকার উঠলে, রাজা রঞ্জনকে চিনতে পেরেছে। 'ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।' রঞ্জন রাজাকে আত্মপরিচয় দেয় নি—তার সেই পরিচয় আজ প্রথম রাজা পেল বেদনাদায়ক অবস্থায়। রঞ্জনের মৃত্যুর ফলে রাজা বুঝতে পারল যক্ষপুরীর ব্যবস্থা আজ তার হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাচ্ছে এবং প্রথম সে বুঝতে পারল যক্ষপুরীর ব্যবস্থা কী পরিমাণে মানবিকতাবিরোধী। 'ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ!

আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।' নটীর পূজার শেষ অঙ্কে শ্রীমতী নর্তকীবেশে প্রবেশ করেছিল স্তূপের সামনে রাজাদেশে নৃত্য করার জন্য। অঙ্গে তার নটীর বেশ দেখে সকলে তাকে ধিক্কার দিয়েছিল।—'পাতকিনী আপাদমস্তক অলঙ্কার পরেছে।' 'পাপদেহে এক-শ বাতির আলো জ্বালিয়েছে।' কিন্তু আজ নটী অন্য নাচ নেচেছে—'ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ' গানে ও নাচে কঙ্কন কেয়ূর হার একে একে বর্জন করে সে আরম্ভ করল আত্মনিবেদন। 'নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র।' নটীবেশের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল বুদ্ধ-উপাসিকা শ্রীমতী, জীবনের শেষ নৃত্যে তার সত্য পরিচয় প্রকাশিত হলো। কুরূপা চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে আকর্ষণ করার নিরুপায় প্রয়োজনে মদন ও বসন্তের দেওয়া সৌন্দর্যলাবণ্যের ছদ্মবেশ পরেছিল এক বৎসরের জন্য। সেই ছদ্মবেশের আদরে চিত্রাঙ্গদা ঈর্ষান্বিত হয়েছে, সেই সৌন্দর্যভারে সে ক্লান্ত হয়েছে। যেদিন অর্জুন নিজেও নারীর লোভনলীলায় ক্লান্ত হলো সেইদিন ছদ্মবেশ ত্যাগ করে সত্য পরিচয় দেবার সময় হলো। সে বলেছে—

কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও। (১১)

অবগুণ্ঠন খুলে সে আত্মপরিচয় দিয়েছে 'আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।' মালিনী নাটকেও এই আত্মগোপন-আত্মপ্রকাশের ঘটনা পাই। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ মা প্রলয়ংকরীকে যখন ধর্মরক্ষার জন্য আহ্বান করল সেই সময় মালিনী এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের সামনে। মুহূর্তের ভ্রমে তাকেই জগদ্ধাত্রী বলে ব্রাহ্মণদের মনে হয়েছিল, যদিও প্রলয়ংকরীর এই করুণামূরতি দেখে তারা অবাক হয়েছিল। কিন্তু তারা মালিনীর সত্য পরিচয় জানল—যার নির্বাসন তারা দাবী করছিল এ সেই রাজদুহিতা।

এই ব্যাপার শুধু রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলিতেই নেই। রবীন্দ্রনাথের নাট্যাবলীতে এই ব্যাপার কতটা সর্বস্তরব্যাপী তার প্রমাণ প্রহসনগুলি আলোচনা করলেও দেখা যাবে। চিরকুমার সভায় বিধবা শৈলবালা কৃত্রিম গোঁফ লাগিয়ে পুরুষবেশ ধারণ করে চিরকুমার সভার সদস্য হয়েছিল। সকলে জোড়ায়-জোড়ায় মিলে গেলে শৈলবালা ওরফে

অবলাকান্তের জন্য সবাই চিন্তিত হয়েছিল। রসিক তাদের বলেছিল—'কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরও আশ্চর্য হবেন।' পরে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে শৈলবালা স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গোড়ায় গলদ-শেষরক্ষায় দুই ক্ষেত্রে এমন আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাই। চাপকান-পরিহিতা ইন্দুমতী বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে বলে নিজের পরিচয় দেয়, নিমাই বা গদাইকেও সে ললিত বলে ভুল করেছিল। এক মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার সত্য পরিচয় দুইজনের কাছে প্রকাশিত হলো। অপরদিকে কমলমুখী রানী বসন্তকুমারীর ছদ্মবেশে স্বামীকে বিষয়পরিদর্শনের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। পরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে মুখ-উদ্ঘাটন করে স্বামীর কাছে সত্য পরিচয় প্রকাশ করেছিল কমলমুখী এবং বিস্মিত বিনোদবিহারীর মুখে কথা বেধে গিয়েছিল—'আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!' প্রহসনগুলির বাইরে রাজা ও রানী নাটকে নারীর পুরুশবেশ ধারণ করে আত্মগোপন করার ঘটনা পাই। সুমিত্রার পুরুষবেশে স্বামীর রাজ্য থেকে বিদায় নিতে দেখে ত্রিবেদী বলেছিল—'হে হরি, কী দেখলুম! পুরুষমূর্তি ধরে রানী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন।' সেই বেশে কাশ্মীরে উপস্থিত হলে বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরের মনে হয়েছিল 'কুমার আবার এল বালক হইয়া।' নারীর পুরুষ বেশ ধারণের এই ঘটনাগুলি পড়লে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিতে এই আত্মগোপন-আত্মপ্রকাশের মোটিফ্ পড়লে মনে হতে পারে শেকসপীয়রের কমেডিগুলির থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উপকরণ নিয়েছিলেন।\ কারণ শেকসপীয়রের কমেডিগুলিতে এইরূপ ঘটনার সাক্ষাৎ বারবার পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকে যখন, বিভিন্নধর্মী নাটকে যখন, এই ব্যাপার লক্ষ্য করি তখন মনে হয় শেকসপীয়রীয় প্রভাব নয়, অন্য কোন গূঢ় কারণ এর জন্য দায়ী।

এই আত্মগোপন-আত্মপ্রকাশের বিবরণ পুনঃপুনঃ পড়তে পড়তে মনে হয় এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গূঢ় অভিপ্রায়, একটি বিশেষ প্রত্যয় নাট্যরূপ লাভ করেছে। বসন্ত ঋতুনাট্যে ঋতুরাজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।' শুধু ঋতুরাজ কেন, মনে হয়, যাকেই আমরা দুই বলে জানি, বহু বলে জানি, সে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে একই সত্তা—এই অদ্বয়বাদী প্রত্যয় রবীন্দ্রনাট্যে এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। একো দেব সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক দেব, যিনি গোপনে সর্বভূতের মধ্যে সর্বব্যাপী

হয়ে বর্তমান, সর্বভূতের যিনি অন্তরাত্মা, তিনি প্রকাশিত হলেই যদি সমস্ত প্রকাশিত হয়, তাঁর আলোকেই যদি সমস্ত বিভাসিত হয় তাহলে যে বিরোধ দ্বন্দ্ব এবং দ্বৈততা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় তা নিতান্তই আপাতিক। হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখটি ঢাকা পড়েছে বলেই মানুষ দ্বৈতের দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়, কিন্তু সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য যদি সেই আবরণটি সরিয়ে নেওয়া হয় তবে দ্বৈতের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে। জীবন সর্দারই বুড়ো, সেই আবার বালক—যে জরাবুড়োকে তারা গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল সে কোথায়ও নেই, সে স্বপ্ন—বিশ্বের বহুকে জানা স্বপ্নকে জানা, বিশ্বের এককে জানা সত্যকে জানা। ঈশ্বর এক, তিনিই আনন্দময় তিনিই রুদ্র—আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দুই পৃথকরূপ বলে মনে হয়, আসলে তা এক পরমেরই স্বতন্ত্র প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই আনন্দপাগল বৈরাগীবাউল দাদাঠাকুর ঠাকুরদা সহসা তলোয়ারে-কৃপাণে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধবেশে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। সরস্বতীর মধ্যে বালিকাকে, বালিকার মধ্যে সরস্বতীকে পাওয়া যায়। 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই' একথা যখন বিজয়াদিত্য বলে তখন সে রাজা ও সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না—রাজর্ষির এক সত্তায় গোবিন্দমাণিক্যের মত চরিত্রে তা ঐক্য লাভ করে চরিতার্থ হয়। রাজায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে রূপকে সুদর্শনা বর্ষার নিবিড়তার মধ্যে, শরতের শেফালিবনে, বসন্তের রঙিন উপবনে দেখে সেই রাজাই আবার ইন্দ্রিয়াতীত রূপময়। ইন্দ্রিয়ের বহুত্বের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত একেকে পাওয়া যায়—কোনটিকে বর্জন করে কোনটিকে অর্জন করা যায় না, কেননা দুই-ই আসলে এক। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে যে অদ্বয়বাদী প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, নাটকাবলীর এই আত্মগোপন-আত্মপ্রকাশ পরিকল্পনার মধ্যে সেই প্রত্যয়েরই একটি রূপান্তরিত প্রকাশ দেখি॥

## ছয়

রবীন্দ্রনাট্যের ভাবকল্পনায় ঐক্যের আর একটি প্রমাণ এই নাটকসমূহের জনতাদৃশ্য চিত্রণে। প্রকৃতির প্রতিশোধে জনতাদৃশ্যগুলি জীবন্ত, তাদের ভাষা অনেক পার্থিব এবং তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় নাটকে এই জনতাদৃশ্য-গুলি পাই। বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের সত্য নাটকে রূপায়িত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাস্থান হিসাবে পথকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন একথা পূর্বে

বলেছি। টেকনিক এবং তত্ত্বগত প্রয়োজনে নাটকে ঘটনাস্থান প্রায়শই পথ, এবং পথ যেহেতু ঘটনাস্থান সেই কারণে পথ-চলতি জনসাধারণ, লোকচলাচল-দৃশ্য নাটকে অনিবার্যভাবে জায়গা পেয়েছে। যদিও প্রকৃতির প্রতিশোধে আমরা পথদৃশ্যে জনতার চলাচল পাই প্রথম, কিন্তু মনে হয় এই জাতীয় দৃশ্যচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় শেকসপীয়রীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেকসপীয়রের রক্তেমাংসে সুসম্পূর্ণ নাগরিকবৃন্দের তুলনায় টমসন প্রকৃতি প্রতিশোধের নাগরিকদের ছায়াশরীর বলেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে এই অভিযোগ সত্য হলেও রাজা ও রানীতে পথে লোকারণ্যের বর্ণনায় বা বিসর্জনে ক্ষুব্ধভীরু প্রজাবৃন্দের রূপায়ণে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়র-তুল্য সার্থকতা অর্জন করেছেন। এই জনতাদৃশ্যসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য আছে—কাহিনী-প্রধান বা প্রতীকপ্রধান নাটকনির্বিশেষে তাদের এই সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রতীকনাট্য রাজা বা কাহিনী-প্রধান নাটক প্রায়শ্চিত্তের জনতাদৃশ্যচিত্রণে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি প্রায়শ্চিত্তের মাধবপুরের প্রজারা যখন মুক্তধারা নাটকে শিবতরাইয়ের প্রজাতে রূপান্তরিত হয়, প্রতীকধর্ম যখন দ্বিতীয় নাটকে দেখা দেয় তখনও ধনঞ্জয় ও প্রজাবৃন্দের কথোপকথন প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। প্রায়শ্চিত্তের প্রজাদৃশ্য-গুলিকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে মুক্তধারায় ব্যবহার করা হয়। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন শেকসপীয়রীয় রীতি পরিত্যাগ করেছিলেন তখনও যখন দেখি জনতাদৃশ্যবর্ণনায় তিনি সেই শেকসপীয়রীয় রীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছেন তখন সন্দেহ হয় অন্য কোন কারণে এই দৃশ্যাবলী রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পথের সঙ্গে জনতাদৃশ্যের অনিবার্য সম্পর্ক একটি কারণ। অন্য কারণ হয়তো এই—এই দৃশ্যগুলির সাহায্যে প্রতীকনাট্যের তত্ত্বজ্ঞানের অতিবাস্তব জগতের সঙ্গে তিনি যেন দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহতরঙ্গিত সংসারের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। এদের উপস্থিতির ফলে প্রতীকনাট্যের ভূগোল কাল্পনিক থাকে না। তত্ত্বের আকাশের চাঁদের সঙ্গে তিনি প্রতি-দিবসের হরষে-বিষাদে চিরকল্লোলময় জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়ের প্রতিদিবসের কাজ, ছোট হাসি, ছোট কথা, ছোট সুখ ও প্রতিনিমেষের ভালোবাসাগুলির সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। গভীর কোন তত্ত্ব বা সত্যের সন্ধিৎসায় তিনি বাস্তবজীবনযাত্রার চিরন্তন প্রবাহকে ভুলে যান নি—এই কারণে বোধহয় এই জাতীয় দৃশ্যগুলি তাঁর নাট্যাবলীতে বারবার স্থান পেয়েছে। কোন সত্যের সম্মুখীন হয়ে সাধারণ মানুষের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সংশয়,

বিদ্রূপ, পরস্পরকে নিন্দাবাদ, পূর্ববিশ্বাসের অচিরবিস্মৃতি, দু-একজনের গভীর আনুগত্য ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী সংগত প্রতিক্রিয়াগুলি এইসব জনতাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। রাজা নাটকের জনতাদৃশ্য আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাট্যের জনতাদৃশ্যের সাধারণ লক্ষণগুলি ধরা পড়বে। কুসংস্কার, কূপ-মণ্ডূকত্ব, রাজার অস্তিত্বে অবিশ্বাস, নূতন যে কোন ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ, জনশ্রুতির উপর নির্বিচার আস্থা, মিথ্যাপ্রতিমাকে সত্য বলে স্বীকার, নিজের জ্ঞানবুদ্ধির পরিধির চেয়ে বৃহৎ কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস, ভয়, স্মৃতির অচিরভ্রংশতা, নেতা সম্বন্ধে কখনো সংশয় কখনো তার প্রতি সুগভীর আনুগত্য, একজন জোর দিয়ে কোন কথা বললে পাঁচজন সমর্থক জুটে যাওয়া, দিশাহারা ভাব, আবার দিশাহারাভাবের মধ্যেও মননাতিরিক্ত কোন শক্তিতে কখনো কখনো সত্যের স্পর্শলাভ—জনতার এই এককালীন অথচ পরস্পরবিরোধী সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলি যেমন রাজা নাটকে, তেমনি অন্য রবীন্দ্রনাট্যে রূপায়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জনতার কোন ব্যক্তিত্ব নেই, একটি গড্ডলপ্রবাহের মত তারা প্রবাহিত—যে এই গড্ডলপ্রবাহের বাইরে যায় একমাত্র সেই ব্যক্তিত্বভূষিত হয়। কোন কোন দিক থেকে এই দৃশ্যগুলিকে বহুস্বর-সমন্বিত কোরাস বলে মনে হয়। কোরাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের জনতাদৃশ্যের তুলনা আরো সংগত মনে হয় রথের রশির মত নাটকে—যেখানে নাটক সংহত জনতাদৃশ্য বই কিছু নয়। আগের নাটকসমূহে জনতাদৃশ্যের পাত্রপাত্রী যতই অপৃথক মনে হোক তারা স্বতন্ত্র মানুষ ছিল অন্তত নামে কিন্তু এখানে তাদের বহুস্বর একস্বরে সমন্বিত থেবেসের নাগরিকদের মত, কলোনাসের বৃদ্ধদের মত, মার্ডার ইন্ দা ক্যাথিড্রালের ক্যাণ্টারবারিললনাদের মত। জনতা এখন ব্যক্তিসমষ্টিও নয়, তা এখন নৈর্ব্যক্তিক মনুষ্যত্ববর্জিত নিরুপাধি শুদ্ধ প্রতিক্রিয়াতে রূপান্তরিত।

রবীন্দ্রনাট্যের ভাবকল্পনায় তাই ঐক্য বর্তমান। সামগ্রিক পরিকল্পনার ঐক্য এবং যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপকরণ সমবায়ে নাটকগুলি নির্মিত সেই উপকরণসমূহের মধ্যেও ঐক্য বর্তমান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে, মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাকে, সবচেয়ে নাট্যগুণান্বিত বিষয়কে, কখনও রূপায়িত করেন নি; যে অবস্থায় জীবনধারণ দুর্বহ হয়ে ওঠে, আবিশ্ব অন্ধকার হয়ে যায়, দুল্যমান তরবারির ভারে অস্তিত্বের সূত্র ছিন্নপ্রায় হয়, সেই অবস্থাকে চিত্রিত করেন নি। একমাত্র শ্যামাতে সেই তলহীন অন্ধকারের কিঞ্চিৎ ইশারা আছে। শ্যামা ও বজ্রসেনের অস্তিত্বের সমস্যার কোন সমাধান রবীন্দ্রনাথ

দিতে পারেন নি। অন্যত্র যেখানে বিষাদে নাটকের পরিণতি হয়েছে সেখানেও ট্র্যাজিক অপচয় নেই। সেখানে এক চরিত্রের প্রভাবে সচরাচর অন্য চরিত্রের মঙ্গলাভিমুখী পরিবর্তন হয়। শ্যামায় আমরা গ্রীক ট্র্যাজেডীর মত সরলরেখায় বিরলবর্ণে সর্বশূন্যতার সম্মুখীন হই এবং রবীন্দ্রনাট্যে এই অভিজ্ঞতা আমাদের স্তম্ভিত করে। ঈডিপাস তবু থেবেস থেকে কলোনাসে এসে উদ্ধার পেয়েছিল —শ্যামা-বজ্রসেনের উদ্ধার কোথায়? শ্যামা ছাড়া অন্যত্র মানব-অস্তিত্বের এই সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেন নি তার প্রধান কারণ প্রত্যয়গত ঐতিহ্যগত—জীবনে মঙ্গল যখন অবশ্যই জয়লাভ করে তখন দুর্বহজীবনের দুঃসহ সমস্যাকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয় না—মনে হয় সে ভয় ভয়ের মুখোশ মাত্র।

ঐকতানময় রবীন্দ্রনাট্যাবলীতে বৈচিত্র্যের অভাব একদিকে আমাদের অতৃপ্ত করে। কিন্তু কোন নাট্যকার যখন দীর্ঘ ষাট বৎসরকাল ধরে সমস্ত পরিধি পরিক্রমা করে পুনঃপুনঃ একই কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করেন, নানা ভঙ্গিতে—কাহিনীনাট্যের সাহায্যে, রূপক প্রতীকনাট্যের সাহায্যে—তখন সেই সহজ অতৃপ্তি প্রকাশ করার পূর্বে উপলব্ধি করার প্রয়োজন সেই কেন্দ্র তাঁর কাছে কত মূল্যবান ছিল। বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ না হওয়া, শুদ্ধ মুক্তির মধ্যে শূন্য না হওয়া, বন্ধনের মধ্য দিয়ে মুক্তি পাওয়ার যে সত্য তাই রবীন্দ্রনাট্যের কেন্দ্রগত উপলব্ধি। এই উপলব্ধির তাত্ত্বিক দিক সামাজিক দিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকাবলীতে বারংবার রূপায়িত করেছেন। সেই কারণে এই অবিচিত্র, ভাবকল্পনার ঐকতানে রচিত এই নাটকাবলী প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র নাটক। দৃশ্যগুলি এক-একটি নাটকীয় ইমেজ, নাটকগুলি এক একটি দৃশ্য, সমস্ত নাটক মিলে একটি মাত্র নাটক—সদৃশ চরিত্রগুলি একটি চরিত্র, সমস্ত জনতাদৃশ্য মিলে একটি মাত্র জনতাদৃশ্য, সমস্ত নাটকাবলীর পশ্চাতে একই জীবন্ত নিত্যনবীভূত শ্যামশষ্পময় প্রকৃতি। সমস্তের অন্তিমে একটিমাত্র প্রাণময় মঙ্গলময় মহাপরিণাম॥

# পরিশিষ্ট

## ভৈরবের বলি*

রবীন্দ্রনাট্যের সংস্করণগত রূপান্তর আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজা ও রানীর ভৈরবের বলি নামক একটি রূপান্তরের কথা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায় 'তপতী রচনার কিছুদিন পূর্বে রাজা ও রানীর অভিনয়ের জন্য 'সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত' করিবার কথা কবি যে উল্লেখ করিয়াছেন (তপতীর ভূমিকায়) সেই অভিনয়কালে (১৯২৯) সংস্করণের নাম ছিল ভৈরবের বলি।' অনুমান করার সংগত কারণ আছে যে ভৈরবের বলি তপতী রচনার মাত্র চার-পাঁচ মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছিলেন। কেন এই স্বল্প কালের ব্যবধানে তিনি দ্বিতীয়বার রাজা ও রানী নাটককে সংশোধিত নূতনরূপ দিতে চাইলেন এবং কেনই বা ভৈরবের বলিকে তিনি মুদ্রণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করলেন তার হদিস আছে তপতী নাটকের ভূমিকায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।'

'অনেক দিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।' এই ত্রুটি নাট্যকারের মতে প্রধানত, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্তের অপ্রাসঙ্গিকতা' এবং 'মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা'। এই দুইটির কোনটিই ভৈরবের বলিতে শোধিত হয় নি, তাই রবীন্দ্রনাথের মতে, ভৈরবের বলি রাজা ও রানীর অসম্পূর্ণ সংশোধন। রাজা ও রানী ও তার সম্পূর্ণ সংশোধন তপতীর সম্পর্ক পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক শীর্ষক অংশে আলোচনা করেছি। রাজা ও রানীর ইংরেজি রূপান্তর The King and the Queen, যেখানে তিনি 'greatest liberties in translation' নিয়েছিলেন এবং যেখানে তিনি 'jungle of undramatic and only secondarily relevant matter' বাদ দিতে যেয়ে টবের স্নানের জল শুদ্ধ শিশুকেও ফেলে দিয়েছেন সেই রূপান্তর বিষয়েও আলোচনা করেছি।

*৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৩, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকায় ভৈরবের বলি বিষয়ক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই তিনটি রূপ তুলনা করতে গেলে চোখে পড়ে নাট্যকাহিনীর অব্যাহত গতির দিকে ক্রমেই বেশী রবীন্দ্রনাথের নজর পড়ছিল। রাজা ও রানীতে পাঁচটি অঙ্কে মোট ত্রিশটি দৃশ্য আছে, ইংরেজি রূপে দৃশ্যবিভাগবিবর্জিত অঙ্ক সংখ্যা মাত্র দুইটি, তপতীতে তিনটি মাত্র নিরবচ্ছিন্ন অঙ্ক। অব্যাহত গতিস্রোত রক্ষার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ের অনেক নাটকে দৃশ্য-অঙ্ক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন; পথের পটভূমিতে অভিনীত ঋণশোধ, মুক্তধারা, রক্তকরবী সেই কলাদর্শের প্রতি কবির প্রবণতার প্রমাণ। 'রাজা ও রানীর কিছু কিছু রূপান্তর সাধন' করে ভৈরবের বলি লেখার সময় এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল। তারই ফলে রাজা ও রানীর বহু সংলাপ, এমনকি সম্পূর্ণ দৃশ্য ভৈরবের বলিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সব বর্জনের উদ্দেশ্য সব সময়েই অব্যাহত গতির তাড়না, কখনো টমসনের ভাষায় 'merely illustrative dialogue' বর্জন করে, কখনো অবান্তর অপ্রাসঙ্গিকতার গুল্মজাল উচ্ছেদ করে। যেমন রাজা ও রানীর আরম্ভ থেকে দেবদত্তের উক্তির নিম্নোদ্ধৃত অংশ বর্জিত হয়েছে এই অপ্রকাশিত রূপান্তরে—

আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস। (১/১)

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের এইরূপ আরো বহু অংশ এইভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। রাজা ও রানীর প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে বিক্রমদেবের একটি দীর্ঘ কাব্যমধুর সংলাপ পাই।

মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবনমাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম—সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনককান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি।
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে—দিবালোকতট হতে

এস, নেমে এস, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে? (৩/১)

লক্ষ্য করার বিষয় দীর্ঘ ব্যবধানে রচিত হলেও The King and the Queen এবং ভৈরবের বলি এই দুই রূপান্তরেই এই সংলাপটির ক্ষেত্রে সমজাতীয় বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। ভৈরবের বলিতে শুধু শেষ প্রশ্নসূচক বাক্যটি গৃহীত হয়েছে, আর রূপান্তরে টিকে গেছে শুধু এই জিজ্ঞাসা-বাক্যেরই তর্জমা— 'Why have you delayed in coming to me for so long, my love?' একই কারণে বর্জিত হয়েছে উক্ত দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত বিক্রমদেবের নিম্নোদ্ধৃত সংলাপাংশ।

প্রথম প্রেমের ছটা, দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবনবিকাশ,
সেই নিশিসমাগমে দুরু দুরু হিয়া—
নয়নপল্লবে লজ্জা ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতরকম্পিত
দীপশিখা সম, নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের
কথা, হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে, চাহে
নিশীথের তারা লুকায়ে জানালা-পাশে—
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন,
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়। (৩/১)

এই জাতীয় আরো বহু কাব্যময় সংলাপের ভার বর্জন করে ভৈরবের বলিতে নাট্যগতি দ্রুততর করার চেষ্টা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ দৃশ্য বর্জন করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। দৃশ্য-অঙ্কের পুনর্বিন্যাসের কিছু কিছু প্রমাণও মেলে এবং একাধিক দৃশ্য যুক্ত করে নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত গতিদানের চেষ্টা সর্বত্র চোখে পড়ে। রাজা ও রানীর প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ভৈরবের বলিতে নেই, পঞ্চম দৃশ্যও পরিত্যক্ত। তৃতীয় দৃশ্যের শেষে মূলের সুমিত্রার প্রস্থানের পরিবর্তে রূপান্তরে নাট্যনির্দেশে বিক্রমের

প্রস্থান বলা হয়েছে। ষষ্ঠ দৃশ্যের প্রথম অংশ পরিত্যাগ করে সুমিত্রার প্রবেশের স্থানে বিক্রমের প্রবেশ ঘটিয়ে নাট্যগতিকে অক্ষুণ্ণধারায় প্রবাহিত করা সম্ভব হয়েছে। সপ্তম দৃশ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রূপান্তরে নেই, দেবদত্তের প্রস্থান ও মন্ত্রীর প্রবেশের সাহায্যে এই দৃশ্যটিকে একটি অখণ্ড প্রবহমান দৃশ্যের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। মূলে সুমিত্রার যে উক্তি আছে—

কালভৈরবের পূজোৎসবে
করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।
গর্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত। (১/৭)

রূপান্তরে তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে—

কালভৈরবের পূজা আজি
করো নিমন্ত্রণ। মন্দিরে বিচার হবে।
অশ্ব মোর আছে দ্বারে, এখনি মন্দিরে
যাবো লয়ে তাঁর পূজা, রুদ্রের প্রসাদ
হোক সহায় আমার।

এরপর প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের মাঝামাঝি স্থান থেকে ( প্রথমাংশের সভাসদ ও বিক্রমদেবের কথোপকথন অপ্রয়োজনবোধে বর্জিত ) আবার জুড়ে এক করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে 'দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রানী' রাজার এই উক্তির পর রূপান্তরে মন্ত্রীর প্রবেশ এবং মন্ত্রীর মুখে 'মহারানী অশ্বে চড়ি মন্দিরে না গিয়ে/গেছেন উত্তরমুখে। এই পত্র তাঁর।' এই কয়টি কথা যোগ করায় তৃতীয় দৃশ্যের সুমিত্রা-ত্রিবেদী সংলাপকে সহজেই বর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং পত্রপাঠরত ক্রুদ্ধ বিক্রমের চতুর্থ দৃশ্যের সংলাপকে পূর্বাংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শুধু ত্রিবেদীর চরিত্রসহ তার সংলাপ নির্মূল করা হয়েছে। 'এরপর দেবদত্ত-নারায়ণীর একটি নাতিদীর্ঘ দৃশ্য আছে। রাজা ও রানীর প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যটিকে এইখানে তুলে আনা হয়েছে, ত্রিবেদী-অংশ বাদ দিয়ে। তার সঙ্গে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য মেশানো হয়েছে। রাজা ও রানীর প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক মিলিয়ে ভৈরবের বলির প্রথম অঙ্ক হয়েছে। তৃতীয় অঙ্ক রাজা ও রানী ভৈরবের বলিতে দ্বিতীয় অঙ্ক। শংকরের চরিত্র বাদ দেওয়া হয় নি, কিন্তু তার দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।' ( রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬২ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ভৈরবের বলির বিবরণ )।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে শংকর ও পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রস্থানের পর ঐ দৃশ্যেই কুমারসেন ইলা ও সখীগণের প্রবেশ। এই দৃশ্যের অতিকোমল অতিপেলব সংলাপ রূপান্তরে বহুলাংশে বর্জিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য পরিত্যাগ করে পঞ্চম দৃশ্যকে পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নতা দানের জন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যের পুনর্বিন্যাসের একটি উদাহরণ এখানেও পাই—পঞ্চম দৃশ্য ত্রিচুড়ে ঘটেছে, স্থানগত ঐক্যের জন্য ঐ দৃশ্যের সঙ্গে লোকসমাগম ও হাটের অবতারণা করা হলো, মূল নাটকে যা ছিল পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে। তারপর যবনিকাপাতহীন দৃশ্যবিভাগহীন ভাবে পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের সংলাপ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মূলের চতুর্থ দৃশ্যে ইলার দীর্ঘ উক্তির প্রথম চরণ 'মিছে কথা মিছে কথা। তোরা চুপ কর।' এর পরে কবি যোগ করেছেন—'এইমাত্র মনে হলো যেন সে আমারে/দিল ডাক, তার কান্না ভরিল আকাশে।' এই সংলাপেরই শেষ চরণ 'তোরা সখি, মিছে/বকিস নে আর। একটুকু চুপ কর।' তার পরেও নূতন দুইটি চরণ যুক্ত হয়েছে—'সে মোরে ডেকেছে জানি। তাহারি উত্তরে/গাব গান, মনে মনে সে পাবে শুনিতে।' তারপর পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। এখানে স্থান পরিবর্তন হয়েছে, মূলে ছিল 'কাশ্মীর। শিবির'। কিন্তু স্থানের উল্লেখ দিলে দৃশ্যপট পরিবর্তন করতে হয়, দৃশ্যপট ব্যবহার বর্জন যেহেতু উদ্দেশ্য, অথচ দৃশ্যান্তরের ইঙ্গিত না দিলেও চলে না, সেই কারণে কবি প্রয়োগগত নির্দেশ দিয়েছেন 'আলো নেবানো ও জ্বালানো।' স্থানিক ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে কাশ্মীরের যেখানে যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে ত্রিচুড় করা হয়েছে, যেমন নিচের পরিবর্তন।৮তে।

॥ রাজা ও রানী ॥
শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে।
॥ ভৈরবের বলি ॥
ত্রিচুড়ে আছে সে শুনে এলাম হেথায়।
পেলে কি সন্ধান তার।

ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য নবরূপে বিপরীতক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। মূল ষষ্ঠ দৃশ্যের 'অরণ্য। শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমারসেন শয়ান, সুমিত্রা আসীন' এই স্থান ও মঞ্চনির্দেশের পরিবর্তে ভৈরবের বলিতে শুধু 'আলো জ্বালানো'র নির্দেশ। এরই সঙ্গে

পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কুমারের আত্মদানের সিদ্ধান্ত কুমার ও সুমিত্রার আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। এখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

ভৈরবের বলির তৃতীয় অঙ্ক শুধু রাজা ও রানীর পঞ্চম অঙ্কের নবম দৃশ্য নিয়ে। মূলে ছিল সুমিত্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইলার প্রবেশ, ভৈরবের বলির্তে এই প্রবেশ একেবারে শেষে। রূপান্তরে রেবতীর প্রবেশ নেই। চন্দ্রসেন কর্তৃক রেবতীকে ধিক্কার ও বিক্রমের নতজানু অনুশোচনা ভৈরবের বলিতে নেই, ইংরেজি রূপান্তর The King and the Queen-এও নেই। নাটকের পরিণতির দিক থেকে বাস্তবিক পক্ষে ভৈরবের বলির সঙ্গে The King and the Queen-এর সাদৃশ্য বেশি—মনে হয় ১৯১৭ সালের ইংরেজি রূপান্তরের স্মৃতি ১৯২৯ সালের রূপান্তরকালে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শেষাংশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

The King and the Queen

( বধূবেশে ইলার প্রবেশ ও উক্তি )

King, I hear the bridal music. Where is my lover ?
I am ready. (Act II)

ভৈরবের বলি

বধূবেশে ইলার প্রবেশ

ইলা ॥ এসেছি প্রস্তুত হয়ে। উৎসবের আলো
আজিকে সার্থক হোক। কুমার কোথায়। (৩)

ভৈরবের বলিতে সামান্য কিছু সম্পূর্ণ নূতন অংশ সংযোজিত হয়েছে, তার কিছু কিছু উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। 'রাজা রানী নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথন দিয়ে। পুরোহিত পদে বৃত হয়ে দেবদত্ত রাজার সঙ্গে তর্ক করছেন তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। এই পুঁথিতে ( ভৈরবের বলি ) তার আগে দেবদত্ত ও নারায়ণীর একটি নাতিদীর্ঘ কথোপকথন আছে।' ( ভৈরবের বলির বিবরণ, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, বৈশাখ ১৩৭৩ সংখ্যা )। এ ছাড়া মূল তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ছদ্মবেশী সুমিত্রার প্রতি শংকরের উক্তি—

তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে ?

এর পরে নূতন লিখিত অংশ সংযোজিত হয়েছে—

কি সংবাদ নিয়ে এলে বৎস কহ মোরে।

সুমিত্রা ॥ কাশ্মীরের পঙ্গপাল রানীর আত্মীয়
জালন্ধর করিতেছে অন্নহীন তারা।
সুমিত্রার শির নত হলো।

শংকর ॥ ধিক ধিক
দিক সবে দূর করে জালন্ধর পতি।

সুমিত্রা ॥ বিদ্রোহী হয়েছে তারা। কুমারের কাছে
রানী তাই পাঠাল আমারে। ইচ্ছা তাঁর—
কাশ্মীরের অস্ত্র যেন কাশ্মীরের গ্লানি
বিষব্রণ সম কেটে দেয় দূর করে।
কাশ্মীরের রাজপুত্র এ আরোগ্যভার
নিজ হাতে লয় যদি তবে লজ্জা কাটে।

শংকর ॥ সুমিত্রার অনুরোধ রাখিবে কুমার
নাহিক সন্দেহ। কাশ্মীরের অপরাধ
কাশ্মীর আপন হাতে করিবে ক্ষালন।
এস বৎস মোর ঘরে লইবে আশ্রয়।

পরের কয়েকটি চরণ আবার মূল থেকে গৃহীত—

নাহি জানি কেন এত স্নেহ আসে মনে
তোমা পরে ; যেন তুমি চিরপরিচিত,
যেন চিরজীবনের আদরের ধন।

এর পরেই আবার নূতন যোজনা—

শুনেছিনু এ বৎসর সুমিত্রা আপনি
কালভৈরবের পূজা করেছে সাধন,
কহ বার্তা তার।

সুমিত্রা ॥ সে পূজা হয়েছে সাঙ্গ
অর্ঘ্য তার বলি তার রাখে নাই বাকি।

রাজা ও রানীর পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে অমরুরাজ 'তোমারে করিনু সমর্পণ যাহা আছে/মোর' বলে ইলাকে বিক্রমের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। নবরূপে কিছু নূতন অংশ এখানে যোগ করা হয়েছে। ত্রিচূড়ের রাজকন্যা ইলাকে বন্দী করলে কুমারকে ধরা সহজ হবে এই বিষয়ে যখন বিক্রম সেনাপতির সঙ্গে

আলোচনায় রত তখন যুধাজিৎ জানিয়েছে ত্রিচূড়রাজ 'কন্যারে দিবেন তিনি নিজ হস্তে উপহার বলেছেন মোরে' এবং ঠিক তখনই দূত প্রবেশ করে বিক্রমের সাক্ষাৎপ্রার্থী ত্রিচূড়রাজের আগমন সংবাদ জানিয়েছে।

এই মন্তব্য সত্য যে, 'একথা বলা যায় না নাটক হিসাবে ভৈরবের বলিতে রাজা ও রানীর বিশেষ রূপান্তর কিছু ঘটেছে।...কেবলমাত্র যে পরিবর্তনটি কবির গভীর ইচ্ছার প্রমাণ বহন করে তা হলো ভূমিকায় উল্লিখিত যবনিকা ওঠানো-নামানোর সমস্যার আলো জ্বালানো ও নেবানোর দ্বারা সমাধান করা।' (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যা)। নাট্যগতিকে অব্যাহত রাখার, সক্রিয়-সচল ঘটনাবস্তুর মাঝখানে স্থাণু পটের সামঞ্জস্যহীন যান্ত্রিকতাকে দূর করার জন্য মঞ্চকে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথ নিরলঙ্কার করে আনছিলেন, যবনিকাপাত উঠিয়ে দিচ্ছিলেন, অঙ্ক-দৃশ্যের বিভাগকে অপসারিত করছিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা ভৈরবের বলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন—'অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের পরিবর্তনকালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো-নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। এইরূপ সন্ধিস্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো জ্বালাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার—উহা ছেলেভোলানো খেলা। প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নাট্যবস্তুর প্রতি।' মঞ্চসজ্জায় বাস্তবের স্থূল অনুকরণের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তিনটি কারণে করেছেন—প্রথম, বাস্তবের অতিঅনুকরণ দর্শকের কল্পনাবৃত্তিকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয় না, দ্বিতীয় নাটকে বাস্তবের অনুকরণ অক্ষম অনুকরণ হতে বাধ্য; তৃতীয়, গতিশীল নাটকের সঙ্গে স্থিতিশীল দৃশ্যপট সামঞ্জস্যহীন। তপতীর ভূমিকায় এই কথাই আরো জোর দিয়ে তিনি বলেছেন—'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।... শকুন্তলার তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত;

অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু ; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির-প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।' সেইজন্য যে সমস্ত নাটক পুরাতন প্রথার ছাঁচে লিখিত নয়, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সেগুলিতে 'ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষি' নেই, দৃশ্যপটের কল্পনাঘাতী নিশ্চল বিদ্রূপ নেই। সচল নাটকের বিরোধী নিশ্চল দৃশ্যপট সেখানে নেই, নাটকের গতির সমর্থনে সেখানে চলার প্রতীক পথই পটভূমি। ভৈরবের বলিতে তাই স্থানের বর্ণনা নেই, দৃশ্যান্তর-নির্দেশ যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেও যবনিকাপাত নেই, শুধু আলো নেবা-জ্বলার সাহায্যে দৃশ্যান্তরের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে বাকি দায়িত্ব দর্শকের কল্পনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে ॥

---